সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র আলোকে

মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্র

সংগ্রহ সংকলন ও সম্পাদনা
মুহাম্মদ হাসান ইমাম

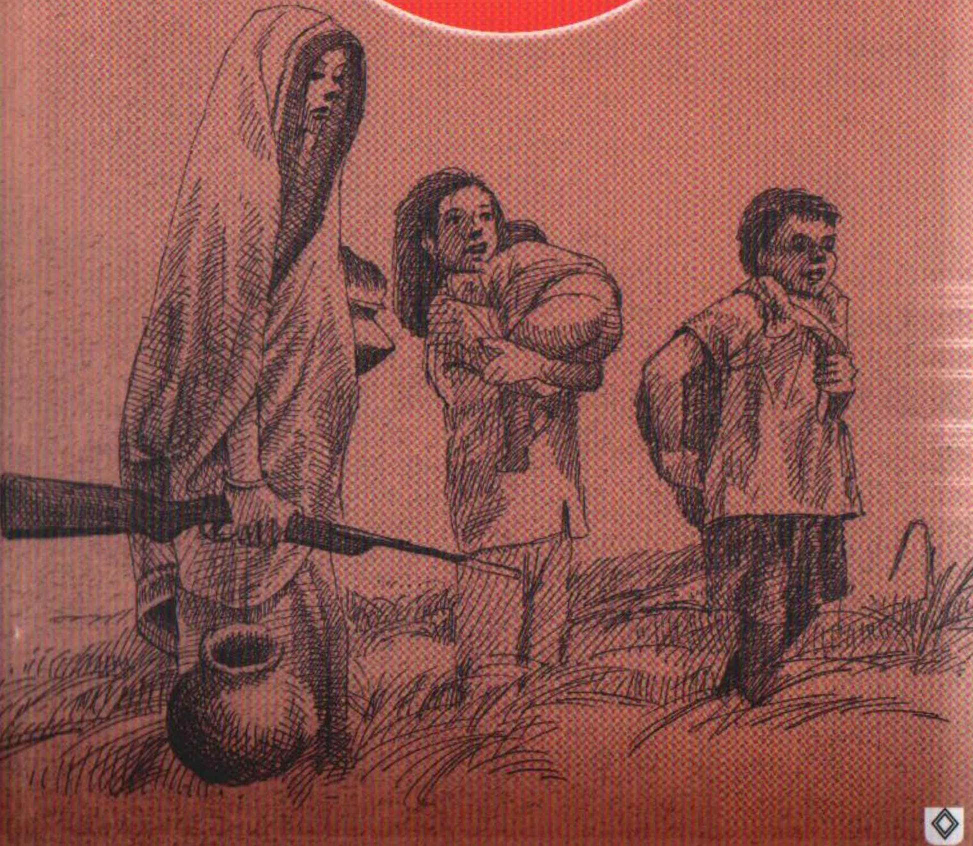

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

বোধের জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত ভাবের ঘনত্ব ও পরিধির মাত্রা ব্যাপক। এ যেন এক গুপ্তমন্ত্র। উচ্চারিত হবার সাথে সাথে এর আত্তীকরণ হয় পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাথে পরবর্তী প্রজন্মের চেতনার। যে চেতনার মস্তিষ্কের চিন্তা এক, হৃদয়ের আবেগ এক। এ যেন এক অদৃশ্য পরম্পরা। যে পরম্পরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের উর্ধ্বে ভিন্নতর কিছু, যা নির্দিষ্ট করে দেয় আপন দায়িত্ব, বুকভরা আত্মবিশ্বাস আর গর্ব নিয়ে সে প্রিয়জনের মতো জানান দেয়- আমি তুমি সে। খুব আপনা। এমন ঐশ্বর্যময় পরম্পরার অংশ হিসেবেই বিচিত্রার আত্মপ্রকাশ। স্বাধীনতা উত্তর আমাদের প্রজন্মতো এক ভাবে বিচিত্রা প্রজন্ম। তার কত না অনুষঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের নানাবিধ গৌরবমাখা অধ্যায়। আহা, কত জীবন্ত আর নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত সে সব কীর্তি। পরম্পরার এহেন মহান কীর্তির কিছু খণ্ডচিত্র বইয়ের আদলে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই মধ্যমার এ আয়োজন। আশা করি পরম্পরাকে নিয়ে মধ্যমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস পাঠকের সাথে আমাদের বন্ধনকে করে তুলবে আরো নিবিড়, আরো আলোকময়।

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

'চট্টগ্রামের প্রতিরোধ: বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র' এ লেখায় লেখক মেজর এম.এস ভুঁইয়া -এর স্থলে মেজর এম,এস,এ ভুঁইয়া হয়েছে। 'চিলমারী রেইড' ও 'এবোটাবাদ থেকে দেবীগড়' মুক্তিযুদ্ধের এ দুটি স্মৃতিচারণমূলক লেখায় লেখকের নাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম, আবু তাহের-এর স্থলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস, আবু তাহের হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র আলোকে
মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্র

■ সংগ্রহ সংকলন ও সম্পাদনা
মুহাম্মদ হাসান ইমাম

■ প্রকাশক
মো. শাহরিয়ার জামান সুমন
মধ্যমা মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশনস লিমিটেড
১০৮,১১৯ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড,
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন : ০২-৯৬৬৩৭৯৯

■ স্বত্ব
সংকলক

■ প্রচ্ছদ
বিপ্লব সরকার

■ মুদ্রণ
মোল্লা প্রিন্টার্স

■ প্রকাশ কাল
আগস্ট ২০১৪

■ মূল্য : ৩৭৫ টাকা

ISBN: 978-984-90215-0-6

Saptahik Bichitraer Aloke Muktijuddher Khondhachitra Collected Compiled and Edited by Muhammad Hasan Imam, Published by Md. Shahriar Zaman Shuman, Madhyama Media & Publications Ltd. 108,119 Concord Emporium Shopping Complex, 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road, Katabon, Dhaka-1205, Bangladesh, Phone : 02-9663799, E-mail : madhyamapublications@gmail.com

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী
যে সব মুক্তিযোদ্ধারা
নিহত হয়েছেন
তাঁদের স্মরণে

ভূমিকা

আজকে সাপ্তাহিক বিচিত্রার অনুষঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ছে। বিধ্বস্ত দেশ, উদাসীন মানুষ, জনশূন্য পাড়া আর সমাগমহীন বাসাবাড়ি। প্রতিটি বাসা প্রায় আক্রান্ত, লুটতরাজের শিকার। আমাদের নিজের বাসায় ফিরে যা দেখলাম তা বলতে গেলে মনে হলো এক ফেলে যাওয়া বাঙ্কার। ঘরে-বাইরে, মালতি লতার আবডালে ড্যাম হয়ে যাওয়া পিস্তলের গুলি, আঙ্গিনায় অজস্র বুলেট, খানসেনাদের বেশ কয়েক জোড়া বুট, বড় বড় খালি ট্রাংক আর একটা লম্বা পাজামার ফিতা। ঘরে ঘরে আসবাবপত্রের বদলে বইপত্রের ছড়ানো-ছিটানো পাতা, ওকালতনামা, মার্ক্স-এঙ্গেলস সমগ্র, মাও সে তুং রচনাবলীর ছেঁড়া পাতা, আর সেগুলোর মধ্যে কোনটি খুঁজতে গিয়ে চোখে পড়ে বিষ্ঠা, মেঝেতে দাগ হয়ে গেছে এমন প্রস্রাব। বাবার সিন্দুকটার ঢাকনি খোলা। উপরে বসে একটাকে কমোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সামনের ঘরে ছাদের লোহার বিমে একটা মোটা দড়ি ঝোলানো, কুয়োর মধ্যে ভাঙা ট্রানজিসটার, স্যুটকেস, ন্যাকড়া। সারা বাড়িতে বেড়ে ওঠা অজস্র জংলি গাছ। শুধু একটা চৌকি পাওয়া গেলো। তাও বা কম কি? আমি আর মা চারটা খেয়ে ওই চৌকিতে থাকলাম। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এখনো ফেরেনি। কেউবা ঢাকায় মামার বাসায়। কেউবা অন্যখানে। দেখতে দেখতে আবার পরীক্ষা, পড়াশোনার সংস্কৃতি ফিরে এলো।

একদিন দৈনিক বাংলা চোখে পড়লো। সে সময়ের সবচেয়ে সুন্দর মুদ্রিত দৈনিক কাগজ। সেখানে ঘোষণা পেলাম 'বিচিত্রা' সাপ্তাহিক হিসেবে বেরুচ্ছে। পরের দিন সকাল থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে কাগজওয়ালাকে পেলাম। দৈনিক বাংলা আর সাপ্তাহিক বিচিত্রা চাই। বিচিত্রা আমাদের সাথে যোগ দিল, না কি আমরা বিচিত্রাকে নিয়ে এগুলাম জানিনা। তারপর দীর্ঘসময় ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতায় সপ্তাহান্তে বিচিত্রা কেনা আর দেখা চললো। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মফস্বল শহরে আমাদের মতো যুবকদের মন ও মনন গঠনে বিচিত্রার অবদান কম করে দেখার অবকাশ কোথায়। যাঁরা একটু সিরিয়াস পাঠক ছিলেন তাঁরা ঢাকা-রাজশাহীর মতো বড় শহর থেকে কণ্ঠস্বর, জনান্তিক, গণসাহিত্য, কালস্রোত বা উত্তরাধিকার-এর মতো পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করতে পারতো। আমরা যে ছোট মহকুমা শহরে বসবাস করতাম সেখানে সন্ধ্যা হলেই বিদ্যুৎ চলে যেতো। সুতরাং আর যাই হোক পড়ালেখা হতো না।

বিচিত্রা আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। কি দিয়েছে তা ভেঙে বলা বোধ হয় দুঃসাধ্য। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত, সেসব রচনার লেখকদের নাম, কবিদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ, গ্রন্থসমালোচনার অপূর্ব স্বাদ আমরা পেতে শিখেছি এই পত্রিকাটির বদৌলতে। যুদ্ধের সময় যখন বালুরঘাটে ছিলাম তখন একদিন সাপ্তাহিক দেশ পড়ার সুযোগ হয়েছিল। মনে হয়েছিল ৪০ পয়সায় এই পত্রিকাটি দেশ স্বাধীন হলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে এখানে। আজকে সেই 'দেশ' এখানে পাওয়া যাচ্ছে তবে ৫০ টাকায়। তাও বাংলাদেশ সংস্করণ। পৃষ্ঠা কম থাকে।

হুমায়ুন আজাদ বা মাহমুদুল হকের মতো লেখকদের সাথে প্রথম পরিচয় ঘটে এই বিচিত্রার মাধ্যমে। মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন', আহমেদ আনিসুর রহমানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক রচনা, মাহফুজউল্লাহর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধসহ বিভিন্ন ধরনের রচনা আমাদের মধ্যে এক মিশ্র ভাবের উদ্ভব ঘটায় যার ফলাফল এখন অনেকটা অনুভব করতে পারি। কবি শামসুর রাহমানের 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা', মহাদেব সাহার 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', আবুল হাসানের 'যে তুমি হরণ করো'র সাথে সে সুবাদেই পরিচয়। করুণাময় গোস্বামীর সংগীত চিন্তা বা অনেক মনোগ্রাহী সাক্ষাৎকারের মতো নীহাররঞ্জন রায়, শিবনারায়ণ রায় বা হেমন্তের কথোপকথন সত্যিই এখনও মনে পড়লে নিজেকে আজকের বাস্তবতায় অনেকটা নিঃসঙ্গ, বাংলাদেশ-বিচ্যুত, সাহিত্যহীন-সংস্কৃতিহীন অলস মানুষ মনে হয়। আমাদের মতো অনেক পাঠকই আজ 'বিচিত্রা'হীন এক মনোকষ্টে আছেন যাঁরা এখনকার অনেক সমৃদ্ধ পত্রিকার সাথেও সংযোগ রাখেননি আবার বিচিত্রার কথাও ভুলে যেতে পারেননি।

সবচেয়ে অবহেলায় ও অসতর্কভাবে যে প্রবন্ধগুলো পড়া হয়নি তা হলো মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বলিত যোদ্ধাদের লেখা। আজকে সংকলন করতে গিয়ে সে লেখাগুলোর মূল্য বুঝতে পারছি। আমাদের মতো এসময়ের অনেক পাঠকই এগুলো পড়তে গিয়ে শিহরিত হবেন নিঃসন্দেহে। অনেকটা এরকম ভাবনা থেকেই সাপ্তাহিক বিচিত্রার রচনা নির্বাচন করতে গিয়ে প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের লেখাগুলো চলে এসেছে। আমরা এখানে আবার গভীর শ্রদ্ধা জানাই সে সব যোদ্ধা ও তাঁদের বিশাল অবদানকে। এ যুদ্ধ যে কতটা বাংলাদেশের মাটিতে হয়েছে, কতটা জনসংস্রবভিত্তিক জনযুদ্ধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথম সারির যোদ্ধাদের গভীর অভিজ্ঞান থেকে। এগুলোকে ভিত্তি করে ইতিহাস রচনার – অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের মাঠভিত্তিক বর্ণনার – অবকাশ রয়ে গেছে।

জানা না-জানা, পরিচিত অপরিচিত, জীবিত ও মৃত এমন অনেক লেখকের রচনা আমরা সংকলনভুক্ত করেছি যাঁদের কাছে অনুমতি নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আশা করবো তাঁরা নতুন প্রজন্মের জন্য আমাদের এ চেষ্টার সততার দিকটিকে বিবেচনা করবেন, এবং আমাদের ক্ষমা করবেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য লেখাগুলো প্রকাশিত হবে বলে আশা রাখছি। আর এ কাজে সবচেয়ে সাহায্যকারী 'মধ্যমা'র স্বত্ত্বাধিকারী মো. শাহ্‌রিয়ার জামান সুমন আমাদের আবদ্ধ করলেন একটি নিবিড় বন্ধনে। এই সংকলনের যেকোন ব্যাপারে উপদেশ আমাদের উৎসাহিত করবে।

সবশেষে বানান ও উচ্চারণ নিয়ে-সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় মুদ্রিত বানান ও ব্যক্তির নাম এবং উচ্চারণই আমরা অনুসরণ করেছি। দু'একটি জায়গায় মুদ্রিত কপি অস্পষ্ট থাকায় হয়তবা ত্রুটি থাকতে পারে এজন্য আমরা দুঃখিত।

মুহাম্মদ হাসান ইমাম
কাজলা, রাজশাহী
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সূচিপত্র

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা | ৮ই জুন ১৯৭২
বাংলাদেশের জন্যে একটি মার্কিন কণ্ঠস্বর : জোন বেয় ১

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ৭ম সংখ্যা | ২৯ই জুন ১৯৭২
চট্টগ্রামের প্রতিরোধ : বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র
মেজর এম.এস.এ. ভুঁইয়া ৩

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ১৩তম সংখ্যা | ১০ই আগস্ট ১৯৭২
স্বাধীনতা সংগ্রামে এস ফোর্স ও কর্নেল সফিউল্লাহ
খালেদুর রহমান খালেদ ২২

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ১৫তম সংখ্যা | ২৪শে আগস্ট ১৯৭২
যুদ্ধের ডাইরী
মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী ৩৮

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ২০-২১তম সংখ্যা | ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২
স্বাধীনতা যুদ্ধে ৭নং সেক্টর ও কর্নেল জামান ৪৩

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ২১তম সংখ্যা | ৫ই অক্টোবর ১৯৭২
একটি বিষাদময় স্মৃতি – "আমি স্যাবরের শব্দ আর শুনতে চাই না" ৫০

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ২৫তম সংখ্যা | ১লা নভেম্বর ১৯৭২
চিলমারী রেইড
লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস আবু তাহের ৫৩

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ২৭তম সংখ্যা | ২৩শে নভেম্বর ১৯৭২
শহীদ লেফটেন্যান্ট সামাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী
শাহরিয়ার কবির ৬০

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ২৮তম সংখ্যা | ৩০শে নভেম্বর ১৯৭২
১৬ই ডিসেম্বরে স্মৃতি
হুমায়ুন আজাদ ৭১

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ২৮তম সংখ্যা | ৩০শে নভেম্বর ১৯৭২
এবোটাবাদ থেকে দেবীগড়
লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস আবু তাহের ৭৮

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ২৮তম সংখ্যা | ৩০শে নভেম্বর ১৯৭২
সম্মুখ সমরে বাঙালী
মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী ৮৯

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ২৮তম সংখ্যা | ৩০শে নভেম্বর ১৯৭২
আমি কাদের সিদ্দিকী বলছি ১১৩

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ২৯, ৩০, ৩১তম (বিশেষ) সংখ্যা
১৮ই জানুয়ারী ১৯৭৩
সংগ্রামের এক প্রান্তর
মেজর জাফর ইমাম ১২০

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ৩২তম সংখ্যা | ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৩
মহানাটকের শেষ অঙ্ক
আবদুল হক ১২৮

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ৩৩তম সংখ্যা | ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩
বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর
আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৩২

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ৩৩তম সংখ্যা | ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩
সংগ্রামের এক প্রান্তরে
মেজর জাফর ইমাম ১৩৮

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ৩৩তম সংখ্যা | ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩
উই স্যালুট মেজর হায়দার
জয়নুল আবেদীন ১৪৬

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ৩৪তম সংখ্যা | ৩০শে মার্চ ১৯৭৩
সংগ্রামের এক প্রান্তরে
মেজর জাফর ইমাম ১৫১

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ৩৬তম সংখ্যা | ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৩
চরমপত্র
মুহম্মদ রওশন আখতার মুকুল ১৫৫

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ১ম বর্ষ | ৩৯তম সংখ্যা | ৪ঠা মে ১৯৭৩
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও বাংলাদেশ
মাহফুজউল্লাহ ১৬০

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ২য় বর্ষ | ৪৩তম সংখ্যা | ২৬শে মার্চ ১৯৭৪
একটি জাতির জন্ম
মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৬৩

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ২য় বর্ষ | ৪৩তম সংখ্যা | ২৬শে মার্চ ১৯৭৪
'জনতার একজন হিসেবে যুদ্ধ করেছি'
ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৭৬

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ২য় বর্ষ | ৪৩তম সংখ্যা | ২৬শে মার্চ ১৯৭৪
সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট, মার্চ ১৯৭১
মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ ১৮২

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ২য় বর্ষ | ৪৪তম সংখ্যা | ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৪
ভুলি নাই! ভুলি নাই! ছাব্বিশে মার্চ ১৯৭১ –
লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিন আহমদ চৌধুরী বীরবিক্রম ১৮৭

সাপ্তাহিক বিচিত্রা | ৩য় বর্ষ | ৩৩তম সংখ্যা | ১০ই জানুয়ারী ১৯৭৫
'আপনারা আমার জনগণের বাহিনী'
বঙ্গবন্ধু ১৯২

বাংলাদেশের জন্যে একটি মার্কিন কণ্ঠস্বর : জোন বেয

ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ওয়াশিংটন ডিসি'র অদূরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানকার কোল ফিল্ড হাউসে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান। পনের হাজার ছাত্র-দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত গান শুনছেন। মঞ্চের উপরে জোরালো স্পট লাইটের আলোতে দেখা যাচ্ছে সাদাসিধে এলোচুল একটি তরুণীকে। তিনি গান গাইছিলেন। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের যন্ত্রণা আর হাহাকার। তিনি জোন বেয। যে মুহূর্তে জোন মঞ্চে এলেন মনে হলো শ্রোতারা যেন বাংলাদেশের হাজারো মা আর শিশুর কাঁদন শুনতে পাচ্ছেন। জোন যখন গাইলেন – হোয়েন দ্য সান সেঠস্ ইন দা ওয়েস্ট; ডাই এ মিলিয়ন পিপল অব বাংলাদেশ । সমস্ত দর্শকরা যেন দেখতে পেলেন হাজার হাজার মৃত মানুষের লাশ কাদায় জলে মিশে যাচ্ছে। আর যারা বেঁচে আছে তারা প্রিয়জনের শবদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছে। জোন বেয – শান্তির জন্য যারা সংগ্রাম করছেন তাদের কাছে একটি আশ্বাসের বাণী। নিজের দেশের মুক্তির জন্য যারা লড়ছেন – জোন তাদের কাছে স্বাধীনতাকামী একটি সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের প্রতীক। পাশ্চাত্যের সঙ্গীত জগতে জোন বেয একটি বিস্ময়কর নাম। তার সমস্ত গানে ছড়িয়ে আছে অপূর্ব একটি বিষাদ যা প্রতিটি বয়সের মানুষকে মনে করিয়ে দেয় তার স্মৃতিকে, বাসনাকে এই নগরে সভ্যতার যন্ত্রণাক্ত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশাকে – সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিকে জাগতে।

ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জোন বেয যে কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন তা ছিল বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য একটি চ্যারিটি শো। যারা সেদিন, দু'ডলার খরচ করে এক একেকটি টিকিট কিনেছিলেন তারা জোন বেয এর গান শুনে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বাংলাদেশে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্যাতিত হয়েছে – নৃশংস অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করছে তারা তাদেরই আপনজন এবং যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধ

চলাকালীন বাংলাদেশের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল তা ছিল ন্যাক্কারজনক ও মানবতা বিরোধী। জোন বেয যখন গান গাইছিলেন, মনে হচ্ছিল তার স্বর যেন জীবন্ত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। ছাত্ররা সব দাঁড়িয়ে উঠে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল একযোগে। পনের হাজার দর্শক চিৎকার করে বলেছিল 'এনকোর' 'এনকোর'। জোন একটার পর একটা গান গেয়ে সমস্ত দর্শককে মন্ত্রাহত করে রেখেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত গীতিকার ও সুরকারেরা সেই সব গান রচনা করেছেন ও সুর দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আছেন বব ডিলন, কিংস কিসটোফারসন এবং জন লেনন। তাছাড়া ছিল আর্ল রবিনসনের বিখ্যাত গান 'জো হিল'। জোন সব সময়ই শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে তার সঙ্গীতকে হাতিয়ার করেছেন। ভিয়েতনামে, গ্রীসে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ঘৃণ্য ভূমিকার বিরুদ্ধে জোন সবসময় সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। একবার জেল খেটেছেন ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে। জোনের বক্তব্য ছিলঃ আমার ট্যাক্সের টাকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যবহার চলবে না। গেয়েছেন, 'টেক দা রিবনস ফ্রম মাই হেয়ার', 'হেলপ মি মেট ইট থ্রু দা নাইট' এর মত সাড়া জাগানো গান। ঢাকা মুক্ত হবার পর জোন গেয়েছেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ নেকড়েরা পলাতক' 'বন্দীশালা নিশ্চিহ্ন করে দাও' 'আহা সুখের দিন' এই গানগুলো।

চট্টগ্রামের প্রতিরোধ : বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র

মেজর এম.এস.এ. ভুঁইয়া

[২৬শে মার্চ ১৯৭১, চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের বিদ্রোহী অস্তিত্ব ঘোষিত হলো। সেই সঙ্গে ঘোষিত হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। শোনা গেল মেজর জিয়ার বিদ্রোহী কণ্ঠ। তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর একজন হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার নাম শুনলো। ক্যাপ্টেন এম.এস.এ. ভুঁইয়া তখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অধীনে ছিলেন। এখন তিনি মেজর। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই আগুন ঝরা বিদ্রোহী দিনগুলোর স্মৃতি চিত্রণ করে মেজর ভুঁইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। পত্রস্থ নিবন্ধটি তাঁর সেই প্রকাশিতব্য গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।]

২৫শে মার্চ। রাত তখন প্রায় একটা। ছায়া-শ্যামলিমা ঘেরা পাহাড়-পরিবৃত বন্দর-নগরী চট্টগ্রাম গভীর ঘুমে নিমগ্ন। বীর-প্রসবিনী চট্টলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছাউনিতেও ঘুম তখন তার আচল বিছিয়ে দিয়েছে। সেন্টারের রিক্রুটেরা সবাই নিদ্রাতে। চারদিকে একটা থমথমে পরিবেশ – যেন স্তব্ধতারই রাজত্ব। কিন্তু কে জানতো, সেই হিমশীতল স্তব্ধতাকেই বিদীর্ণ করে দিয়ে অকস্মাৎ গর্জে উঠবে হানাদার পশ্চিমা দস্যুদের মারণাস্ত্র, সেই আঘাতে লুটিয়ে পড়বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অগণিত বীর সৈনিক – শ্যামল বাংলার সোনার সন্তান। কে জানতো ভাই বলে ভাইয়ের বুকে আঘাত হানবে সেই পশ্চিমা নরপিশাচের দল? সৈনিকের

ভূমিকা ছেড়ে তারা নেমে যাবে নরঘাতক দস্যুর ভূমিকায়। কিন্তু সব রীতিনীতি, সব ভ্রাতৃত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে সেই ভয়াবহ স্তব্ধ রাতে তারা অধিকার সচেতন বাঙালির বুকে অতর্কিতে মরণ আঘাত হানলো। এক মুহূর্তে খুলে গেলো তাদের অতীতের সব মুখোশ, সব ষড়যন্ত্র।

২০নং বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্য বোঝাই ৬টি ট্রাক এসে ধীরে ধীরে রেজিমেন্ট সেন্টারের অস্ত্রাগারের সামনে দাঁড়ালো। ত্রস্ত পদক্ষেপে অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকেরা ট্রাক থেকে নেমে পড়লো। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা অস্ত্রাগারে আধিপত্য বিস্তার করলো। অস্ত্রাগারে প্রহরারত রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকরা আকস্মিক আক্রমণে প্রাণ হারালো। তারা ভাবতেও পারেনি তাদের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য ষড়যন্ত্রও ওৎ পেতে থাকতে পারে। প্রহরারত বাঙালি সৈনিকদের নির্মমভাবে খতম করে দিয়ে পশ্চিমা দস্যুরা সেন্টারের চতুর্দিকে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালো, তারপর শুরু হল তাদের সুপরিকল্পিত পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ। মেশিনগান, মর্টার, ট্যাঙ্ক থেকে শুরু হলো অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণ। সেই আঘাতে সেন্টারের বিল্ডিংগুলো কেঁপে কেঁপে ধ্বসে পড়তে লাগলো, চতুর্দিক থেকে বর্ষিত গোলাগুলির শব্দে আকাশ হলো প্রকম্পিত। সবকিছু ছাপিয়ে জেগে রইলো শুধু মরণ যন্ত্রণাকাতর, ভীতি-বিহ্বল মানুষের আর্তনাদ।

রিক্রুট ব্যারাকের প্রতিটি ঘরের অভ্যন্তরে মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ হলো। সেই গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন অনেক বীর বাঙালি সৈনিক। যাঁরা তখনও নিরস্ত্র অসহায়ভাবে বেঁচে ছিলেন তাঁদের ধরে নিয়ে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে গুলি করে হত্যা করা হলো। মুমূর্ষুদের মর্মান্তিক আর্তনাদে চট্টলার আকাশ বার বার বিদীর্ণ হতে লাগলো। কিন্তু সেই আর্তনাদও বেশিক্ষণ শোনা গেল না। মৃত্যু-যন্ত্রণাকাতর মানুষের কণ্ঠ অচিরেই স্তব্ধ হয়ে এলো। সেন্টার প্রাঙ্গনটি তখন মানুষের রক্তে থৈ থৈ করছে। চারিদিকে নেমে এসেছে মৃত্যু বিভীষিকা।

সেই বিভীষিকাময় প্রেতপুরীতে বাঙালি সৈনিকদের পবিত্র রক্তের পদচিহ্ন এঁকে ইয়াহিয়ার জঙ্গী সৈনিকেরা পাশব উল্লাসে মেতে ক্রমাগত নরকগুলজার করতে লাগলো। সেই রাতের হত্যাকাণ্ড জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করে দিল। ২৫শে মার্চের সেই ভয়ঙ্কর রাতে চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রিক্রুট সেন্টার প্রাঙ্গণে বাংলার বহু বীর সৈনিক শাহাদাৎবরণ করলেন। কিন্তু কে জানতো, সেই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডই শেষ ছিল না, তা ছিল পৃথিবীর জঘন্যতম বর্বরতার সূচনা মাত্র।

২৫শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাতের নারকীয় হত্যালীলার কথা শুনে আমার কেবলি মনে পড়তে লাগলো সেই একটি মাত্র কথা, 'তারা এতটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারবে না'। কথাটি বলেছিলেন বাংলার গণমানুষের অন্যতম প্রতিনিধি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ খন্দকার মোশতাক আহমদ। মোশতাক সাহেবের মত অনেকেরই হয়ত এমন বিশ্বাস ছিল। পশ্চিমা সৈনিকরা সব ভ্রাতৃত্ববোধ আর মানবিকতার বুকে পদাঘাত হেনে স্বদেশবাসীর উপর এমন পাশবিক হত্যাযজ্ঞ চালাবে, এ ছিল অনেকের বিশ্বাসেরও অতীত। কিন্তু সে আরেক কাহিনী।

তখন দুপুর বারোটা। দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে আমি চলেছি আমার কর্মস্থল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের দিকে। রেজিমেন্ট সেন্টারে পৌঁছে এ্যাডজুটেন্ট সাহেবের অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম জীপে এ.কিউ (এ্যাডজুটেন্ট কোয়ার্টার মাস্টার) পশ্চিম পাকিস্তানী লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওসমানী বসে-রয়েছেন। তাকে দেখেই মিলিটারী কায়দায় সালাম ঠুকলাম। তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতার সুর মিশিয়ে তিনি আমার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক নিরাপত্তার কথা পাড়লেন। তাকে এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখা গেল। বললেন,

: ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া, হোয়্যার আর ইউ লিভিং নাউ?
: শেরশাহ কলোনী স্যার।
: স্টিল ইউ আর দেয়ার।

কর্নেল ওসমানীর কণ্ঠে অবাক হবার সুর। মনে হলো আমার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি খুবই চিন্তিত। বললেন,

: ইট ইজ নট সেফ, স্টে আউটসাইড দি ক্যানটনমেন্ট ইন দিস সিচুয়েশন। সিভিলিয়ান মে এ্যাটাক ইউ এ্যাট এনি টাইম। টুডে ইউ সিফট ইওর ফ্যামেলী টু দি ক্যান্টনমেন্ট এন্ড স্টে ইন অফিসারস মেস ভিপিআই নাম্বার টু।

আমি তার নির্দেশে সম্মতি জানিয়ে বললাম : ওকে স্যার।

আমার উত্তরে তিনি সম্ভবতঃ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই মিলিটারী জীপটি আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল।

বাসায় ফিরে এলাম। সারা মন জুড়ে তখন নানা চিন্তা তোলপাড় করে ফিরছিল। কি করবো আর কি করবো না কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। মুখে কিছু না বললেও চিন্তার রেখা অবশ্যই আমার কপালে ফুটে উঠেছিল। আমার সহধর্মিণীর দৃষ্টি কিছুতেই তা এড়ালো না। চট্টগ্রামের তখনকার অবস্থা তার অজানা ছিল না। চট্টগ্রামে তখন চলছিল রাজনৈতিক আন্দোলন, সৈনিকে-জনসাধারণে ছোটোখাটো সংঘর্ষ। আমার চেহারায় উদ্বেগের চিহ্ন লক্ষ্য করে আমার সহধর্মিণী প্রশ্ন করলো :

কি এত সব চিন্তা করছ? আমি প্রথমে তার প্রশ্নকে আমল দিলাম না। নিতান্ত অবজ্ঞাভরে জবাব দিলাম না তেমন কিছু না, ভাবছি আজকেই ক্যান্টনমেন্টে শিফট করব কিনা। আমার কথা শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। অবাক কণ্ঠে বলল শিফট মানে? কোথায় এবং কেনই বা হঠাৎ? আমি আনুপূর্বিক সবকিছু তাকে বুঝিয়ে বললাম। পরিস্থিতির কথা শুনে সে বলল : তা এত তাড়াতাড়ি কেন? যেতেই যদি হয় না হয় আগামীকালই যাব। তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম : দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়।

রাত আটটায় আবার ক্যান্টনমেন্টে যেতে হল। চারিদিকের পরিস্থিতি জানবার জন্য মন বেশি উদ্বেগ আকুল হয়ে উঠেছিল। কিছুটা কৌতূহল নিয়ে মেজর বেগের অফিসে গেলাম। মেজর বেগ তখন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের উপর গভীর দৃষ্টি বুলাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে চোখ তুলে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্তার পর মেজর বেগ প্রশ্ন করলেন : ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া, হ্যাভ ইউ শিফটেড ইওর ফ্যামেলি টু দি ক্যান্টনমেন্ট?

: নো, স্যার।

: ইউ ওয়্যার সাপোজড টু শিফট ইওর ফ্যামিলি টু ভিআইপি নাম্বার টু। হোয়াই হ্যাভ ইউ নট ইয়েট শিফটড?

: স্যার, আই ওয়াজ টোলড জাস্ট টু ডে, এ্যান্ড আই কুড নট শিফট ডিউ টু সর্টেজ অব টাইম।

: ইট ইজ জাস্ট এ লেম এক্সকিউজ।

মেজর বেগের কণ্ঠে রূঢ়তার আভাস। রুক্ষস্বরে তিনি আরও বললেন : দিস ইজ ভেরী ব্যাড, দ্যাট ইউ হ্যাভ ডিভাইড দি অর্ডার অব লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেড.এস. ওসমানী। বিয়িং এ্যান অফিসার, ইউ শুড বিহেভ ইন এ রেসপনসিবল ম্যানার।

আমার দায়িত্বজ্ঞানের উপর কঠিন কটা হেনে মেজর বেগ কথাগুলো বললেন। কিন্তু আমিও সাথে সাথে প্রতিবাদ করে উত্তর দিলাম : স্যার, হোয়াই আর ইউ সো সিরিয়াস উইথ দিস স্মল এ্যাফেয়ার?

আমার কণ্ঠে তখন অপরিসীম দৃঢ়তা। দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, এনিওয়ে আই উইল নট শিফট মাই ফ্যামিলি এ্যান্ড ইন ফিউচার প্লিজ ডোন্ট ইন্টারফেয়ার ইন মাই পার্সোনাল এ্যাফেয়ার।

আমার এই প্রত্যয় দৃঢ় কণ্ঠ শুনে মেজর বেগ যেন চকিতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তার কণ্ঠ থেকে তখন আর কোন কথাই সরছিল না। আমার কণ্ঠও তখন নীরব। চারিদিকে সুচিমুখ স্তব্ধতা। পরিবেশ তখন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পর স্তব্ধতাকে দীর্ণ করে কর্নেল জেড.এম. ওসমানী ওই অফিসে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই দুইশত রিক্রুটকে টহলদানের জন্য দু'জন সুবেদারের প্রতি নির্দেশ জারী করলেন। একজন সুবেদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেসা করল স্যার, রাইফেল ছাড়া টহল দেওয়া কি করে সম্ভব? জনসাধারণের সাথে যেকোন মুহূর্তে সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে।

তিনি বললেন : রাইফেল নিয়ে টহল দিলে জনসাধারণের মনে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। কর্নেল ওসমানী এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে অফিস থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। আমরা স্তব্ধতায় বিমূঢ় হ'য়ে রইলাম।

রাত নটা। মনে নানা জিজ্ঞাসা ও কৌতুহল নিয়ে বাসায় ফিরছিলাম। সারাদিনের ঘটনা ও আলাপ-আলোচনা কেবলি মনে এসে ভিড় জমাচ্ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একজন সুবেদারের সাথে আলাপ হল কিছুক্ষণ। তিনি জানালেন সন্ধ্যা সাতটায় বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানদের সব রাইফেল অস্ত্রাগারে জমা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই তথ্য জানিয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত সুবেদার প্রশ্ন করলেন : স্যার আমাদের ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি ডিউটি কি শেষ হয়ে গেল? আমাদের কি আর অস্ত্রের প্রয়োজন নেই।

একটা গভীর ষড়যন্ত্রের আঁচ পেলেও বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে এই সুবেদারের জবাবে বললাম : কি করবেন, এখানে কর্তার ইচ্ছায় সব কর্ম। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আরও বললাম : চিন্তার কোনো কারণ নেই। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে কর্তব্য করে যান। মুখে একথা বললেও আমি স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলাম এর মূলে নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারলেও সেদিন ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিইনি। সেই ষড়যন্ত্র যে এক নির্মম হত্যাকান্ডে পরিণত হবে এ আশংকা ছিল অবশ্য আমার চিন্তারও বাইরে।

আজ স্পষ্টতই বুঝতে পারছি, সেদিন আমিও পশ্চিমা দস্যুদের লোভনীয় শিকারে পরিণত হতে চলেছিলাম, যেমন তাদের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন আমাদের কমান্ডেন্ট ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। আজ এও বুঝতে পারছি কেন আমার জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টের ভিআইপি নাম্বার টু – যা শুধু ব্রিগেডিয়ার থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে। আজ বুঝতে পারছি, আরাম-আয়াসের প্রলোভন দেখিয়ে আমার কৃত্রিম কল্যাণময়ী সেজে সেদিন তারা আমাকে ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে নিতে চেয়েছিলো। তাদের কথায়

সেদিন যদি আমি সপরিবারে শিফট করে ক্যান্টনমেন্টে চলে যেতাম তা হলে সেই ২৫শে মার্চের মৃত্যুভয়াল রাত অনেকের মত আমাকেও আলিঙ্গন করত। আজ স্পষ্টতই বুঝতে পারছি কর্নেল জেড.এম. ওসমানী এবং মেজর বেগ কোন দূরভিসন্ধিতে মেতে উঠেছিল।

২৫শে মার্চের প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। শেরশাহ কলোনীতে তখন রাতের স্তব্ধতাকে দীর্ণ করে দিয়ে গোলাগুলির শব্দ এসে ছড়িয়ে পড়ছে। কান পেতে অনুভব করার চেষ্টা করলাম, মনে হলো ক্যান্টনমেন্টের ভিতরেই গোলাগুলি বর্ষণ হচ্ছে।

ব্যাটম্যান খলিলকে ডাকলাম, বললাম : খলিল, আমার মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করেছে।
উত্তরে খলিল বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে, স্যার।
সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলাম না। আসল সংবাদ সংগ্রহের জন্য খলিলকে বাইরে পাঠালাম। আমার নির্দেশমত খলিল বায়েজিদ বোস্তামী রোড অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্টের সন্নিকটে গেল। সেখান থেকে ফিরে এসে বলল : স্যার, ২০নং বেলুচ রেজিমেন্ট আমাদের ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিয়েছে।

এই সংবাদ শুনে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ মুহূর্তে আমার কি করণীয় কর্তব্য – মনে মনে তাই চিন্তা করতে লাগলাম। এমন সময় আমাদের সেন্টারের একজন হাবিলদার প্রায় হাফাতে হাফাতে এসে সেখানে উপস্থিত হল। ভীতবিহ্বল সকরুণ কণ্ঠে বলল স্যার, ক্যান্টনমেন্টের প্রায় সব বাঙালিকেই পশ্চিমা সৈন্যরা মেরে ফেলেছে। ক্যান্টনমেন্ট বাঙালির রক্তে ভিজে যাচ্ছে।
হাবিলদারে চেহারা এবং তার সকরুণ কণ্ঠ শুনে আমার চেতনা যেন নতুনভাবে জেগে উঠল। সেই বেদনার্ত মুহূর্তেই আমি মনে মনে সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। মনে মনে অস্ফূট উচ্চারণ করলাম, এই বাঙালি হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। বেরিয়ে পড়ার আগে অন্যান্য বাঙালি সৈনিকদের সাথে আলাপ করাই সমীচীন মনে করলাম।

নিকটস্থ এক বাসা থেকে ৮নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে টেলিফোন করলাম। উদ্দেশ্য ছিল মেজর জিয়ার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করা, কিন্তু মেজর জিয়াকে পাওয়া গেল না। ৮নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সৈনিক টেলিফোনে জানাল : মেজর জিয়া এখানে নেই।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। মনে তখন প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। যথাসম্ভব বাইরে গাম্ভীর্য বজায় রেখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথাই ভাবছিলাম। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে আমার সহধর্মিণী নার্গিস অসহায়ের সুরে জিজ্ঞেস করল : কিছু একটা হলো?

: না তেমন কিছু না। তবে একটা কিছু অবশ্যই করতে হবে আমাকে।

আমার কণ্ঠে তখন প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। নার্গিস কিন্তু কোনো সান্ত্বনা, কোনো সমবেদনা কিংবা কোনো উপদেশ – কিছুই দিতে পারলো না। পরিবেশের ভয়াবহতায় সে তখন মুক হয়ে গেছে। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। আমার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে এলো। কিন্তু তবু সান্ত্বনা জানাতে গিয়ে বললাম জীবনে সুখের অংশটুকু তুমি ভোগ করেছ, দুঃখের স্পর্শ পাওনি। আজ সেই অংশটুকুর সাথে পরিচিত হতে যাচ্ছ। আমার বিশ্বাস, একজন সৈনিকের সহধর্মিণী হিসাবে সব দুঃখকে বরণ করে নেবার মনোবল তোমার নিশ্চয় রয়েছে।

: আমার জন্যে কোন চিন্তা করো না, আমাকে আশ্বাস দিয়ে নার্গিস বললো একটা ব্যাপারই শুধু আমি ভাবছি, এত বড় সেনাবাহিনীর সাথে তুমি যুদ্ধে পেরে উঠবে কি না। আমি আরও ভাবছি এই সংগ্রামে তুমি একা, না তোমার সাথে আরও কেউ রয়েছে?

নার্গিসকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে আমি বললাম : এ পর্যন্ত অবশ্য কারো সাথে আমার যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, তবে আমি বিশ্বাস করি, অন্যান্য বাঙালি সৈনিকরাও আমার সাথে থাকবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি আবার বললাম এখন সময় কম। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা হয়তো আমাকে বন্দী করার জন্য এগিয়ে আসছে। অতএব এ স্থান তোমার জন্য আদৌ নিরাপদ নয়। তুমি আপাতত কোনো বাঙালির বাসায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাক। সুযোগ মত নিরাপদ স্থানে চলে যেও।
নার্গিসের কণ্ঠ তখন নির্বাক। অবাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি সকরুণ কণ্ঠে বললাম : আমাদের এ দেখাই হয়ত শেষ দেখা। আমি সন্ধ্যার মধ্যেই ক্যান্টনমেন্ট পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবো। আমার কণ্ঠ যদি তুমি আর সরাসরি নাও শুনতে পাও তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, যদি বেঁচে থাকি, তাহলে বেতার মারফত তুমি অবশ্যই তা শুনতে পাবে।

নার্গিসের চোখ দুটি ইতিমধ্যেই অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। দেখলাম তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। শেষবারের মত অশ্রুসিক্ত নয়নে সে বলল : যাই করো অগ্রপশ্চাত বিবেচনা করে করো। তোমার সফলতাই আমি কামনা করি।

নার্গিসের কথা শেষ হতেই 'খোদা হাফেজ' বলে আমি ও খলিল ৮নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সময় তখন সকাল ছ'টা।

যানবাহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই পায়ে হেঁটে রওয়ানা দেওয়াই সমীচীন মনে করলাম। যানবাহনের অপেক্ষায় থাকলে মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। দ্রুতপায়ে আমরা হেঁটে চলেছি। মনে দারুণ আশংকা ও উদ্বেগ। কিন্তু এরই মধ্যে আমরা সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। পায়ে হেঁটে প্রায় সাতটার দিকে আমরা ৮নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে পৌঁছুলাম। কিন্তু কারো সাথে দেখা হলো না। কি করা যায় সেই সংকট মুহূর্তে কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু কথায় আছে, এ ডাউনিং ম্যান ক্যাচ এ স্ট্র। আমার তখন প্রায় সেই অবস্থা।

অবশেষে চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারের সাহায্য নেওয়াই অত্যাবশ্যক মনে করলাম। দেড়ঘন্টা পর পুলিশ সুপারের অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম। তাকে অফিসেই পাওয়া গেল। বললাম পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিয়েছে। আমাকে আপনি পুলিশবাহিনী দিয়ে সাহায্য করুন। আমি সন্ধ্যার আগেই ক্যান্টনমেন্ট পুনরুদ্ধার করতে চাই।

: ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া পুলিশ সুপার অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, শুধু পুলিশ দিয়ে আপনি কি করবেন? পুলিশবাহিনী দিয়ে কি ক্যান্টনমেন্ট পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। তাছাড়া, আমি এভাবে আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না। আপনি বরং এ ব্যাপারে ডিআইজির সাথে আলাপ করতে পারেন।

পুলিশ সুপারের কথায় আমি হতোদ্যম হলাম না। পাশেই ছিল ডিআইজি'র অফিস। ডিআইজি'র সাথে দেখা করলাম। আমার কথা শুনে ডিআইজি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : এত বড় বাহিনীর সাথে আপনি কি পেরে উঠবেন?
আমি প্রত্যয়-দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলাম নিশ্চয় পারবো। আপনি আমাকে পুলিশবাহিনী দিয়ে সাহায্য করুন, আমি অবশ্যই ক্যান্টনমেন্ট পুনরুদ্ধার করে নেবো।

কিন্তু ডিআইজি'র কাছ থেকে কোন উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেলো না। সাহায্যদানের ব্যাপারে তাকে অনিচ্ছুক মনে হলো। পুলিশ সুপার ও ডিআইজি'র কাছ থেকে সন্তোষজনক সাড়া না পেয়ে অগত্যা আমি ডিসিকেই টেলিফোন করা শ্রেয় মনে করলাম। টেলিফোনে অনেকক্ষণ কথাবার্তার পরে অবশেষে তিনি সাহায্য করতে সম্মত হলেন। আমাকে সাহায্য করার জন্যে তিনি পুলিশ সুপারকে বলে দিলেন।

আমি তখন সুপারের অফিসে। নায়েব সুবেদার মফিজ সুপারকে টেলিফোন করলেন। বলে নেওয়া ভালো, আমি তখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অধীনে হোল্ডিং কোম্পানীর কোম্পানী কমান্ডার হিসেবে কাজ করছিলাম। নায়েব সুবেদার মফিজ তখন আমার অধীনে কর্মরত।

সুবেদার মফিজের টেলিফোন পেয়ে পুলিশ সুপার আমাকে বললেন ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া, নায়েব সুবেদার মফিজ টেলিফোন করেছেন।

পুলিশ সুপার নায়েব সুবেদার মফিজকে বললেন : এখানে ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া আছেন। আপনি তার সাথে আলাপ করতে পারেন। পুলিশ সুপার টেলিফোনের রিসিভারটি আমার হাতে দিলেন। অপরপ্রান্ত থেকে প্রশ্ন ভেসে এলো : হ্যালো কে বলছেন?

: ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া বলছি।
: আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি নায়েব সুবেদার মফিজ বলছি, পাহাড়তলী পুলিশ ফাঁড়ি থেকে।

আমি সুবেদার মফিজকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনার ওখানে কতজন আছে?
উত্তর এলো : মাত্র ৭০জন স্যার। কিন্তু অনেকের কাছেই হাতিয়ার নেই।
সুবেদার মফিজকে আমি অভয় দিয়ে বললাম : কোনো চিন্তা করবেন না। আমি হাতিয়ার এবং এ্যামুনেশন নিয়ে এখনি আসছি। কথা শেষ করে টেলিফোনের রিসিভার ছেড়ে দিলাম।

বেলা ১০টার দিকে পঞ্চাশটা রাইফেল এবং এক হাজার রাউন্ড গুলি নিয়ে পুলিশ সুপারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। এগারোটার দিকে পৌঁছুলাম পাহাড়তলী পুলিশ ফাঁড়িতে। সুবেদার মফিজ আগে থেকেই সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ফাঁড়িতে পৌঁছেই যাদের কাছে হাতিয়ার ছিল না তাদের হাতিয়ার এবং এ্যামুনেশন ইস্যু করলাম। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ৭০ জন সৈন্য ছিল নেহাতই সামান্য। তাই আরও সৈন্য সংগ্রহের জন্য উদ্বিগ্ন এবং ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যেভাবেই হোক সন্ধ্যার আগে আমাকে ক্যান্টনমেন্ট পুনরুদ্ধার করতেই হবে। সৌভাগ্যক্রমে একটি আশাব্যঞ্জক সংবাদ পাওয়া গেল। জানা গেল, পাহাড়তলী পুলিশ রিজার্ভ ক্যাম্পে প্রায় চার শতাধিক পুলিশ রয়েছে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭০জন সৈনিকসহ আমি পাহাড়তলী পুলিশ রিজার্ভ ক্যাম্পে চলে গেলাম। পুলিশ রিজার্ভ ক্যাম্পে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম তখন দুপুর বারোটা। ক্যাম্পে গিয়ে প্রায় চারশত পুলিশ ছাড়াও ১টা ইপিআর প্লাটুনকে পাওয়া গেল।

সবাইকে সেখানে রেখে আমি হালিশহর ইপিআর হেড কোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে রফিক অর্থাৎ ইপিআর হেড কোয়ার্টারের এ্যাডজুটেন্ট সম্পর্কে জানতে

চাইলাম। তিনি আমাকে ক্যাপ্টেন রফিকের টেলিফোন নাম্বার দিলেন। সেই নাম্বারে ডায়াল করতেই ও প্রান্ত থেকে রিসিভার তুলে ধরলেন ক্যাপ্টেন রফিক। আমি প্রশ্ন করলাম : হ্যালো কে বলছেন?

জবাব এলো : ক্যাপ্টেন রফিক বলছি। আপনি কে বলছেন?
জবাব দিলাম : ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া বলছি, স্যার। মেজর জিয়া কোথায় আছেন বলতে পারেন?
ক্যাপ্টেন রফিক বললেনঃ ডোনট ওরি। তিনি চট্টগ্রামের আশেপাশে কোথাও পজিশন নিয়ে আছেন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : স্যার, একথা কি সত্য যে, ২৫নং এফএফ কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের দিকে এ্যাডভান্স করে আসছে।

ক্যাপ্টেন রফিক বললেন আমিও অবশ্য এ-রকমই শুনেছি? আপনি আপনার ফোর্স নিয়ে অবিলম্বে কুমিল্লার দিকে এগিয়ে যান। আমি এখানেই নৌবাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য রইলাম।

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম : ও-কে স্যার।

ক্যাপ্টেন রফিক বললেন : ও-কে, খোদা হাফেজ।

উভয়েই টেলিফোনের রিসিভার ছেড়ে দিলাম। সুবেদারের কাছ থেকে এ্যামুনেশন নিয়ে আমি আবার পাহাড়তলীর পুলিশ রিজার্ভ ক্যাম্পে ফিরে এলাম।
এখন আমার দায়িত্ব হল ফোর্সকে রিঅর্গানাইজ করা। ফোর্সকে তিনটি প্লাটুনে ভাগ করলাম। অতঃপর যথাক্রমে একজন সুবেদার একজন নায়েব সুবেদার ও একজন হাবিলদারকে কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের অগ্রাভিযান ব্যাহত করতে হবে সেই পরিকল্পনাও প্লাটুন কমান্ডারদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো। স্থির হলো ১নং প্লাটুন ডানে, ২নং প্লাটুন বামে এবং ৩নং প্লাটুন আমার সঙ্গেই থাকবে।

শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হবার আগে সাধারণ সৈনিকদের সামনে বর্তমান পরিস্থিতির কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক মনে করলাম। একটা খোলা ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে পুলিশ, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ছয় শতাধিক সৈনিকের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে বললাম : বাঙালি ভাইয়েরা আমার। বাঙালি জাতি আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন। ইয়াহিয়া সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পশ্চিমা সৈনিকরা গতকাল রাতের অন্ধকারে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিয়েছে। তারা বাঙালির রক্তে সেখানে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে দিয়েছে। আমাদের সাথে পশ্চিমাদের এ এক চরম

বিশ্বাসঘাতকতা। এতদিন আমরা তাদের ভাই বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু তারা আজ আমাদের বুকে মরণাঘাত হেনে সেই বিশ্বাসকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব আমাদের দিতে হবে।

আজ থেকে আমরা আর বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া সরকারের অধীনস্ত কর্মচারী নই। আমরা আজ স্বাধীন। আমাদের মাতৃভূমি বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে পশ্চিমা হানাদার দস্যুদের বিতাড়িত করতেই হবে। বাংলার অন্যান্য জায়গায় কি ঘটেছে আমরা তা এখনও জানি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যেসব বাঙালি ভাই পশ্চিমা দস্যুদের হাত থেকে বেঁচে থাকবেন তারা অবশ্যই আমাদের সাথে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবেন।

খোলা ট্রাকে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটি হেলিকপ্টার উড়ে আসছে। সমবেত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'আকাশে একটি হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় দু'এক দিনের মধ্যেই শহরে বোমাবর্ষণ শুরু হবে। ফলে আগুন জ্বলবে, বহু মানুষ প্রাণ হারাবে। কিন্তু এতে পিছপা হলে চলবে না। আমরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু মনোবল আমাদের সুদৃঢ়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আমরা দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করবই। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের হাতে সময় কম। এখুনি সংবাদ পাওয়া গেল শত্রুবাহিনী শুভাপুর ব্রীজ অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে। অতএব আমরা শপথ গ্রহণ করছি যে আমাদের শেষ সৈনিক জীবিত থাকা পর্যন্ত আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে বীর-বিক্রমে লড়াই করে যাব। শত্রু সৈন্যের সংখ্যাধিক্যে আমাদের মনোবল হারাবার কোন কারণ নেই, মনে রাখতে হবে, এই ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে আল্লাহ আমাদের সহায়। আসুন, আমরা বীর-বিক্রমে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যার আগেই ক্যান্টনমেন্ট দখল করার। কিন্তু এখন ২৫নং এফএফকে বাধা দেওয়াই প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। তখন বিকেল ৫টা। ২৫নং এফএফকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হলাম। বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর এর সৈনিক নিয়ে সংগঠিত মাত্র ১০২জন যোদ্ধাকে সঙ্গে করে এই অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। মাত্র একটা এইচএমজি কয়েকটি এলএমজি আর বাকী সব রাইফেল নিয়ে একটা বিরাট পশ্চিমা সৈন্য দলের মোকাবিলার জন্যে এগিয়ে যেতে হলো। এই অভিযানে মহান আল্লাহর সাহায্য ছিল আমাদের পাথেয়। কারণ আমরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

আগেই সংবাদ পেয়েছিলাম শত্রুবাহিনী শুভাপুর ব্রীজ অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে। অতএব, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য সেদিকেই অগ্রসর হওয়া সমীচীন বিবেচনা করলাম আমরা।

সন্ধ্যা তখন ছয়টা। কুমিল্লাতে এসে পৌঁছলাম। শত্রুবাহিনীকে বাধা দেওয়ার পক্ষে স্থানটি খুবই উপযুক্ত বিবেচিত হল। মনে মনে প্রতিরোধ রচনার পরিকল্পনাও তৈরি করে নিলাম। সে অনুসারে সেখানেই পজিশন নিলাম আমরা। শত্রুবাহিনীর প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে রইলাম। প্রায় এক ঘন্টা আমাদের প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। সন্ধ্যা তখন সাতটা। আমাদের সামনে শত্রুবাহিনীর উপস্থিতি প্রায় আসন্ন বলে মনে হলো। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পরই সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ এলো। শত্রুবাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখেই আমাদের স্বল্পপরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ভীষণভাবে গর্জে উঠল, শুরু হল শত্রু নিধনের পালা। হানাদার বাহিনীর অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের আকস্মিক প্রতিরোধে শত্রুবাহিনী তখন হতচকিত। মুহূর্তে সামলে নিয়ে তারাও মেশিনগান, মর্টার এবং আর্টিলারী থেকে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ শুরু করল। শুরু হলো গোলাগুলি বিনিময়। সে এক তুমুল ব্যাপার। কিন্তু আমাদের ব্যূহ ভেদ করে শত্রুবাহিনী কিছুতেই অগ্রসর হতে পারলো না। তাদের তিনটি সৈন্যবোঝাই ট্রাকে আগুন ধরে গেল।

প্রায় দু'ঘন্টা অবিরাম যুদ্ধের পর দুই ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে শত্রুসৈন্য পশ্চাৎ অপসরণে বাধ্য হল। এ রণাঙ্গণে শত্রুবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও একজন লেফটেন্যান্টসহ বিভিন্ন পদের ১৫২জন সাধারণ সৈনিক প্রাণ হারালো। শত্রুবাহিনীর উপর প্রবল চাপ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আরও সৈনিক আরও অস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিল। রাত ১টায় কুমিল্লা থেকে টেলিফোনে ক্যাপ্টেন রফিককে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। অগত্যা চট্টগ্রাম শহরে যাওয়াই স্থির করলাম।

কুমিল্লা ছেড়ে চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে পাহাড়তলী ক্যাম্পে অবস্থানরত সৈনিকদের উৎসাহ দিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করলাম। শহরে পৌঁছেই প্রথমে গেলাম আওয়ামী লীগ অফিসে। সেখানেও ক্যাপ্টেন রফিকের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কে একজন বলল, ক্যাপ্টেন রফিক কোতোয়ালী থানায় আছেন। কিন্তু সেখানেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। ক্যাপ্টেন রফিকের অনুসন্ধানে প্রায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে অবশেষে কুমিল্লায় ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম। কিন্তু কিভাবে যাওয়া যায়? রাত তখন ২টা বাজে। ভেবে-চিন্তে নাসির সাহেবের জীপে যাওয়াই স্থির করলাম। এই ভদ্রলোকের কাছে তখন একটা মিলিটারী জীপ ছিল। এটা ছিল

৮নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের। বিপ্লবের পর এই পশ্চিমা কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাজুয়া জিয়ার সৈন্যদের হাতে নিহত হন।

কোতোয়ালী থানায় নাসির সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। সেই পরিচয় সূত্রে আমি তার জীপটিতে উঠে বসলাম। কিন্তু জীপে উঠতেই চারদিক থেকে ক্ষুদ্র অস্ত্রের গুলি বর্ষণ হতে লাগল। অবিরাম গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে অতিদ্রুত জীপ চালিয়ে আমি নিকটবর্তী এক বাসার দিকে চলে গেলাম। সেই বাসায় পৌঁছানো মাত্রই সেখান থেকে দুইজন যুবক বেরিয়ে এলো, কিন্তু অবিরাম গুলিবর্ষণের মধ্যে তারা এগুতে পারল না। বাধ্য হয়ে তারা আবার বাসার দিকে ফিরে গেল। আমরাও গুলি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তাদের সঙ্গে দৌড়ে বাসার দিকে গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য যুবক দুইজন বাসায় ঢুকে পড়ল বটে কিন্তু আমাদেরকে ঢুকতে দেবে না। অবশেষে বাড়িওয়ালা তার নিজের গোয়ালঘরটি দেখিয়ে দিল। কিন্তু ও জায়গা মোটেই নিরাপদ ছিল না। টিনের চালা দেওয়া এই ঘরে আশ্রয় নিয়ে গুলির হাত থেকে প্রাণ বাঁচানো একরকম অসম্ভব। তাছাড়া ঘরটার চারিদিক ছিল একেবারেই খোলা। অতএব ঐখানে আশ্রয় নেওয়া কিছুতেই নিরাপদ বিবেচিত হলো না। অনন্যোপায় হয়ে বুকে ভর দিয়ে ক্রলিং করে চলতে লাগলাম। ক্রলিং করেই বাড়ির পিছনে গিয়ে ঢুকলাম। বাড়ির মালিককে আবার অনুরোধ জানালাম সামান্য একটু আশ্রয় দেবার জন্য। কিন্তু বাড়িওয়ালার তখন ভিন্ন মূর্তি। আশ্রয় দেবার বদলে তিনি আমাদের উপর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। রুঢ়কণ্ঠে বললেন : পিছনের দরোজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছেন কেন? এখানে মেয়েরা আছে জানেন না? আপনার কি লজ্জা শরম বলতে কিছুই নেই। আপনি শীগগির এখান থেকে বেরিয়ে যান।

বাড়িওয়ালার এমন আকস্মিক আক্রমণে আমি তখন হতভম্ব। কিন্তু চারদিকে তখন চলছে অবিরাম গোলাগুলি। অনন্যোপায় হয়ে তাকে আমার পরিচয় জানিয়ে বললাম, আমি বাঙালি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া। কিন্তু এতেও কিছু ফল হল না। বাড়িওয়ালা কিছুতেই আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন না। এই ভদ্রলোক আর কেউ নন – তিনি হলেন চট্টগ্রামের কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর ভাই ফজলুল কবীর চৌধুরী।

ফজলুল কবীরের বাড়ির আশ্রয় না পেয়ে দু'জন রক্ষীসহ আমি বুকে ভর দিয়ে ক্রলিং করে কিছুটা দূরে গিয়ে অন্য একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ঐ বাড়িটি ছিল জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের। তারা আমাদেরকে সাদরেই আশ্রয় দিলেন। উল্লেখনীয় যে ঐ তারিখে সারারাত ধরেই পাকবাহিনী 'বাবর' নামক নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ থেকে চট্টগ্রাম শহরের ওপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করে। হিন্দু

ভদ্রলোকের বাড়িতে আমরা রাতটা নিরাপদেই কাটিয়ে দিলাম। সকাল সাতটায় ঐ বাড়িতেই নাস্তা সেরে নিয়ে অন্য একটা জীপে করে আমরা কুমিল্লার দিকে রওয়ানা দিলাম। দেওয়ানহাটের কাছাকাছি পৌঁছতেই জীপের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু হল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জীপের তেমন কিছু ক্ষতি হলো না। বাধা হয়ে আবার ফিরে এলাম চট্টগ্রামে। কিন্তু কুমিল্লায় আমাদের যেতেই হবে। তাই আবার বেলা ১১টার দিকে কুমিল্লা যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এবারও জীপের ওপর আগের মতই পাকবাহিনীর গুলি এসে পড়ল। অবশ্য এতেও জীপের তেমন ক্ষতি হল না। খোদা আমাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের কুমিল্লায় ফিরে যাবার চেষ্টা এবারও ব্যর্থ হলো।

সেদিন ছিল ২৭শে মার্চ। সন্ধ্যা ৬টার দিকে কলেজের একজন ছাত্রের সাহায্যে আমি আমার স্ত্রীকে শহরে এক বন্ধুর বাসায় রেখেছিলাম।

২৮শে মার্চ সকাল ১০টায় মেজর জিয়ার সাথে কালুরঘাটে আমার দেখা হয়। তার উদ্দীপনাময় নেতৃত্ব আমাকে সংগ্রামের কাজে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তখন থেকেই তার নির্দেশে আমি কাজ করে যাচ্ছিলাম। সেদিন আমি ইপিআর-এর ৩০ জন সৈনিক নিয়ে পাক নৌবাহিনীর কমোডর মমতাজের বাসায় আক্রমণ চালাই। আমাদের সাথে ছিল ২টি এলএমজি এবং আর সব রাইফেল। কমোডর মমতাজের বাসাটা ছিল বলতে গেলে একটা দুর্ভেদ্য দূর্গ। সেখানে ফিট করা ছিল দুটো মেশিনগান। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা আক্রমণ চালালাম। কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েও তেমন কিছু ক্ষতিসাধন করা গেল না। আমাদের হাতে নৌবাহিনীর কয়েকজন সিপাহী আহত হল। প্রায় তিনঘন্টা লড়াই চালিয়েও এর বেশি হতাহত করা গেল না। মেশিনগানের সামনে রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করা ছিল এক দুঃসাহসিক ব্যাপার। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সেই দুঃসাহসিকতাকেই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিলাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সে রাতেও বাবর জাহাজ থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে সেদিন পরিস্থিতি ছিল আমাদের অনেকখানি প্রতিকূলে।

পরবর্তী দুদিন আমি ছিলাম চট্টগ্রামে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। অনেকেই হয়তো জানেন না, প্রথমে এই বেতার কেন্দ্রটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। পরে এর নাম দেওয়া হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। এই নামটিই বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার লাভ করে এবং মুক্তিযুদ্ধকালে কোটি কোটি মানুষের অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। বলাবাহুল্য, বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র এবং পরে মুজিবনগর থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত এই ঐতিহাসিক বেতার কেন্দ্রটি গোড়াতে খোলা হয়েছিল চট্টগ্রামে।

২৬শে মার্চ দুপুরে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে আলাপের সময় আমি জানতে পারি যে একটি বেতার কেন্দ্র আমাদের দখলে রয়েছে। ২৮শে মার্চের সন্ধ্যা থেকে ২৯শে মার্চের রাত পর্যন্ত আমি এই 'বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'-এ ছিলাম। আমার সে সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূপায়ণই এ আলেখ্য।

বেতার কেন্দ্রটি খোলা হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাটে। ২৮শে মার্চ সকালে কালুরঘাটে মেজর জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে চট্টগ্রাম শহরে ফেরার পথে আমি প্রথমবারের মতো বেতার কেন্দ্রটিতে প্রবেশ করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ বেতার কেন্দ্রে কর্মরত স্টাফের সাথে আমার পরিচয় হয়। সেখানে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট শমসেরের সাথেও আমাদের দেখা হলো। লেফটেন্যান্ট শমসের সে সময়ে বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের লিখিত ভাষণ বার বার প্রচার করছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণটির কথা দেশবাসীর সবারই জানা।

সেদিন পশ্চিমা কমোডর মমতাজের বাসা আক্রমণের পর আমি বেতার কেন্দ্রে ফিরে আসি এবং লেফটেন্যান্ট শমসেরের স্থলাভিষিক্ত হই। মেজর জিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট শমসের সে সময়ে কালুরঘাটে ফিরে যান।

বেতার কেন্দ্রে অবস্থানকালে সেখানে আমার কাজ ছিল ঐ বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের চারদিকে মোতায়েন প্রতিরক্ষা বাহিনীকে কমান্ড করা, ঐ কেন্দ্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিতব্য সংবাদ, বুলেটিন ও নানা কবিতা পড়ে সে সব এ্যাপ্রুভ করে দেওয়া। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বেতার কেন্দ্রে থাকাকালীন আমাদের সাথে যারা কাজ করতেন তাদের বেতার কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আসা-যাওয়ার অনুমতি দিয়ে আমি ৭টি পাশ ইস্যু করেছিলাম। প্রথমে ৬টি এবং পরে ১টি পাশ ইস্যু করা হয়েছিল। মেজার জিয়ার নির্দেশ ছিল: কোনো সংবাদ বা কথিকা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার করার আগে অবশ্যই তা কোনো অফিসারকে পড়ে চেক করে দিতে হবে। লেফটেন্যান্ট শমসের বেতার কেন্দ্র থেকে কালুরঘাট চলে যাবার সময় মেজর জিয়ার এই নির্দেশের কথা আমাকে বলে গিয়েছিলেন। সে সময় বেতার কেন্দ্র থেকে আমি যেসব সংবাদ এবং কথিকা পাঠ করেছি তার সবগুলোতেই আমি আমার ইনিসিয়াল দিয়েছি। বলা বাহুল্য, এসব কাজ করার সময় আমার মনে এক অসাধরণ বিপ্লবী চেতনার জন্ম হয়েছিল। বলতে দ্বিধা নেই, সে সময় আরব জাহানের প্রখ্যাত গেরিলা নেতা কর্নেল ইয়াসের আরাফাতের কর্মধারা ও জীবন-চেতনা আমাকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। তার কথা তখন আমার বার বারই মনে পড়তো, মনে পড়তো তার বিপ্লবী সংস্থা প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট-এর কথাও। মনে আছে, একটি কথিকার লেখক প্রদত্ত নামটি কেটে দিয়ে তার ওপর আমি লালকালিতে আমাদের সংগ্রামী সংস্থার নাম

দিয়েছিলাম: বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট। পরবর্তীকালে সাংবাদিকরা এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন 'মুক্তিফৌজ'।

২৮শে মার্চ সন্ধ্যায় লেফটেন্যান্ট শমসের ও আমি অনেকণ আলাপ-আলোচনার পর ব্ল্যাকআউট ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেই। সে অনুসারে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ব্লাকআউট পালনের ঘোষণাও প্রচারিত হয়। বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা অনুযায়ী যথারীতি ব্লাকআউট পালিত হয়েছিল। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সবাইকে নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে ক্যাপ্টেন মুহসিন, ক্যাপ্টেন মুখলেস, ক্যাপ্টেন ইনাম, ক্যাপ্টেন ওয়ালী, ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া ও অন্যান্যদের কাছে রিপোর্ট করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। অবশ্য এই ঘোষণায় কোনো জায়গার নাম উল্লিখিত হয়নি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় বলা হয়েছেল: নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদীঘির ময়দানে ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার কাছে রিপোর্ট করুন। এই ঘোষণায় রিপোর্ট করার স্থান হিসাবে 'লালদীঘির ময়দান' এর উল্লেখ ছিল, কারণ ২৯শে মার্চ সকালে দেখা গলে যে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার, চট্টগ্রাম-কাপ্তাই রোড ধরে হাজার হাজার লোক নিজ নিজ বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ২৮-২৯শে মার্চ রাতে 'বাবর' যুদ্ধ জাহাজ থেকে পাঞ্জাবীরা চট্টগ্রাম শহরে অত্যাধিক শেলিং করেছিল। শেলিং-এর দরুন কয়েক জায়গায় আগুন ধরে যায়। আগুনের ফুলকিতে মনে হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরে বুঝি পাইকারী ধ্বংসলীলা চলছে। এ অবস্থা দেখে বেসামরিক লোকেরা যার হাতে যে বন্দুক বা অন্য অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে ছুটে পালাচ্ছিল। পুলিশ, ইপিআর এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কেউ কেউ হাতিয়ার নিয়ে গ্রামের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে তখন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউই ছিল না, তাই তারা অসংঘবদ্ধভাবে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছিল। ঐসব লোকদের আবার একত্রিত করে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিপ্লবী বেতার থেকে অস্ত্র নিয়ে লালদীঘির ময়দানে ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ প্রচারিত হয়েছিল। সত্বর তাদের এক জায়গায় জমায়েত করতে হলে এ ধরনের ঘোষণা প্রচার ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বলাবাহুল্য, এই ঘোষণা সে সময়ে বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত কয়েকজনের সাথে আলোচনা করেই প্রচারিত হয়েছিল।

ঘোষণাটি কয়েকবার প্রচারিত হবার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর এ.আর. মল্লিক আমাকে টেলিফোন করেন। 'লালদীঘি ময়দানে একত্রিত হওয়ার' এই ঘোষণা সম্পর্কে তার সাথে আমার অনেক আলাপ হয়। তিনি আমাকে অবিলম্বে এই ঘোষণা প্রচার বন্ধ করতে বলেন। তিনি যুক্তি দেন যে, এই ঘোষণা মতে যদি সবাই গিয়ে লালদীঘির ময়দানে একত্রিত হয় তাহলে হানাদারেরা

নিশ্চয় এই জমায়েতের ওপর 'বাবর' জাহাজ থেকে শেলিং করবে, এমন কি হাওয়াই হামলা হতে পারে। ড. মল্লিকের এই যুক্তিপূর্ণ উপদেশে আবার আমাকে বেতার মারফত 'লালদীঘি ময়দানে' একত্রিত হওয়ার ঘোষণাটি বাতিল করে দিতে হয়।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সময়ে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের সময় ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি হয়েছে। আপনারাও নিশ্চয় সে সময়েই এর কারণ কিছুটা অনুভব করেছিলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে যেসব সশস্ত্র বিপ্লব হয়েছে তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে প্রথমে অর্গানাইজ করা হয়েছে এবং পরে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, হয়েছে বিপ্লব। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ব্যাপারটি ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, পরে হয়েছে সংগঠন – আমরা প্রথমে বিদ্রোহ করেছি পরে শুধু করেছি বিদ্রোহীদের সংগঠিত। ২৬শে মার্চ ভোরে যে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে তা আমরা অনেকেই ২৫শে মার্চের মধ্যরাতের জানতাম না।

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, মেজর জিয়া বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁর 'স্বাধীনতার ঘোষণা'য় বলেছিলেন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে এবং তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেই রয়েছেন। অন্যদিকে তখন পাকিস্তান বেতার থেকে বার বারই জানানো হচ্চিল যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে তাকে আটক রাখা হয়েছে। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে অবশ্য এও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বঙ্গবন্ধু সুস্থ আছেন এবং যথাসময়েই বেতারে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

প্রকৃত সত্য অবশ্য আজ উদ্ঘাটিত হয়েছে। আজ সবাই জানতে পেরেছে যে, বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের এই ঘোষণা সঠিক ছিলো না। এ ধরনের পরস্পর বিরোধী খবরে সারা বিশ্বেও তখন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিলো সন্দেহ নেই। তবু এটা কেন করতে হয়েছিলো? তার কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির কাছে একটি ব্যক্তিমাত্র নন। তিনি নিজেই একটি ইতিহাস – বাংলাদেশের সংগ্রামী ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতীক, সংগ্রামী চেতনার উৎস। সেদিন সংগ্রামী বাঙালি জাতির প্রাণে তড়িৎ সঞ্চার করার জন্যে এই একটি নাম ব্যবহার না করে উপায় ছিলো না। কাজেই ২৬শে মার্চ থেকে যে রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ তিক্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলো, সেই লড়াইয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে টেনে আনার জন্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ব্যবহার করা হয়েছিলো। বাংলাদেশের মানুষ যদি সেদিন সত্যি সত্যিই জানতো এবং বিশ্বাস করতো যে বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে নেই – তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী দস্যুদের

হাতে বন্দী রয়েছেন, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই দেখা দিত বিশৃংখলা, হতাশা। সাধারণ মানুষের মধ্যেও কাজ করতো নিরুৎসাহ, সন্দেহ-সংশয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধ শুরুতেই পঙ্গু ও দুর্বল হয়ে পড়তো। এই কারণে মিথ্যা জেনেও, সংগ্রামী ঐতিহ্য ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রতীক এই নামটি মুক্তিযুদ্ধের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিলো।

জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনীর গণহত্যার নায়ক কুখ্যাত টিক্কা খানের মৃত্যুর সংবাদও বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু এই সংবাদও যে সত্য ছিল না তা এখন সবারই জানা। টিক্কা খানের মৃত্যুর সংবাদ সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনে অপরিসীম মনোবল জাগিয়েছিলো। অন্যদিকে পাঞ্জাবী সৈন্যদের মনোবল পড়েছিল সাময়িকভাবে ভেঙ্গে। এই ঘোষণায় পাঞ্জাবী সৈন্যদের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সারা বিশ্বে দেখা দিয়েছিল আলোড়ন যে কুখ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্ণর পদে শপথ করাতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, সেই টিক্কা খানের মৃত্যুর সংবাদ দেশে এবং বিদেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে – এটাই ছিল স্বাভাবিক। আমাদের প্রচারিত এই মিথ্যা খবর বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা এবং রেডিও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত প্রচার করেছিল। এসব খবর যখন টিক্কা খানের কানে যাচ্ছিল তখন তার মনের অবস্থা কেমন ছিলো তা সহজেই অনুমেয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সাথে রয়েছেন বলে প্রচার এবং টিক্কা খানের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা – এই দুটি খবর প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে কতটুকু এগিয়ে নিয়েছিল তা হয়ত আজ এ দেশের জনসাধারণ বুঝতে পেরেছেন। মুক্তি সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে যদি এই মিথ্যা কথাগুলো প্রচার করা না হতো তা হলে বিপ্লবের ধারাটা কোনদিকে যেতো তা নির্ণয় করা কঠিন।

এখানে মেজর জিয়াউর রহমানের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। সেদিন বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র যারা শুনেছিলেন তাদের নিশ্চয় মনে আছে, মেজর জিয়া তাঁর প্রথমদিনের ভাষণে নিজেকে হেড অব দি স্টেট অথ্যাৎ রাষ্ট্র প্রধানরূপেই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় দিনের ভাষণে এ তথ্যই প্রকাশ পায় যে, তিনি মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের সময় তিনি হয়ত একটা উভয়-সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন। একদিকে তাঁর নিজের নামে ঘোষণা প্রচার করলে জনসমর্থন পাওয়া যাবে না, অন্যদিকে শেখ সাহেব তখন পাঞ্জাবীদের হাতে বন্দী; তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর নাম কি করে ঘোষণা প্রচার করা যায়।

স্বাধীনতার ঘোষণা কার নামে প্রচারিত হয়েছিল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে, জিয়াউর রহমান নিজে উদ্যোগ নিয়েই এই ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। এতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কতটুকু সুবিধা হয়েছিলো তাও বিচার্য। সেনাবাহিনীর শৃংখলার নিরিখে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শৃংখলার মান ছিলো অত্যন্ত উঁচু। ঐ সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর ঐ সেনাবাহিনীর অফিসার হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার ঝুঁকি নেওয়াটা কম কথা নয়। এর একটা মারাত্মক দিকও ছিলো। বিদ্রোহ যদি অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত তাহলে যারা সেনাবাহিনীতে ছিলেন, মিলিটারী বিচার অনুযায়ী তাদের ভাগ্যে কি জুটত?

যা হোক, সেদিন কে ঠিক কাজ করেছে, কে ভুল করেছে, তার বিচারের ভার পাঠকসমাজ, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং ঐতিহাসিকদের উপর ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে এস ফোর্স ও কর্নেল সফিউল্লাহ

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : খালেদুর রহমান খালেদ

'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'-এর দেশ; বাংলাদেশ। বাঙালী জাতির ঐতিহ্য আছে; একথা বহু আগে থেকেই স্বীকৃত। এ জাতি ভাষাগত দিক থেকে বিশ্ব দরবারে স্থান লাভ করেছে। বিশ্ব সাহিত্য দরবারে বাঙালী জাতির ভাষা বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। বীরত্বের অপূর্ব ভূমিকা রয়েছে এ জাতির; বহু পূর্ব থেকেই। বার বার এ জাতির ভাগ্যাকাশে নেমে এসেছে দূর্যোগের ঘনঘটা। আর তাই এ জাতি সেই দূর্যোগময় দিনগুলোতে পরিচয় দিয়েছে অসীম ধৈর্যের।

এ জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছিল সব সময় সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ, এদেরকে সহায়তা করেছে এ দেশেরই কুসন্তান সম্প্রদায়। এ জাতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে থেকেছে অনেকদিন – তারপর একদিন সেই শিকলও ভেঙ্গে গেছে; বীর বাঙালী জাতির চেতনাবোধের তীব্র আঘাতে। শুধু বৃটিশ কেন, পর্তুগীজ, মোগল, পাঠান, আলেকজান্ডার ও চেঙ্গিস খাঁর মতো দুর্ধর্ষ লোকও এসেছে এই শ্যামল বাংলার রূপের নেশায়। কিন্তু কেউ টিকতে পারেনি; সবাই একে একে এ জাতির বীরত্ব ও জাতীয় চেতনাবোধের কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়েছে।

তারপর সবশেষে চেপে বসলো এ জাতির ঘাড়ে ধর্মের বুলি নিয়ে বিধর্মী পশ্চিমাগোষ্ঠী। শাসনও করলো; পদলেহী কুকুর বাঙালীদের সহযোগিতায়।

তারপর একদিন এই শাসক গোষ্ঠীরা এ দেশের সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে এদের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চাইলো। ওরা চাইলো এদের মুখের বুলিকে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু সজাগ বাঙালীরা তা বুঝে ফেললো – তারা এর প্রতিবাদ করেছিল – আর তাই তাদেরকে গুলির মুখের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু বীর বাঙালী দমেনি। তারা গুলিকেও উপেক্ষা করে তাদের ঐতিহ্যকে বজায় রাখার প্রকল্পে শহীদ হয়ে রক্ত দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। অকাতরে রক্ত দিয়েছিল বাঙালী। কিন্তু নিষ্ঠুর পাষাণ, পশুর দল, তাদের অপচেষ্টা থেকে কোনদিনও পিছপা হয়নি? তারা চেষ্টা করেছিল এ দেশের মানুষের হাত থেকে রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়ার জন্যে; তাতেও তারা সফল যখন হতে পারলো না তখন তাদের শেষ প্রচেষ্টা – "এদেশের মানুষের প্রয়োজন নেই, চাই শুধু এর শ্যামল মাটি" – এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে অতর্কিতে তারা চালালো ট্যাংক হামলা। হত্যা করলো নারী-পুরুষ শিশু নির্বিশেষে এ দেশের হাজার হাজার নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে।

তারপর বাংলার বুকে তথা বিশ্বের বুকে শুরু হলো আর এক রক্তাক্ত ইতিহাস। এবার আর বাংলার দেশরক্ষী বাহিনী – বাংলার রয়েল বেঙ্গল টাইগার – যাঁদের ঐতিহ্যের কথা ১৯৬৫ সালে বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে – তাঁরা বাংলার রয়েল বেঙ্গল টাইগারগণ তুলে নিল অস্ত্র। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ডাকে তারাও সাড়া দিল; তারাও বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রু সেনাদের উপর; ওদেরকে এ দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে এই প্রতিজ্ঞায়।

দস্যু পশু বাহিনী হতভম্ব। ওরা ভেবেছিল হয়তোবা অতি সহজেই কিছু লোক মেরে এদেশ, তাদের আওতায় করে নেবে। কিন্তু এবার তার উল্টোটা। এবার তাদের অস্ত্র হাতে নিয়েও প্রাণ দিতে হচ্ছে কুকুর শেয়ালের মতো। যখন তারা বাংলার বীর জোয়ানদের হাতে বেদম মার খাচ্ছে এবং হাজার হাজার লোক বিড়াল-কুকুরের মতো মরছে; তখন তারা আর কোন গতি না দেখে সামরিক নিয়ম ভেঙ্গে মারা শুরু করলো এ দেশের নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে; আর লুটে নিল এ দেশের মা-বোনের ইজ্জত। এ অবস্থা দেখে বাংলার বীর জোয়ান তরুণরা পাগল প্রায় হয়ে; উঠে পড়ে লেগে গেল শত্রু সেনা হত্যা করতে যে করেই হোক এদেরকে খতম করে এ দেশকে উদ্ধার করতেই হবে।

কর্নেল সফিউল্লাহ। শত্রুর রক্ত খেকো বাংলার একটি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এর নাম। ১৯৭১ সালের নয় মাসের বাঙালী হত্যাযজ্ঞের ইতিহাসের সাথে বিশ্ববাসী এই বীর বাঙালীকে চিরদিন স্মরণ রাখবে। পাক-পশু কর্তৃক বাঙালী হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস পৃথিবীর করুণতম ইতিহাস। পৃথিবী কোনদিন এ জঘন্যতম ইতিহাসের

এই কালো দিকটাকে ভুলবে না। ভুলবে না – বাঙালী জাতির বীরত্বের কাহিনী। কেমন করে এক সুসজ্জিত গোলন্দাজ ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাথে প্রায় খালি হাতে লড়ে ৩০ লাখ লোকের রক্তের, আর ২ লাখ-আড়াই লাখ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এদেশকে স্বাধীন করলো। সত্যিই পৃথিবীর জন্মাবধি; এক শ্রেষ্ঠতম কালো ইতিহাস। মনে রাখবে বিশ্বের মানুষ; আর বাঙালী জাতির বীরত্বের সাথে নিবেদিত প্রাণ কর্নেল শফিউল্লার কথা।

সেদিন ২৬শে জুলাই, ১৯৭২। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে স্বাধীনতার অন্যতম বীর সৈনিক জনাব কর্নেল খালেদ মোশাররফ আমাকে জানালেন যে আগামী ২৯শে জুলাই অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যে ৭টায় আপনার সঙ্গে কর্নেল সফিউল্লাহ কথা বলবেন। আমি সেভাবেই সেদিন ফিরে এসেছিলাম।

তারপর ২৯শে জুলাই সন্ধ্যে ৭টা। জনাব কর্নেল সফিউল্লাহ সাহেবের ক্যান্টমেন্টস্থ জিওসি হাউজ বাস ভবন। আমি তার ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল সাহেব আসলেন। সাধারণ বেশভূষা। প্রথমত দেখে মনে হলো তিনি আমাদেরই মতো স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ। কিন্তু আলাপের পর সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে তার মধ্যে এক ধরনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে রয়েছে।

আমার প্রথম প্রশ্ন: আমি তার কাছে জানতে চাইলাম যে তিনি ২৫শে মার্চের পর কিভাবে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রারম্ভিক উত্তরে তিনি বল্লেন আপনি লিখুন; লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এম এম নাসিম, মেজর আজিজ, মেজর মতিউর রহমান, মেজর সুবেদ আলী ভূঁইয়া, ক্যাপ্টেন মোরশেদ; ক্যাপ্টেন এজাজ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এন নূরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন সৈয়দ ইব্রাহিম, লেফটেন্যান্ট সাঈদ, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন বদিউজ্জামান, নূরুল ইসলাম ও লেফটেন্যান্ট মান্নান। লেখা শেষ হলে তিনি বল্লেন, আমার পাশাপাশি এসব জুনিয়র অফিসারদের নাম না থাকলে আমার বক্তব্য ভুল হবে। যেহেতু এঁরা সবাই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক একজন অতন্দ্র প্রহরী। তারপর তিনি শুরু করলেন তার বিস্তারিত বক্তব্য। আমি প্রশ্ন করে যাচ্ছি আর তিনি বক্তা – আমি আর একদিকে নিউজপ্রিন্টে নোট করছি। – তিনি বল্লেন আমাকে বলতে হলে ২৫শে মার্চের কিছু আগে চলে যেতে হয়।

সবে মাত্র ইলেকশন হয়ে গেল। বাঙালীদের রায় একচেটিয়া অথচ ওরা; পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা গোষ্ঠীরা ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি দেখে, আমরা যারা শুধুমাত্র খাকী পোশাক পরিহিত অবস্থায় কেবল সরকারের নির্দেশ মান্য করতাম – তারাও কিছুটা রাজনৈতিক হালচালের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি; (যদিও সম্পূর্ণ অন্যায় তবুও)

ভাবছি; ওরা ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাতো দূরের কথা; সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন। এটা সত্যিই আমি এবং আমার মতো আরও বাঙালী অফিসারদের মনে এক তীব্র প্রশ্ন জেগে উঠেছিল সে সময়। তারপর সেদিন ২৭শে ফেব্রুয়ারী (বিকাল) পশ্চিম পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এক গোপন বৈঠক ডাকেন; সেখাবে শুধু বাঙালী কর্নেল মাসুদুল হাসান খানকে ডাকা হয়েছিল। কনফারেন্সের পর কর্নেল মাসুদুল হাসান খান পরে এক অফিসারদের মিটিং ডাকেন। এই মিটিং-এর মাঝে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল সফিউল্লাহ, মেজর মঈন, মেজর আসজাদ লতিফ (পশ্চিমা), মেজর কাজেম কামাল (পশ্চিমা), মেজর নূরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন আজিজ, ক্যাপ্টেন এজাজ, ক্যাপ্টেন নাগবি, ক্যাপ্টেন রেয়াজ, লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম ও লেফটেন্যান্ট মোরশেদ। এসব অফিসারদের উপস্থিতিতে কর্নেল মাসুদুল হাসান বলেন, দেশের অবস্থা খুবই খারাপ, ভারতের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে; এই সময় 'আর্মি'দের দেশের বিভিন্ন স্থানে যাওয়া দরকার। এবং সেই ভাবে ২নং বেঙ্গল টাইগার রেজিমেন্টের ১টি কম্পানীকে পাঠানো হলো ময়মনসিংহে, একটি কম্পানীকে পাঠানো হলো টাঙ্গাইলে আর দুটি থেকে গেল জয়দেবপুরে। টাঙ্গাইল আর ময়মনসিংহের ভার দেওয়া হলো কর্নেল সফিউল্লাহর কাছে। তিনি যাওয়ার আগে পাকবাহিনীর মনোভাব নোট করে নিয়ে যান। এবং এই সময়ই সমস্ত দেশের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে পাঞ্জাবীদের মনোভাব সম্পর্কে তিনি একটু সন্দিহান হয়ে উঠেন। এবং ১২ই মার্চ যখন তিনি আবার জয়দেবপুরে আসেন তখন ওখানকার মিলিটারীদের আকার ইঙ্গিতে একটু সজাগ করে দিয়ে আসেন। জয়দেবপুর আসার পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব জয়দেবপুরে বাঙালী সৈন্য সমাবেশে বাংলায় এক ভাষণ দেন, যে ভাষণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেদিন। 'তোমাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে আমার বিশ্বাস তোমরা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা তোমাদের ঐতিহ্য বজায় রাখবে' – এই ভাষণটার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক অফিসারদের সেই সময়কার কার্যকলাপের উপর কিছুটা পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। এবং সাহেবজাদা ইয়াকুব যেন পরোক্ষভাবে এই বলে গেলেন যে তোমরা বাঙালী সৈন্যরা তোমাদের বাংলাদেশকে রক্ষা করিও – সেদিন বক্তব্যের সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবের চোখ প্রায় অশ্রু এসে গিয়েছিল – মনে হয়েছিল এই তার শেষ ভাষণ বাঙালী সমাবেশে এবং এই জেনারেলকে ইয়াহিয়া বাঙালী প্রীতি মনোভাব দেখে পাকিস্তান আর্মি থেকে সরিয়ে দিলেন। এ কথাগুলো আমাকে বল্লেন কর্নেল সফিউল্লাহ।

১৭ই মার্চ তারিখে জয়দেবপুরে একটি গুজব রটে। সেটি হচ্ছে ২নং বেঙ্গল টাইগার রেজিমেন্টকে অস্ত্রহীন করা হচ্ছে। এই শুনা মাত্রই জয়দেবপুর এলাকার জনগণ

খুবই ব্যস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়ে। এবং তারা মরিয়া হয়ে ঢাকা হয়ে জয়দেবপুর আসার পথে প্রায় ৫০টি প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। পরে পাক বাহিনীর চাপ সৃষ্টি হতে পারে এই ভেবে কর্নেল সফিউল্লাহ নিজে বাঙালী সমাবেশে যেয়ে এই কথা বুঝাতে চেষ্টা করেন যে আপনারা স্থির হউন এবং আপনারা জানবেন আমরাও মিলিটারী যারা আমাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে আসবে তারাই আমাদের শত্রু – আমরা অস্ত্র পাক বাহিনীর হাতে তুলে দেবো না এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত থাকুন। এরপরে জনগণের মধ্যে এক বিপুল সাড়া জেগেছিল বাংলার 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' জনাব কর্নেল সফিউল্লাহর কথায়।

তারপর ১৯ তারিখে পাক ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবারের 'তার' আই হ্যাভ মিট উইথ এ বেরিকেড, আই এম উইসিং সিভিলিয়ন টু ক্লিয়ার ইট, ইউ ক্লিয়ার ইয়োর সাইড এ্যান্ড মিট মি, রুট, ইফ দেয়ার ইজ এনি অপজিসন ইউর ম্যাক্সিমাম ফোর্স' – কর্নেল সফিউল্লাহর কাছে। তারপর জয়দেবপুর আসলো ব্রিগেডিয়ার। ওর সাথে আরটিলারীর একজন রেজিমেন্টাল অফিসার, ট্যাংক স্কোয়াড্রনের একজন অফিসার ইনফ্যানটারীর একজন অফিসার কমান্ডার. একজন অফিসার এবং ৭০জন পাকসৈন্য প্রত্যেকের কাছে এলএমজি।

কর্নেল সফিউল্লাহ আমাকে জানালেন ঐদিনই তাকে অস্ত্রচ্যুত করার কথা ছিল। কেননা এসব মিলিটারীর বিভিন্ন দিকের অফিসারদের আনার কারণই হচ্ছে যদি জয়দেবপুরে বাঙালী মিলিটারীদের অস্ত্রহীন করা হয় তবে কোন দিক হতে কিভাবে আক্রমণ করা হবে তাঁর জন্যই ঐসব আরটিলারী কমান্ডো এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের আনা হয়েছে। পাক মিলিটারী এসেছে জয়দেবপুর বাঙালীদের অস্ত্রচ্যুত করার জন্যে একথা শুনেই সেই এলাকার প্রায় ৫০,০০০ হাজার জনগণ জমায়েত হয়েছিল সে দিন তারা শ্লোগান দিচ্ছিল বিভিন্ন সুরে।

তারপর ব্রিগেডিয়ার আরবার বলল কর্নেল মাসুদকে যে 'ক্লিয়ার দিস বেরিকেড উইথইন টুয়েন্টি মিনিটস' পরে মেজর মঈন সেখানে গেলেন, খুবই কষ্টে ৫০,০০০ হাজার জনগণকে লক্ষ্য করে ৬৩ রাউন্ড গুলি খরচ করে ২জনকে মেরেছিলেন ও ৪জনকে আহত করেছিলেন। এবং এর জন্যে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়েছে যে এত মানুষের মধ্যে গুলি করে মাত্র ২জন কেন মরলো। কর্নেল মাসুদুল হাসান খানকে জবাবদিহির জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যেতে হয়েছিল – পরে তিনি তার ফিরে আসেননি। এই ঘটনার পর পাঁচজন বাঙালী সৈন্য অস্ত্র সহকারে পালায়। ও এর জন্যেও কর্নেল সফিউল্লাহকে খুবই বিপদে পড়তে হয়। পরে কর্নেল মাসুদুল হাসান ঢাকা থেকে আর না আসলে ২৩, ২৪, ২৫ তারিখ মার্চ পর্যন্ত কর্নেল সফিউল্লাহকেই অফিসের কাজ চালাতে হয়।

ইতিমধ্যে মার্চের ৯ তারিখে কর্নেল সফিউল্লাহ ও কর্নেল খালেদ মোশাররফের মধ্যে এক গোপন বৈঠক রয়েছে – তাহলো যদি ওরা অস্ত্র কেড়ে নিতে চায় তবে তারা উভয়েই দেবে না এবং এরপরে যদি কোন রকম চাপ সৃষ্টি হয় তবে তারা বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে হানাদারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে এবং সেই অনুযায়ী যার যার দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে।

তারপর ব্রিগেড কমান্ড থেকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আসছেন ও কর্নেল রকিব আসছেন। তাঁরা যথাক্রমে ২৫ তারিখে দুপুর ২টা ও আড়াইটার মধ্যে এসে গেলেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এসে কর্নেল সফিউল্লাহকে জানালেন, 'সফিউল্লাহ আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না, কি হবে। এ পর্যন্ত যতগুলো মিলিটারী গোপন বৈঠক হয়েছে সবই আমাকে বাদ দিয়ে করা হয়েছে – আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সজাগ থেকো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এক সময় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। পরে এই ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ত্রিশালের দিকে কাছেই তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন। এবং কর্নেল রকিব এসে জয়দেবপুরের কমান্ডিং অফিসারের (সিও) চার্জ নিলেন ও কর্নেল সফিউল্লাহ সেকেন্ড কমান্ডিং ইন চিফ থেকে গেলেন।

২৪শে মার্চ রাত্রি ১২টায় ঢাকা থেকে টিক্কা খান ফোন করলো, গাজীপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে একটি কোম্পানী পাঠিয়ে দাও। পরে পাঞ্জাবী এক অফিসারকে দিয়ে একটি ট্রুপ সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেই সময় ময়মনসিংহের ট্রুপ কমান্ডার ছিলেন মেজর নূরুল ইসলাম। টাঙ্গাইলে ছিলেন মেজর কাজেম কামাল। গাজীপুরে মেজর আমজাদ লতিফ। জয়দেবপুরের ২টি কোম্পানী কমান্ডার একটি মেজর মঈন ও আর একটি ক্যাপ্টেন নগরী। রাজেন্দ্রপুর যে প্লাটুন রয়েছিল সেটা অস্ত্র পাহারাদার বাঙালী প্লাটুন এবং এই বাঙালী একটা প্লাটুনের সঙ্গে তিনটি পাঞ্জাবী প্লাটুন।

২৫শে মার্চের রাত ২টার সময় কর্নেল মাসুদ কর্নেল সফিউল্লাহকে ফোন করলেন তাঁর বাসা থেকে – ঢাকায় অনেক বড়ো বড়ো ভারী শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের ওখানকার খবর কি? – এরপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন বিচক্ষণ সামরিক বাঙালী অফিসার কর্নেল সফিউল্লাহ অনেক চিন্তা করলেন এবং সামগ্রিক পরিস্থিতিকে মুহূর্তখানেক ভেবে স্থির করলেন যে এখানে বাঙালী সৈন্যগণের আর কোনমতোই থাকা ঠিক হবে না। যে কোন সময় এই জয়দেবপুর ক্যাম্প পাকবাহিনী আক্রমণ করতে পারে।

তারপর সারারাত দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটলো কর্নেল সফিউল্লাহর। পরের দিন ২৬শে মার্চ তারিখ দেখতে গেলেন রাজেন্দ্রপুর থেকে হেলিকপ্টারযোগে অস্ত্র নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত তিনি কোনও খবর সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি। অনেক চেষ্টা করেও যে ঢাকায় কি হচ্ছে। ২৬ তারিখ বিকেলে টঙ্গীতে গণ্ডগোল হলো। লোক মাবার জন্যে একটা ট্রুপও সেখানে গেল। তারপর বাংলার বাঘ কর্নেল সফিউল্লাহ আর স্থির থাকতে পারলেন না। এর মধ্যেই একজন সাধারণ লোক এসে খবর দিয়ে গেছে ঢাকায় হাজার হাজার মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে আর আপনারা এখানে বসে কি করছেন – এবং ইতিমধ্যেই ময়মনসিংহ থেকে মেজর নূরুল ইসলামের তার এসেছে যে তাঁদের এখন কর্তব্য কি। ইতিমধ্যেই ময়মনসিংহের পাঞ্জাবী সৈনিকরা তাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করলে তারাও পাল্টা আক্রমণ করে প্রায় ৫৫-৫৭ জন খতম করেছে আর বাঙালী মারা গেছে মাত্র ২জন। এবার তিনি অর্থাৎ কর্নেল সফিউল্লাহ আর স্থির থাকতে পারলেন না। এবার তিনি সোজাসুজি সিওকে বল্লেন যে আপনি যান বা না যান আমি অর্ধেক ট্রুপ সহকারে ময়মনসিংহ চলে যাচ্ছি, ওখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। আমি আর এখানে এক মুহূর্তও থাকতে রাজী নই। এবং ২৭শে মার্চ সকাল ১০টার সময় কর্নেল সফিউল্লাহ প্রায় দেড় কোম্পানী সৈন্য নিয়ে ৪টা জীপ, ৩ টনী ট্রাক ৬টা, ডজ গাড়ী ২টা ও একটি এ্যাম্বুলেন্স সহকারে টাঙ্গাইল হয়ে ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা দিলেন। যাবার সময় সমস্ত জয়দেবপুর খালি করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেলেন এবং জয়দেবপুরের সমস্ত পাক আর্মীদের একটি লিস্ট করে বাকী সৈন্যদের হাতে দিয়ে গেলেন ও নির্দেশ দিয়ে গেলেন, যদি ময়মনসিংহ যেয়ে আমি কোন খারাপ সংবাদ পাই তবে তোমাদের জানাবো এবং তোমরা সেই মতো এইগুলোকে খতম করে চলে এসো।

কর্নেল সফিউল্লাহ টাঙ্গাইল পৌছার ২ মাইল আগে বাধা পেলেন। পরে তিনি জীপ থেকে নেমে জনগণকে বোঝালেন যে তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে পাক-দস্যুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। এই সংবাদ শোনার পরেই সেদিন টাঙ্গাইলে এক মহা আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। এবং বহু জনগণ এই অসাধারণ বাঙালী বীর অফিসারকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কর্নেল সফিউল্লাহর গাড়ীতে সেই সময় বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল। পরে তিনি টাঙ্গাইলে লেফটেন্যান্ট মোরশেদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এবং একজন পাঞ্জাবী মেজরকে বন্দী রেখে ময়মনসিংহে চলে আসেন। ময়মনসিংহ আসার পথে বহু বেরিকেড ঠিক করে আসতে আসতে রাত প্রায় ২টা বেজে যায় পথিমধ্যে। তিনি রাত ২টার সময় মুক্তাগাছায় কোন এক স্কুলে এই রাতটুকু কাটান। পরের দিন ২৮শে মার্চ তিনি ময়মনসিংহ যেতে যেতে প্রায় দিন ১২টা পর্যন্ত সময় নেন।

এদিকে তাঁর কোনরকম সংবাদ ব্যতিরেকেই বাঙালী জোয়ানরা জয়দেবপুরে ২৭ তারিখ রাত্রে ৬০জন পাকবাহিনী ও ৩জন অফিসারসহ হত্যা করে টাঙ্গাইল চলে

আসেন। অবশ্য তাঁদের উপর পাকবাহিনী আগে আক্রমণ করেছিল। ওদিকে কর্নেল রকিবের এই দলের সঙ্গে আসার কথা ছিল, তিনি না এসে পাকবাহিনীর দলে যোগদান করেছিলেন পরবর্তী সময়ে এবং পশ্চিম পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। এদিকে কর্নেল সফিউল্লাহর এই দল জয়দেবপুরে ৬৩জন পাক সৈন্য হত্যা করে বীরবিক্রমে টাঙ্গাইল প্রবেশ করলে টাঙ্গাইলবাসীগণ তাঁদের বীরোচিত সম্বর্ধনা দেন। পরে এই দলটি টাঙ্গাইলে বসে উক্ত কর্নেল সফিউল্লাহ কর্তৃক আটককৃত পাক মেজরসহ আরও কয়েকজন পাকবাহিনীকে খতম করে তাঁরাও ময়মনসিংহে কর্নেল সফিউল্লাহর সাথে যোগদান করেন। এদিকে ময়মনসিংহের চার্জে যিনি ছিলেন, মেজর নূরুল ইসলাম, তিনি ৫৫-৫৭জন পাকবাহিনী মেরে, কর্নেল সফিউল্লাহকে পেয়ে তার হাতে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে বলেন, আপনিই আমাদের কমান্ডিং ইন চিফ, আপনি আমাদের নির্দেশ দিন, এতদিন আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলাম। এই সময় কর্নেল সফিউল্লাহ একটি দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে যান, সেটি হলো তিনি মিলিটারী রিভোল্ট করলেন একটি কায়েমী সরকারের বিরুদ্ধে, এটা কি ঠিক হলো না খারাপ হলো এবং আরো কোন বাঙালী অফিসার কি বাংলাদেশের জন্যে যুদ্ধ শুরু করেছে না তিনি একাই। দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি ময়মনসিংহ পুলিশ ওয়ারলেস সেটে গিয়ে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী ওয়ারলেস করেছিলেন যে, 'ময়মনসিংহ ইজ আনডার মাই কমান্ড, আই এ্যাম কর্নেল সফিউল্লাহ স্পিকিং, ইউ পুলিশ অব বাংলাদেশ ফাইট এগেনস্ট দি পাকিস্তানী আর্মী'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তাঁর কাছে সেই সময় জয়দেবপুর থেকে অন্য দুইটি ওয়ারলেস সেট ছিল। ইতিমধ্যেই তিনি শুনেছিলেন যে ঢাকায় রাজারবাগ এবং অন্যান্য পুলিশ ব্যারাক ঘেরাও করে পাকবাহিনী বহু পুলিশ হত্যা করেছে।

ওয়ারলেস করেছেন সমস্ত বাংলাদেশের পুলিশ স্টেশনে এবং মিনিট বিশেকের মধ্যেই তিনি মেসেজ পেতে থাকেন। প্রথমে বগুড়া পরে পাবনা এবং রাজশাহী, দিনাজপুর, ফেনী, নোয়াখালী, খুলনা ও কুষ্টিয়া থেকে। তারা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে পাক-দস্যুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে – এবং এখন পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ চলছে।

এইসব সংবাদ শোনার পরে বাংলার বাঘ কর্নেল সফিউল্লাহ হাজারগুণ শক্তি পেয়ে গেলেন মনে এবং তাঁর মনের সংশয়ও দূর হলে গেল যে তিনি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মত একজন স্বাধীনতা সৈনিক। সেই দিন সমস্ত সময় তিনি গভীর চিন্তার মধ্যে কাটান এবং ভাবেন কি করে এত বড়ো একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর হাত থেকে দেশ মাতৃকাকে উদ্ধার করা যাবে। তিনি মাঝে মাঝে তার দুইটা ওয়ারলেসের একটি দিয়ে পাকিস্তানের 'ফ্রিকয়েন্সী'তে ধরতেন এবং শুনতে পেতেন – 'গিভ আপ অল অব দি ব্লাডি ডেড বডিস – স্ম্যাশ এভরিথিং (পাক কমান্ড)'

এবং সব সময় চিটাগাং ধরে তিনি শুনত পেলেন 'উই ক্যাপচার্ড চিটাগাং পুলিশ ব্যারাক, ওয়ান ফিফটি অব দি ব্যারাক অলরেডী রান আউট, উই নীড এয়ার এ্যাটাক' – এইসব পাক উক্তি শুনে বাংলার 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এর মনে আগুন জ্বলে উঠে। তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, যে করেই হোক তাকে ঢাকা আক্রমণ করে ঢাকা থেকে পাকবাহিনী সরাতে হবে। এর মধ্যেই তিনি জানতে পেলেন কর্নেল জিয়া চিটাগাং-এ যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন এবং তিনি রেডিওতে বলে দিয়েছেন, আমি পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, বাংলাদেশের প্রত্যেক জনগণ তোমরাও পাকবাহিনীর বিরুদ্ধ অস্ত্র ধরো। কর্নেল সফিউল্লাহ আরও জানতে পারলেন, চিটাগাং-এ প্রচুর পাকবাহিনী মারা পড়েছে।

২৯ তারিখে তিনি শুনতে পেলেন যে, জয়দেবপুরে পাকিস্তানীরা এয়ার এ্যাটাক করেছে। এবং একটি ফোকার জেট দিয়ে জয়দেবপুরে অনবরত বোমা ফেলানো হচ্ছে। পাকবাহিনী মনে করেছে এখনও বাঙালী সৈন্যরা ওখানেই রয়ে গেছে। এখানে একটা কথা না বলে পারা যায় না যে এই কর্নেল সফিউল্লাহ খুবই বিচক্ষণতার সাথে সবগুলি কাজ করেন। তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে কখনোও পাকবাহিনী এতটুকুও বুঝতে পারেনি যে তিনি বাংলাদেশের আন্দোলনকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। এক সময় ব্রিগেডিয়ার জাহানজের আরবার প্রায় ৭০জন পাক সৈন্যকে নিয়ে জয়দেবপুরে এসে দেখেছিল কর্নেল সফিউল্লাহর দুই কোম্পানীও সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত এবং সমস্ত জয়দেবপুর ক্যাম্পটার চারদিকে মেশিনগান ফিট করে প্রস্তুত হয়ে আছেন। এবং ব্রিগেডিয়ার আরবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'সফিউল্লাহ এতনা মেশিনগান কিউ আওর সবলোগ এ্যাহছা তৈয়ার কিউ?' – উত্তরে কর্নেল সফিউল্লাহ বলেছিলেন, 'এনিমি, এ্যান্ড এনিমি অল এ্যারাউন্ড দ্য এনিমি; এ্যান্ড আই এ্যাম রেডি টু ফেস দ্যা এনিমি' – একথা শুনেই ব্রিগেডিয়ার আরবার আর বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি সেখানে। দলসহ চলে এসেছে, হয়তো ভেবেছিল যে তাদের প্ল্যান সফিউল্লাহ বুঝে ফেলেছে।

সত্যিই সেদিন যদি সফিউল্লাহ এই বিচক্ষণতার পরিচয় না দিতেন তবে হয়তো সেদিনই ২নং বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ডিসআর্মড করা হতো – আমরা হারাতাম এক অসীম সাহসী যোদ্ধা কর্নেল সফিউল্লাহকে।

তারপর কর্নেল সফিউল্লাহ তড়িৎগতিতে সব কাজ করতে লাগলেন। তিনি ময়মনসিংহের পুলিশ বাহিনীর একটি দলকে বাহাদুরাবাদ ঘাটে পাঠালেন, যেন নর্থ বেঙ্গল থেকে কোনও পাকবাহিনী ময়মনসিংহের দিকে আসতে না পারে। আর দুইটা দলকে পাঠালেন সিরাজগঞ্জে যাতে করে সিরাজগঞ্জ থেকে কোন শত্রু সেনা ময়মনসিংহের দিকে আসতে না পারে। আর দুইটি ইপিআর দল পাঠালেন ঢাকার

মিরপুর-মোহাম্মদপুর রোডে যাতে করে পাকবাহিনী জয়দেবপুর হয়ে টাঙ্গাইলের পথে ময়মনসিংহ না আসতে পারে। এইসব কাজ কর্নেল সফিউল্লাহ খুবই তড়িৎগতিতে করেন। এবং খুবই বিচক্ষণতার সাথে। এখানে বলে রাখা উচিৎ যে কর্নেল সফিউল্লাহ দুইটি ওয়ারলেসের মধ্যে একটি ওয়ারলেস সেট দিয়ে সবসময় পাকবাহিনীর চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করতেন। এবং টিক্কা কোথায়। এসব খবর নিয়ে তিনি সাথে সাথেই তাঁর সম্ভবমত অল্প সৈন্য নিয়ে ডিফেন্স তৈরী করতে থাকেন। আর তিনি যে বাহাদুরাবাদ, সিরাজগঞ্জ ও মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে তার সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন, শুধুমাত্র এই ওয়ারলেস মারফত তাদের খবর নিতেন।

এইসব দল বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে তিনি নিজে মার্চ মাসের ২৯ তারিখ বিকেলে কিশোরগঞ্জ চলে আসেন। এবং ওয়ারলেসের খবর মারফত তিনি চলার পথে নরসিংদিতে ডিফেন্স পাঠানোর চিন্তা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে এখানে কর্নেল খালেদ মোশাররফের সাথে তাঁর দেখা হয়ে যায়। এবং যুদ্ধগত দিক নিয়ে তিনি কর্নেল খালেদ মোশাররফ-এর সাথে বহুক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ আলাপ করেন। এরই মধ্যে ডেমরা হয়ে তাঁর দলের সৈন্যরা ঢাকা আক্রমণ করেছে কয়েকবার এবং ৩০শে মার্চ টাঙ্গাইল-মির্জাপুর পথে তাঁর দলের সাথে এক সংঘর্ষে পাকবাহিনী ৮ ট্রাক মৃতদেহ নিয়ে যায় ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র হারায়। অপরদিকে তাঁর দলের ৩০জন অমূল্য প্রাণ শহীদ হয়। এরপর টাঙ্গাইল-মধুপুর তাঁর দলের সাথে তুমুল সংঘর্ষ হয়েছিল পাকবাহিনীর। এপ্রিলের ২ তারিখে তিনি মেজর মতিউর রহমানসহ একটি শক্তিশালী দল পাঁচরুখি ও ঢাকার কাছে নরসিংদিতে পাঠান ডিফেন্স নেওয়ার জন্য। আর মেঘনার পূর্ব পারে আশুগঞ্জ, আজবপুর, সাউথ লালপুর, এসব গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় তিনি তিনটি বাহিনী মোতায়েন করেন – একটি বেঙ্গল রেজিমেন্ট, একটি ইপিআর ও একটি আনসার মোজাহিদের দল।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি ময়মনসিংহ থেকে আসার সময় ১৫০০ রাইফেল ও ৩ লাখ গুলি এবং কয়েকটি গাড়ী নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে কর্নেল ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের ট্রেনিং দেয়ানো শুরু করেছেন। এবং বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিফৌজ তৈরী করে বিভিন্ন দলের সঙ্গে অপারেশন করার জন্যে এই সময় থেকে পাঠাতে শুরু করেন। এদিকে তিনি আর একটি দল সিলেটের দিকে পাঠিয়ে দিলেন যাতে করে পাক-বাহিনী সিলেট থেকে শেরপুর ও সাধীপুর না আসতে পারে। এর মধ্যে তার একটি দল ভৈরব থেকে রামপুরার পুলটা ভেঙে দিয়ে পাকবাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। এপ্রিলের ১ তারিখে তাঁর দলের সাথে পাক-বাহিনীর এক বিরাট সংঘর্ষে পাক-বাহিনী ঐদিন ৯ গাড়ী মৃতদেহ নিয়ে যায়। এবং ২ তারিখে ওরা পিছনে হটে যেয়ে ভুলতা থেকে কর্নেল সফিউল্লাহর অবস্থানের উপর অনবরত ৪৮ ঘন্টা আরটিলারী ফায়ার দেয়। পাকবাহিনীর এই প্রচণ্ড আক্রমণে

তাঁর দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আবার পরে এই দল তাঁর নির্দেশে রামপুরাতে সক্রিয় হয়। তারপর দুইদিন উক্ত এলাকায় কোন পক্ষেরই সৈন্য ছিল না।

সিলেট, সাধীপুর ও শেরপুরে কর্নেল চিত্তরঞ্জন দত্ত কিছু লোক নিয়ে একটি দল গঠন করেন। এপ্রিলের ৭ তারিখে কর্নেল সফিউল্লাহ সিলেট দখল করেন। এই সময় শেরপুরে কম্পানী কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আজিজ। এখানে সিলেট দখল করার প্রাক্কালে বেশ কিছু পাকবাহিনী মারা যায়। ৭ তারিখেই পাকবাহিনীর বাকী লোক সিলেটের সালুটিকর বিমানবন্দরে জমায়েত হয়। খাদেমনগর এই সময় পাকবাহিনীর দখলে ছিল। পরে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে শত্রুবাহিনী ছত্রী সৈন্য এখানে নামায়; প্রায় এক ব্রিগেডের মত এপ্রিলের ১ তারিখেই কর্নেল সফিউল্লাহ মৌলবীবাজার এসে কর্নেল চিত্তরঞ্জন দত্তের সাথে দেখা করেন। জেনারেল ওসমানী কর্নেল সফিউল্লাহকে বললেন – তুমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাও। পরে কর্নেল সফিউল্লাহ ঐদিনই ছুটলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে।

৩রা এপ্রিল তারিখে তেলিয়াপাড়া টি-স্টেটে কর্নেল জিয়ার সঙ্গে দেখা হলো। কর্নেল সফিউল্লাহর সাথে কর্নেল খালেদ মোশাররফও ছিলেন সেখানে। কর্নেল জিয়া জানালেন, তাঁর কমপক্ষে দুটি বেঙ্গল রেজিমেন্টের দরকার। কর্নেল সফিউল্লাহ তাঁর একটি কম্পানীকে কর্নেল জিয়ার জন্য পাঠালেন। কর্নেল সফিউল্লাহর কম্পানীর কমান্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট আজিজ ও খালেদের কম্পানীর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন।

এরপর কর্নেল সফিউল্লাহ মেজর মতিনকে সরাইলে রাখলেন এবং তিনি মেজর মতিনকে এমন নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে সে যেন দরকার পড়লে লালপুর, আশুগঞ্জ অথবা আজবপুর সাহায্যের জন্য যেতে পারে। কর্নেল সালাউদ্দিন মোঃ রেজা ২৭শে মার্চ পায়ে হেঁটে ধীরশ্রম স্টেশনে এসে কর্নেল সফিউল্লাহকে জানালেন তিনি আসবেন কিনা। কর্নেল সফিউল্লাহ বললেন – আমি তৈরী আপনি আসেন। মার্চ মাসের ৩১ তারিখে কর্নেল সালাউদ্দিন মোঃ রেজা কর্নেল সফিউল্লাহর সাথে দেখা করেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। তারপর কর্নেল সফিউল্লাহ কর্নেল সালাউদ্দিন মোঃ রেজাকে জানালেন – আপনিই কমান্ডের ভার নিন কিন্তু কর্নেল রেজা বললেন তুমিই কাজ চালাও দরকার হলে আমরা পরামর্শ দিব।

৩১শে মার্চ তিতাস গ্যাস ফ্যাক্টরীতে এয়ার এ্যাটাক হয় এবং কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব আসলেন এখানেও তাঁকে এয়ার এ্যাটাকে পড়তে হয়। তারপর কোনক্রমে কর্নেল সফিউল্লাহ তাঁর অল্পসংখ্যক সৈন্য ও খুবই সীমিত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এসব কঠিন আক্রমণকে প্রতিহত করেন। পরে ৮ই এপ্রিল তারিখে ৬টা এয়ার ক্রাফট অনবরত সকাল ৫টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আশুগঞ্জ, ও আজবপুরে

বোম্বিং ও সেলিং করে। এই সময় কর্নেল সফিউল্লাহর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এবং ঐদিনই পাকবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন এলটিসি করে লালপুরে আর একটি রামপুরা ও ভৈরব লাইনে অগ্রসর হচ্ছিল। আর ৬টা কম্পানী তালসর ও আশুগঞ্জের মাঝামাঝি ল্যান্ড করেছে হেলিকপ্টার দ্বারা। এই সময় কর্নেল সফিউল্লাহ নিজে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। হেলিকপ্টারযোগে পাকবাহিনী নেমেই এইসব জায়গায় আরটিলারী ফায়ার দিতে শুরু করে। এই সময় কর্নেল সফিউল্লাহর দল এই প্রচণ্ড পাকবাহিনীর আক্রমণে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাকবাহিনী সেই সময় তালসর পর্যন্ত এসে গেছে। কর্নেল সফিউল্লাহর দল সীমিত অস্ত্র নিয়ে এই বিপুল আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে সাহাবাজপুর গ্রামে আসেন। পরে ছত্রভঙ্গ দলগুলি সাহাবাজপুর ও মাধবপুরে এসে একত্রিত হয়ে সাহাবাজপুরে তিতাস নদীর উপরের ব্রীজটা ভেঙ্গে দেন। পাকবাহিনী ভৈরব থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে সেলিং করে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করে। কর্নেল নাসিম, ক্যাপ্টেন মোরশেদ তাঁদের কম্পানী নিয়ে এখানে যুদ্ধ করেন। এপ্রিলের শেষের দিকে একটি সংঘর্ষে শত্রুপক্ষের প্রায় ২৫০ জন মারা যায়।

কর্নেল সফিউল্লাহ তাঁর দল নিয়ে সিলেটের তেলিয়াপাড়া, মনতলা, হরসপুর, মকন্দপুর – এই সব এলাকায় ডিফেন্স নেন। তেলিয়াপাড়াতে তিনি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন। ২ সপ্তাহ করে ছেলেদের ট্রেনিং দিয়ে অপারেশনের কাজে লাগাতেন। এই সময় তিনি প্রায় ৬০০ বেশী লোক ট্রেনিং দেওয়ান। এখানে তেলিয়াপাড়াতে প্রায় ২১ দিন যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ১৫০০ উপর পাকবাহিনী নিহত হয়েছে। তেলিয়াপাড়াতে পাকবাহিনী মোট পাঁচবার আক্রমণ করেছিল। এরপর পাকবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে কর্নেল সফিউল্লাহ এখানে থাকতে পারেন না। তার অস্ত্রশস্ত্র কম থাকার দরুন পরে তিনি মনতলা, হরসপুর ও মকন্দপুরে ডিফেন্স নেন।

জুন মাসের ২১ তারিখে পাকবাহিনী কর্নেল সফিউল্লাহর এই ডিফেন্সের উপর ৪টি বাটেলিয়ন নিয়ে চার দিক থেকে আক্রমণ করে। মাধবপুর-মনতালার দিকে একটি, মকন্দপুর-হরসপুরের দিকে একটি, চানজরা-হরসপুরের দিকে একটি এবং আরও কিছু কমান্ডো হেলিকপ্টার দিয়ে নামে। ৭ জুনের এক যুদ্ধে সিলেট সালুটিকর বিমানবন্দরে প্রায় ৫০-৬০জন পাঞ্জাবী মারা যায়। এর পরপরই শেরপুর মাধবপুরে এক দুর্ধর্ষ সংঘর্ষ হয়; এই যুদ্ধে লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাসিম ও ক্যাপ্টেন মোরশেদ আহত হয়। কিন্তু এই আহত অবস্থা নিয়ে এঁরা দুইজন বাঙালী অফিসার যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁরা ভালো হয়ে যান।

২১শে জুন তারিখে কর্নেল সফিউল্লাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে ভারতের আগরতলার উত্তরে 'হেজামারায়' ৩নং সেক্টর গঠন করেন। এবং পরে তিনি এখান থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই ৩নং সেক্টরের আওতায় মকন্দপুর (বামুটিয়া), কলকবিয়া, আশরামবাড়ী, হাতকাটা, বাঘাইবাড়ী, সিমনা, কাতলামারা, মনতলা, বিজয়নগর ও খোরাই সাব-সেক্টর গঠিত হয়। এই সব সেক্টরগুলির সর্বাধিনায়ক ছিলেন কর্নেল সফিউল্লাহ এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক এখানে যুদ্ধ পরিচালনা হয়। এই সব সেক্টরগুলির সেক্টর কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাসিম, মেজর আজিজ, মেজর মতিউর রহমান, মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়া, মেজর মতিন, ক্যাপ্টেন মোরশেদ, ক্যাপ্টেন এজাজ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এন নূরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন সৈয়দ ইব্রাহিম, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন বদিউজ্জামান, নূরুল ইসলাম, ও লেফটেন্যান্ট মান্নান, কর্নেল সফিউল্লাহ। এই ৩নং হেজামারা সেক্টরে এসে ২৫ হাজার গেরিলা যোদ্ধা তৈরী করে যুদ্ধের জন্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় পাঠান। এবং এখানেই তিনি গঠন করেন বিখ্যাত 'এস ফোর্স'। এই এস ফোর্স ব্রিগেড-এ সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২টি ব্যাটিলিয়ন থাকে ও ১১নং ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটিলিয়ন ও আর একটি ব্যাটিলিয়ন তিনি নিজে তৈয়ার করেন। এবং এই তিনটি দুর্ধর্ষ ব্যাটেলিয়ন নিয়ে বিখ্যাত দুর্ধর্ষ 'এস ব্রিগেড' গঠন হয়।

কর্নেল সফিউল্লাহ পরে ৩নং হেজামারা সেক্টরটি মেজর নূরুজ্জামানের উপর ভার দিয়ে এস ফোর্সের ১নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডারের ভার দেন কর্নেল নুরুজ্জামানের উপর; ২নং এস ফোর্সের কমান্ড করেন মেজর মঈন ও ৩নং এস ফোর্সের কমান্ড দেন কর্নেল নাসিম। দুর্ধর্ষ এস ফোর্স নিয়ে কর্নেল সফিউল্লাহ পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি আখাউড়া আক্রমণ করেন। ডিসেম্বরের ১ তারিখে এই দুর্ধর্ষ আক্রমণ করা হয়। এই আক্রমণের সময় নূরুজ্জামান ও মঈনের কম্পানী যায় আর নাসিমের ১১নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট রিজার্ভ রাখা হয় যাতে করে সিলেট থেকে মনতলা হয়ে পাকবাহিনী যেন পিছন থেকে এই দলকে আবার আক্রমণ না করতে পারে। প্রথম আক্রমণেই তিনি আজমপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত দখল করেন। আবার ২ তারিখে যখন পাকবাহিনী সফিউল্লাহর বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তখন আবার সফিউল্লাহর বাহিনী সিঙ্গারবিল পর্যন্ত চলে আসেন। ৩ তারিখে আবার তিনি আজমপুর স্টেশন দখল করেন। এবং এই আক্রমণের সময় পাকবাহিনীর ১১ জন সৈন্য মারা যায়। এর মধ্যে তাঁর দলের ২ জন সিপাই ও ১ জন সুবেদার মারা যায়। ৪ তারিখে আবার আক্রমণ করা হলে সফিউল্লাহর বাহিনী থেকে ১জন ক্যাপ্টেন জনাব বদিউজ্জামান শহীদ হন ও ২ জন সৈনিকও শহীদ হন। ইতিমধ্যে ৩ তারিখে পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর কর্নেল সফিউল্লাহর 'এস ফোর্স' ও মিত্র

বাহিনী মিলে ৪ তারিখ থেকে ৫ তারিখের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই আখাউড়া এলাকায় ১৫০জন পাকবাহিনী মারা যায়। পরে কর্নেল সফিউল্লাহ প্ল্যান করেন তিনি ঢাকা আক্রমণ করবেন কিন্তু কোন রকম যানবাহন না পেয়ে তিনি হেঁটেই রওয়ানা দেন। তাঁর সাথে ছিলেন একজন ইন্ডিয়ান অফিসারসহ তাঁর কয়েকজন জুনিয়র অফিসার।

এখানে তাঁর একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। সেটা হলো, স্থানীয় ইসলামপুর এলাকায় যখন তাঁরা এসে পড়লেন, তখন একটি পাক গাড়ী ১৪ জন সৈন্যসহ আসছিল, তাদের দেখেই সফিউল্লাহ সারেন্ডার করতে বলেন কিন্তু তারা যুদ্ধ আরম্ভ করলে তিনি এক বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে যান। পরে তিনি পাশেই এক ডোবাতে নেমে পড়েন, এখান থেকে ডোবার পারে এক জীর্ণ ঘরে আশ্রয় নেয় এবং তিনি এই ঘর থেকে গুলির শব্দ শুনতে পান। পরে গোলাগুলি বন্ধ হলে বেরিয়ে এসে দেখেন তাঁর ১৪ জন লোক আহত ও ওরা ২৫ জন নিহত এবং ১২ জনকে বন্দী করা হয়েছে। পরে সফিউল্লাহ উক্ত পাকবাহিনীর গাড়ীতে করে কাছেই এক হাসপাতালে যাচ্ছিলেন নিজে ড্রাইভ করে; এমন সময় নিজেদের দল শত্রু ভেবে গুলি শুরু করে, পরে কোনরকম ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে এ যাত্রা বেঁচে যান। এখান থেকেই তিনি ঢাকার দিকে রওয়ানা দেন ৭ই ডিসেম্বর শাহবাজপুরে আর একটি খণ্ডযুদ্ধ হয় ও পরে শত্রুরা ভেগে যায়। এখান থেকে তিনি সরাইল পৌছেন। ১০ তারিখের মধ্যেই শত্রু সৈন্য পিছনে হটে ভৈরবে এসে আশ্রয় নেয়। পরে কর্নেল সফিউল্লাহ ১১ নং বেঙ্গল দিয়ে ভৈরব ঘিরে রাখেন এবং তিনি নিজে রায়পুর হয়ে নরসিংদির দিকে রওয়ানা দেন। এখানে এসেই সংবাদ পান ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে শত্রু সৈন্য পালিয়ে আশুগঞ্জে এসেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর দল নিয়ে আশুগঞ্জে আসেন এবং এখানে ৮ ও ৯ তারিখ পর্যন্ত লড়াই হয়। পরে তিনি এখান থেকে পায়ে হেঁটে নরসিংদী আসেন এবং এসে দেখেন মিত্রবাহিনীর একটি ব্যাটিলিয়ন হেলিকপ্টারযোগে এখানে পৌছে গেছে। শত্রুবাহিনী পালিয়ে গেছে। ১২ই ডিসেম্বর তিনি শীতলক্ষ্যা পার হন। ১৩ই ডিসেম্বর ডেমরাতে একটি ছোটখাটো সংঘর্ষ বাধে পাকবাহিনীর সাথে। ইতিমধ্যে তিনি দুইটি দল ঢাকার বাসাবো এলাকা ও ঢাকা ক্যান্টমেন্টের জন্যে পাঠিয়ে দেন। ১৬ই ডিসেম্বর ডেমরাতে ৩০০ জন পাক সৈন্য তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এবং তিনি উক্ত সৈন্যসহ গাড়ী করে বেলা সাড়ে তিনটার সময় ঢাকা এয়ারপোর্টে আসেন। এর মধ্যে তিনি ডেমরার পরের এলাকা মাতুয়াইলে একবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি জেনারেল অরোরার সঙ্গে ১৬ তারিখ বিকাল ৫টার সময় রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যেই এস ফোর্সের আর একটি দল ঢাকা স্টেডিয়ামে পৌছে গেছে।

পরে তিনি ৩৫ নং মিন্টু রোডে তাঁর হেডকোয়ার্টার গঠন করেন। এই সেই বাংলার 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' কর্নেল সফিউল্লাহ। যিনি নাকি খুবই পরিকল্পিতভাবে ঢাকা-

জয়দেবপুর থেকে তাঁর সৈন্য নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং ঢাকায় এসে ঢাকা দখল করে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ করলেন। তিনি তাঁর যুদ্ধ ৯ মাসের মধ্যে ৮ মাসেরও অধিক সময় দেশের অভ্যন্তরে করেছেন এবং ১৫ ব্রিগেডেরও বেশী পাক সৈন্য খতম করেছেন। মাত্র একজন জুনিয়ার অফিসার শহীদ বদিউজ্জামানকে হারিয়েছেন ও কয়েক জন জুনিয়র কমিশন্ড সৈনিককেও হারিয়েছেন ও খুবই নগণ্য পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন বাংলার টাইগার কর্নেল সফিউল্লাহ। তিনি খুবই বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি খুব কমসময়ই পর অস্ত্রনির্ভর ছিলেন। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি পাকবাহিনী থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তাঁর স্থির লক্ষ্য ছিল ঢাকা এবং বহু বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন ঢাকাতেই উপস্থিত ছিলেন, কেউ তাঁকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। তিনটি ছেলেমেয়ে তাঁর। বড় ছেলের বয়স ৯ বৎসর। ক্লাস ফোরে পড়ে। দুটি মেয়ে। তাঁর স্ত্রী বহু ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত আগরতলাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সবশেষে কর্নেল সফিউল্লাহকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হলে তিনি খুবই বিচক্ষণতার সাথে সে প্রশ্নটির ধীরস্থিরভাবে উত্তর দেন।

'আচ্ছা পশ্চিম-পাকিস্তানে তো অনেক সিনিয়র অফিসার আছে; তারা অবশ্যই আপনার চেয়ে অনেক বেশী সিনিয়র এবং অনেকেই ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংক থেকে শুরু করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পর্যন্তও রয়েছে' –হ্যাঁ হ্যাঁ তা অবশ্যই আমার চেয়ে অনেক বেশী সিনিয়র অফিসার সেখানে আছে।

'আচ্ছা তাঁরা আসলে তাঁদের কোন র‍্যাংক দেয়া হবে; কিম্বা আপনিই বা তাঁদের কিভাবে গ্রহণ করবেন, কিংবা এমনও তো হতে পারে যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন থাকতে পারে অথবা তাদের মধ্যে কে কে যে পাকিস্তানী ভাবাপন্ন, তা আপনারা কিভাবে স্থির করবেন' 'দেখুন আমাদের মধ্যে এমনও বাঙালী অফিসার ছিল যারা এখানে থেকেও বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে অস্ত্র ধরেনি কিংবা এখান থেকে অনেকেই আবার ওপারে চলে গেছে। তাছাড়া ওখান থেকে অনেক বাঙালী অফিসার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ছুটিতে এখানে এসে আবার চলে গেছে কিংবা কেউ কেউ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এখানে এসে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি; অথবা অনেকেই আছে যারা শত চেষ্টা করেও এখানে আসতে পারেনি।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে বুঝবো আদৌ তারা আমদের পক্ষে ছিল কিনা; এ ব্যাপারে সরকার ভাবছেন আর একটি স্ক্রিনিং বোর্ড খুব শীঘ্রই বসবে।

আমার চেয়ে সিনিয়র অফিসাররা আসলে? তা সেটা আমার ভাববার বিষয় নয় সেটা সরকারই ভাববেন কেননা আমরা শুধু খাকী পোশাক পরিহিত সামরিক বাহিনী; আমরা কোন রাজনীতির ধারে কাছেও নেই। বার বার তাঁকে এই প্রশ্নটি করা হলে তিনি ঐ একই উত্তর দেন 'গভর্ণমেন্ট উইল ডিসাইড'। সত্যিই কর্নেল সফিউল্লাহ একটি অসাধারণ ব্যক্তি। বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের সাথে এই 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' কর্নেল সফিউল্লাহর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।

২৯শে জুলাই; সেদিন সন্ধ্যে ৭টা থেকে রাত্রি ১টা পর্যন্ত কর্নেল সফিউল্লাহর সাথে আলাপ হয়েছিল।[শুধুমাত্র যুদ্ধের বিশেষ দিকগুলোই তুলে ধরা হয়েছে।]

যুদ্ধের ডাইরী

মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী

ময়মনসিংহ সেক্টর ৩০শে আগস্ট ১৯৭১

উমা,

মিথ্যে তোমাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম। আজো তোমার মা বাবার খবর নিতে পারিনি বন্ধু। সবুজ গালিচা মাড়িয়ে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, কাজলাদিঘীর ধার দিয়ে, বাঁশ বাগানের পাশ দিয়ে খেয়া পারাপার হয়ে, বাঙ্কারে বাঙ্কারে আর বন বীথিকার ডালে ডালে অনেক ঘুরেছি আমি শহীদ তীতুমীর আর সূর্যসেনের মায়াভরা বাংলার অঙ্গনে অঙ্গনে। ক্লান্ত আমি। পরিশ্রান্ত পথ চলতে নয়, টগবগিয়ে রক্তের উম্মাদনার মাদকতার মাঝে অসতর্ক মুহূর্তের মাশুল দিতে গিয়ে নেমে এলো অবসন্নতা। অথর্ব হাত, অবশ পা আর একাকীত্বের অলস মুহূর্তের কর্ম বিমুখতা অষ্টপ্রহর আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। একের পর এক ভীড় জমালো ফেলে আসা দিনগুলোর মিষ্টিমধুর স্মৃতি। অনুরন আর শিহরণে আমি বুঁদ হয়ে গেলাম। স্মৃতির মাধুরীর আমেজে চোখ বুঁজে এলো। হোঁচট খাওয়া হৃদয় আর মোচড়ে উঠা মন নিয়ে ঝাপসা চোখে চেয়ে দেখি সম্মুখে যে শ্যামলিমা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তো যে ধু ধু করা মরু। পশ্চাতে, দিগন্তের গা ঘেঁষে ঘন সবুজ ঘেরা গাড়ো পাহাড়ের শাখা-প্রশাখাগুলোকে কেবলি মনে হচ্ছিল গুরু গম্ভীর কোন মহাঋষির ধ্যানমূর্তি-সৌম্য সহাসে মহীয়ান নয়, গৈরিক বসন পরিহিত ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে তা কেন জানি ফ্যাকাসে মনে হচ্ছে। শরাহত পাখী যন্ত্রণায় ছটফট করে ডানা ঝাপটিয়ে বেড়াচ্ছে একটুখানি সান্ত্বনার প্রলেপ পাবার আশায়। উমা তুমি সেদিন কেঁদেছিলে তোমার ডাক্তারী পাস করা যুবতী বোন সবিতাদির জন্য। আমি

কিন্তু হেসেছিলাম। সান্ত্বনা দিয়েছিলাম তোমায়। আজ আমার চোখেও জল। বাংলার পথে প্রান্তরে সংগ্রাম স্থলে উল্কার মত ছুটে বেড়িয়ে শত্রুনিধন করার বজ্র কঠোর শপথ নিয়ে অস্ত্র ধরেছিলাম। আজ সফল শপথ, সফল সংকল্প, এমন কি ঝলসানো অস্ত্রের শব্দ সব কিছু উপচে বার বার মনে পড়ছে; আমি দু'টি নিরীহ অসহায় নিষ্পাপ যুবতী বোনের ভাই – এক দুঃখিনী মায়ের সন্তান। দুঃখ করো না বন্ধু, আমি ও আমার নিজের মা বাবার ভাই-বোনের কোন খবর নিতে পারিনি আজো। সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কান পেতে শোন, বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে হাটে বাজারে, শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে, দলিত মথিত আলু থালু বেশিনী বাঙালী মায়ের কোটরাগত সজল আঁখির শোকাতুরা চাহনি। অশোক বনে সীতার কাঁদনে বনবীথিকা পর্যন্ত কেঁদেছিল, ঝরেছিল পত্রপল্লব। কারবালা ফোরাতে মা ফাতেমার বুক ফাটা কান্না "হায় হোসেন, হায় হোসেন" স্বর্গমর্ত্য ভূলোক-ধূলোক একাকার করে দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখিনী বাঙালী মায়ের জন্য অশ্রু ঝরাবে কে? কে লিখবে দ্বিতীয় রামায়ণ অথবা বিষাদ সিন্ধু।

লোক মুখে যখন শুনলাম হানাদার দস্যুরা দেশের বাড়িতে (ফেনীতে) আটজন আত্মীয়ের সাথে আমার একশ বছরের বৃদ্ধ পিতামহকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের মরদেহকে শিয়াল কুকুর দিয়ে খাইয়েছে, তখন চমকে উঠেছিলাম বৈকি। বুকটা ধড়াস করে উঠলো। প্রচণ্ডবেগে জীপে ব্রেক কষলাম যে মুহূর্তে পাশে বসা মেজর আমিনুল হক (ফরিদপুর বাড়ী) আমার দেশের বাড়ীর হত্যাযজ্ঞের কনফারমেশন দিলেন (৩০শে জুলাই '৭১)। যে মেজর আমিনুল হক তিন দিন পর শত্রু বেষ্টনী থেকে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার অজ্ঞান ক্ষত-বিক্ষত দেহটা উদ্ধার করে এনেছিলেন, সেই মেজর আমিনুল হক সেদিন (১৬ই জুন '৭১) পারেননি তার বৃদ্ধ পিতামাতাসহ আর মামা চাচাদের বাঁচাতে। বিনীত অমায়িক সেই দুঃসাহসিক যোদ্ধা সেদিন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেছিলেন, "আমীন আমি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে বাঁচাতে পারিনি। জানো একটি লোক হাপাতে হাপাতে আমাকে তুমি ভেবে এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো যে "আপনার দাদাসহ বাড়ীর সবাইকে পাক সেনারা মেরে ফেলে রেখেছে, লাশ পর্যন্ত নিতে দিচ্ছে না।"

প্রথম বুঝে উঠতে পারিনি মেজর আমীন (ফরিদপুর বাড়ী) কি বলছেন তড়িৎবেগে ব্রেক কষতে গিয়ে গাড়ীটাকে পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে দিয়েছিলাম আর কি। চোখটা জ্বালা করছিল। কিন্তু জল গড়িয়ে পড়তে দেইনি। ভাবলাম, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এটা এক সাধারণ খবর। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম আমার চেয়েও হতভাগ্য আমার জওয়ানদের প্রতি। তাই মা বাবার খবর নিতে সাহস পাচ্ছি না। নো নিউজ, গুড নিউজ। ওগো বন্ধু ই.পি.আরের এক জওয়ান শহীদ এখানে হাসপাতালে আমার সাথে আছে। নিঃসন্তান খালা কোলেপিঠে মানুষ

করলো শহীদকে নিজ সন্তানের মত। কিন্তু ভাগ্যের ফের। সন্তান হবার পর খালা শহীদকে নাকচ করে দেয়। দুনিয়ার কারোর কাছ থেকে সে ভালোবাসা পায়নি – পেয়েছিল শুধু তার বড় ভাই-এর কাছ থেকে। অথচ হানাদার দস্যুরা শহীদদের বাড়ী ঘেরাও করে ইপিআরের জওয়ান শহীদকে না পেয়ে নৃশংসা ভাবে হত্যা করে তার প্রাণাধিক বড় ভাইকে। প্রাণে পালিয়ে বেঁচে এসে শহীদ একের পর এক হত্যা করে চলে হানাদার দস্যুদেরকে। কিন্তু আজ সেই দুঃসাহসিক বীর যোদ্ধা উন্মাদ। সে আজ হেসেই খুন যে, "ওরা আমাকে না পেয়ে আমার ভাইকে হত্যা করলো?" তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়া শহীদ বিলাপ করে উঠে "আমি কি আমার ভাই এর হত্যাকারী?" তাঁর এই প্রশ্নের জবাব দেবে কে? দিতে পারে শুধু ইসলামাবাদ সরকার আর সুরাহা করতে পারে ওয়াশিংটন সরকার। অবশ্য দুই নাগালের বাইরে। শহীদের প্রশ্ন ইথারে ইথারে প্রতিধ্বনিত হয়ে একটা অব্যক্ত গুঞ্জরণে ফেটে পড়ে আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে। তাই আজ সে উন্মাদ। তাইত বলছিলাম কেইবা কাঁদবে আর কেইবা লিখবে এ কাহিনী দুঃখিনী বাঙালী মা আর তার সর্বহারা সন্তানদের নিয়ে।

ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে বিশ্বশক্তি গ্র্যান্ড স্ট্যাটীজি নিয়ে চোখ বুঁজে আছে। কারাকোরাম হাইওয়ে দিয়ে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করত সেই একই উদ্দেশ্যে হাসিলের এমন সুবর্ণ সুযোগ হারাতে আদর্শবান চীন নারাজ। চুলোয় যাক আদর্শ। জাহান্নামে যাক মানবতা- বেঁচে থাক দলীয় স্বার্থ, জোট স্বার্থ। চেয়ে দেখ মুসলীম জগতের পানে, কেমন নিলর্জ্জের মতো দাঁত বের করে হেসে হেসে পিঠ চাপাড়াচ্ছে পিশাচ ইয়াহিয়া। মাথা নেড়ে সমর্থন জানাচ্ছে ইয়াহিয়ার পৈশাচিকতার প্রতি। না করেই বা উপায় কি? জনগণের স্বপক্ষে কথা বলা যে তাদের জন্য হারাম। তেরো শ'বছর আগে এরাই যে ইসলামের যুগান্তকারী মহান আদর্শকে জীবন্ত কবর দিয়ে আজ অবধি রাজা উজিরের বেশ ধরে হারেমের শোভাবর্ধন করে আসছে। তাইত ব্ল্যাকডগ পিপাসু, লালবাতিতে শোভাবর্ধনকারিণীদের নগর, এককালীন ভিডি রোগে আক্রান্ত যালেম পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন পবিত্র মহরম মাসে তদানীন্তন পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙালী মুসলমানদের উপর তার বর্বর সৈন্যদেরকে লেলিয়ে দিল, পৈশাচিক অত্যাচার করলো অমুসলমানদের উপর আর অকথ্য নির্যাতন চালালো বাঙালী নারী সমাজের উপর তখন এরা (মুসলীম রাষ্ট্রগুলো) টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। করার জো কোথায়? বন্ধু ইয়াহিয়ার মত এরাও যে ইসলামকে বার বার ব্যবহার করেছে রাজনীতির নোংরা হাতিয়ার রূপে বাজারের কেনা পকেট ডিকসনারীর মতই। তাই হোক না তা মহরম মাস। মরুক না কিছু বাঙালী ওতে কিছূ যায় আসেনা। অবশ্য দুঃখ করার কিছুই নেই। এ ধ্বজাধারীর দল এমনি করে বার বার ইসলামকে অপমান করে আসছে। খাঁটি মুসলমান

বরাবরের ন্যায় এবারও এর প্রতিশোধ নেবে। যদি ইসলাম জিন্দা হোতায় হ্যায়, হর কারবালা কি বাদ তবে হর বাংলাদেশ জিন্দা বাঙালী।

প্যাট্রিস লুমুম্বার কঙ্গো সংকটকালে জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল সেক্রেটারী জেনারেল দ্যাগ হ্যামারসোর্ল্ড রহস্যজনকভাবে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। তাই বুঝি শেখ মুজিবের বাংলাদেশ সংকটকালে সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বড় সাবধান। শব্দ যোজনায় সবিশেষ যত্নবান। ইনিয়ে বিনিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন কিন্তু আসল কথাটা বলি বলি করেও বলতে সাহস পেলেন না। কি জানি যদি বেঘোরে আবার বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাতে হয়। এ নাটকের সবচেয়ে বড় প্রহসন লক্ষ্য করেছ বন্ধু সেটা হচ্ছে তথাকথিত জাতিসংঘ সনদ। কেমন গালভরা বিশেষণে ভূষিত এ সনদ। অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে ভদ্রতার এ নির্লজ্জ বেহায়াপনার বহু, আগে মহাবীর আলেকজান্ডার আত্মসম্মানে বলীয়ান রাজ্য পুরুকে ফিরিয়ে দিলেন তার রাজ্য ও স্বাধীনতা, শেরশাহ সুরী সসম্মানে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন বন্দিনী সম্রাজ্ঞী আকবর মাতা হামিদা বানুকে সম্রাট হুমায়ুনের কাছে। দ্বৈতযুদ্ধে বাংলার বীরশ্রেষ্ঠ বারো ভূঞার অন্যতম ঈসা খাঁ মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের তলোয়ারকে দ্বিখণ্ডিত করেন অথচ নিরস্ত্র শত্রু কাপুরুষের মত হত্যা না করে নিজ তরবারি এগিয়ে দিলেন রাজা মানসিংহের পানে। কিন্তু আজ যে নিরস্ত্র বাংলার নিরীহ জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, নির্যাতনে জর্জ্জরিত বাংলার নারী সমাজ বিষপানে আত্মহত্যা করছে, সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণের যে ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কেতাদুরস্ত সনদপ্রণেতারা শুধুমাত্র আসর মাৎ করতে চাইছেন। বরাবরের ন্যায় এবারও বিশ্বশক্তির কানমলা খেয়ে নাক খত দিচ্ছেন – চরম আর নির্মমভাবে অপমান করছেন মানবতাকে। তা না করেই বা উপায় কি? খুক খুক করে কেশে আসর জমাবার জন্য পয়সা পাবেন কোথা থেকে? তাই ত বার্লিন থেকে শুরু করে ভিয়েতনাম সর্বত্রই জাতিসংঘ সমস্যার স্থায়ী রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে, বেনিয়ার জন্য অস্ত্র বেচাকেনার বাজার সৃষ্টি করতে পেরেছে কিন্তু সমস্যার সমাধান নৈবচ্ নৈবচ্।

ন্যাকামী আর ভাড়ামীরও সীমা আছে – মাইলাই, হত্যাযজ্ঞের কেন্দ্র করে যে মহান আমেরিকা লেফটেন্যান্ট কেলীর জীবন (সম্ভবতঃ বড় রুই কাতলাকে বাঁচাতে গিয়ে) দুর্বিষহ করে তুলেছিল সেই আমেরিকা গ্রাম বাংলায় বাষট্টি হাজার মাইলাই হত্যাযজ্ঞের কুঠার এগিয়ে দিল। আজ তিরিশ বছর পরেও হেসীকে ওয়ার ক্রাইমের শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া চলে না, এমন কি মানবতার খাতিরেও নয়। অথচ আমেরিকার দোসর ইয়াহিয়া টিক্কার বেলায় তা সাত খুন মাপ। হাজার হোক হেস হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন সাদা চামড়ার উপর আর ইয়াহিয়া টিক্কা চালিয়েছে কালা বাঙালী আদমীর উপর। অতএব আইন সেখানে শিথিল। অবশ্য তাতে আমাদের

কিছু যায় আসে না। আমরা আসামী নই যে উকিল মোক্তার লাগিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেদের সত্যতা জাহির করতে যাব। কিংবা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নই যে গলবস্ত্র হয়ে করজোড়ে দণ্ডায়মান হবো আসরের সামনে। বাংলাদেশ এক অনির্বাণ দীপ্তশিখা জ্বলজ্বল করে জ্বলবে জন্ম থেকে জন্মান্তরে। যুগ থেকে যুগান্তরে। জান বন্ধু, হালাকু খাঁ যখন বাগদাদের বিখ্যাত পাঠাগার পুড়িয়ে দিলেন, শেখ সাদী তখন কেঁদে কেঁদে কবিতা লিখেছিলেন। এ যুগের হালাকু খাঁ শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আর পাঠাগার পুড়িয়ে ক্ষান্ত হয়নি – গ্রাম বাংলার প্রতিঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেও ক্ষান্ত হয়নি নিরস্ত্র আবালবৃদ্ধবনিতাকে হত্যা করেও ক্ষান্ত হয়নি, চরম আর নির্মমভাবে লাঞ্ছিত করেছে বাঙালীমাকে। আমরা কিন্তু কাঁদবো না – যদিও চোখ জ্বালা করে বৈকি – বুকটা ফেটে যেতে চায়। তবে নিশ্চিতই আমরা কবিতা লিখেছি অবশ্য কালো কালির আঁচড়ে নয় – তলোয়ারের খোঁচায় ঠিকরে পড়া খান সেনাদের তাজা খুনের ফোয়ারা দিয়ে আঙ্গুর ফলের রস টুঁইটুম্বুর খান সেনাদের 'ব্লু ব্লাড' আমাদের লেখনীর প্রগতির জন্য আরও চাই অনেক বেশী। তাই ত বন্ধু, চোখের জল মুছে ফেলেছি। সম্মুখে যে অনেকটা পথ। চলার পথকে চোখের জলে পিচ্ছিল করে আরও দুর্গম করতে যাব কোন দুঃখে। আর এ চলার পথের আহ্বানের যে কোন বিরাম নেই। জানত বন্ধু, হাত পা ছুড়ে কান্না না জড়ালে মাও সন্তানকে দুধ দেন না – আর এত ছাল নেড়ে কুকুর। লোম তার উঠেছে মার খেতে খেতে কোমর তার মচকে গেছে, তবুও নেড়ে কুকুর আবর্জনা খাওয়া ছাড়তে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঝেটিয়ে বিদায় কর। কারণ, কুকুর জানে এ শেষ সম্বলটুকু হাতছাড়া হয়ে গেলে তাকে ভুখা মরতে হবে। তাই বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে নেড়ে কুকুর তার মরণ কামড় বসিয়েছে – ঝাটা দিয়ে অঙ্গন ছাপ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। কথার ফুলকী দিয়ে কাজ হবে না। বন্ধু, গাজী আর শহীদ দু'টি সমান্তরাল রেখা – মাঝামাঝি কোন পথ নেই, নেই কোন বিন্দু যেখানে এরা আপোষে মিলিত হতে পারে। গাজী হওয়া যার ব্রত সে শহীদ হতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আপোষে আসতে পারে না – যদি আসে তবে সেটা হঠকারীতারই নামান্তর। বিশ্ব শক্তির প্ররোচনায় যুদ্ধের মাঝপথে ১৯৫৮ সনে হো চি মিন এলেন আপোষে আর সেই আপোষই হলো কাল – ভিয়েতনাম এগিয়ে গেলো আরও ভয়াবহ আরও রক্তক্ষয়ী আরও ব্যাপক যুদ্ধের পানে। তাই মাগো, যেখানেই তুমি থাক না কেন মিনতি করে যুগের অবমাননা করব না, দাবী রইল তোমারই চরণতলে – জন্ম জন্মান্তরের দাবী – সাড়ে সাত কোটি সন্তানেরে শুধু বাঙালী করে রেখো না, মানুষ হতে দাও – মানুষ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ৭নং সেক্টর ও কর্নেল জামান

যেকোন বাঙালীকে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তর হবে 'না, ভুলবো' না। ২৬শে মার্চের সারাদিন এবং তারপর ২৭শে মার্চের সকাল বেলা ঢাকা শহরটা দেখেছিলেন কর্নেল জামান। 'সেদিন ভয় দেখেছিলাম ঢাকা শহরের লোকের চোখে-মুখে। ভয় ছিল, কিন্তু তারচেয়ে বেশী ছিল অপমানবোধ। সেদিন সবার মত অপমানিত বোধ করেছিলাম। সেদিনই মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম, প্রতিশোধ নিতে হবে। অপমানের প্রতিশোধ।

ধানমন্ডীর ১৩নং রাস্তা থেকে ইপিআর পীলখানা ক্যাম্পের গেটটা একেবারেই কাছে। প্রতিটি গুলি, মর্টারের শব্দ শুনেছিলাম, চিৎকার শুনেছিলাম। দেখেছিলাম রাতের অন্ধকারে দু-একজন ইপিআরকে পালিয়ে আসতে। তাঁরা চিৎকার করে বলেছিলেন, প্রতিবাদ কর। ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে। শহরটাকে শেষ করে দেবে।' নিরস্ত্র শহরবাসী আতংকে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

২৭শে মার্চ কর্নেল কিউ এন জামান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'আই হ্যাভ টু ফাইট'। যুদ্ধ করতে হবে। তিনি সৈনিক।

১৯৪৬ সালে বৃটিশ আর্মীর কমিশন পান। পাক আর্মীর আর্টিলারীতে ছিলেন। ১৯৬৫ সালে মেজর হিসেবে অবসর নেন। যদিও সৈনিকের পোশাক ত্যাগ করেছিলেন। তবু তিনি জানেন যুদ্ধ করতে। তাঁকে যেতেই হবে। কিন্তু সেদিন তাঁর প্রথম কর্তব্য ছিল পরিবারের নিরাপত্তা। কারণ স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। মেয়েরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গান, ভারত নাট্যম চর্চা করেন। ওঁরা সবাই অপরাধী ইয়াহিয়ার ফ্যাসিস্ট সরকারের কাছে। সবাইকে ২৮শে মার্চ পাঠিয়ে দিলেন

টাঙ্গাইল। ভায়ের ছেলে আশেক আহমেদ নিজে ড্রাইভ করে পৌঁছে দিয়ে পরদিনই ফিরে এলেন। এসে জানালেন, মেজর সফিউল্লাহ (এখন কর্নেল, অস্থায়ী চীফ অব দ্য স্টাফ), তাঁর পুরো ব্যাটেলিয়ন নিয়ে জয়দেবপুর থেকে টাঙ্গাইল গেছেন। যুদ্ধ হচ্ছে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ্যাকশনে নেমে গেছে।

কর্নেল জামান জানতেন অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে হবে অস্ত্রে। প্রফেশনাল ছাড়া প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ সময় তিনি মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর শোনেন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মেজর জিয়া জাতিকে যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন, যুদ্ধে নামতে হবে স্বাধীনতার যুদ্ধে। প্রতিশোধের যুদ্ধে।
'মেজর জিয়া নয়, কোন নায়েক বা সুবেদার ডাক দিলেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকে কর্তব্য মনে করতাম।' কর্নেল জামান বলেন।

২৮শে মার্চ কর্নেল জামান টাঙ্গাইল এলেন। কিন্তু সেদিনই বেঙ্গল রেজিমেন্টের দলটা টাঙ্গাইল থেকে ময়মনসিংহের দিকে গেছে। তিনিও রওনা হলেন ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে।

৩০শে মার্চ দেখা কর্নেল সফিউল্লাহ ও তাঁর রেজিমেন্টের সঙ্গে। পঁচিশ থেকে ত্রিশ – এ কদিনেই পুরো রেজিমেন্টকে বিধ্বস্ত মনে হল। কারণ 'আনসার্টেনিটি'। বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু পূর্ব সংগঠন নেই। তাঁরা কেউ জানেন না এরপর কোথায় যেতে হবে। কি করবে। যা অস্ত্র, গোলাবারুদ আছে তা দিয়ে আর কতদিন? সবাই যুদ্ধের জন্যে বেশীমাত্রায় প্রস্তুত। যুদ্ধ করেই শেষ হতে হবে। এঁরা ঢাকার দিকে একটা কোম্পানী পাঠিয়ে দিয়েছিরেন এয়ারপোর্টটা অকেজো করতে। লোক গিয়েছিলেন গোদনাইল তেলের রিজার্ভ নষ্ট করতে। কর্নেল সফিউল্লাহ চেয়েছিলাম ঢাকাকে বাইরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ঢাকা শহরেই পাক হানাদারকে 'কনফাইন্ড; করতে। কিশোরগঞ্জ পৌঁছুলেন ৩০শে মার্চ কর্নেল সফিউল্লাহর সঙ্গে। ওখানে কুমিল্লা থেকে একজন বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন এলেন কর্নেল খালেদ মোশাররফের মেসেজ নিয়ে। পরবর্তী এ্যাকশনে যাবার আগে একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। কর্নেল মোশাররফের সঙ্গে রয়েছে ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

এদিকে ভারতীয় বর্ডার পোস্টের সঙ্গে কথা চলছিল। কর্নেল জামানও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করলেন। এর পরবর্তীকালে তেলিয়াপাড়ায় আরো অনেক অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়, আলোচনা হয়। জেনারেল ওসমানী এলেন। সিএনসির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সরকার গঠন হল। এই সময় আমি আগরতলায় ছিলাম। কখনো হেড অফিসে· কখনো সেক্টরে। আমার পরিবার এ সময় আমার সঙ্গে এসে যোগ দেয়। জুন মাসের দিকে বাংলাদেশ আর্মীর প্রথম অফিসার ব্যাচ ট্রেনিং-এর জন্যে রিক্রুটের দায়িত্ব আমার উপর পড়ে। পুরো পূর্ব

সেক্টর আমি এ সময় ঘুরে দেখি। জুলাই মাসে আমাকে পাঠানো হয় ৭নং সেক্টরের কমান্ডিং অফিসার করে।

(ক)

এ সেক্টরটি সম্পর্কে বলা যায় পরিত্যক্ত সেক্টর। দিনাজপুর, রংপুরের কিছুটা অংশ, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়ার বিশাল এলাকা নিয়ে এই ৭নং সেক্টর গঠিত। আমি যখন আসি তখন এর লোকবল ছিল মাত্র ৪০০জন। কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর নাজমুল হক – কর্নেল জামান বললেন। সেক্টর সেভেন-এর হেডকোয়ার্টার বাংলাদেশের লাগোয়া তরঙ্গপুর। এই সেক্টরকে ৯টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল।

মেজর নাজমুল এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। আগে এখানে বেশ কিছুসংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ান ছিলেন। তাঁদের লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাফায়াত জামিল তাঁর ব্যাটেলিয়নের জন্য রিক্রুট করে ১১নং সেক্টরে চলে যান। মেজর নাজমুলের কাছে তখন মাত্র ৪০জন ইপিআরের লোক ছিল। জুলাই থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেরা আসতে শুরু করে। তরঙ্গপুর ক্যাম্পেও ট্রেনিং শুরু হয়।
এই সেক্টরের অফিসারের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত কম। মেজর নাজমুল ছাড়া দু'জন ছিলেন আর্মির লোক। মেজর গিয়াস ও ক্যাপ্টেন রশীদ। পরে আসে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর। ইঞ্জিনীয়ারিং কোরের লোক। কিন্তু এখানে এসে সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসাবে পদাতিক বাহিনীর কমান্ড করতেন বীরত্বের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস এ সেক্টরে একজন সাহসী যোদ্ধা। কিন্তু তিনিও আর্মির লোক না। তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস সব সময় এ্যসল্ট বা রেইডের নেতৃত্ব দিতেন। পাক আর্মি যদি জানতো এখানে ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আছে তবে আক্রমণ করতে দ্বিধা করতো। লোকের মুখে মুখে ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নাম লিজেন্ডের মত ছড়িয়ে গিয়েছিল।

পুরো যুদ্ধকালে সাত নং সেক্টরের অনেক অঞ্চল পাক-আর্মি কখনো দখল করতে পারেনি। মুক্ত অঞ্চলে স্কুল চলতো। হাট-বাজারে যথারীতি কেনাবেচা হতো। জনাব হান্নান চৌধুরী পাক-আমলের দিনাজপুরের জেলা জজ এই মুক্ত এলাকার বেসামরিক প্রশাসক ছিলেন। পাক-আর্মির প্রধান ঘাটি ছিল শিবপুর ও নবাবগঞ্জ। ৭নং সেক্টরের মূল দায়িত্ব ছিল রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা। ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের ছেলেরা কয়েকবার রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছে। শুকন পুকুরের কাছাকাছি এলাকায় পাক আর্মি পরিবহণকারী মালগাড়ী উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। একবার মাত্র পাঁচ সদস্যের এক গেরিলা দল এই অপারেশনে অংশ নেয়। এই মালগাড়ীটা উড়াতে

দশটি এন্টিট্যাঙ্ক মাইন ব্যবহার করে। এই অপারেশনে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নষ্ট হওয়া ছাড়াও পাক আর্মির প্রায় দুশো সৈন্য মারা যায়। আত্রাইয়ের কাছে একটি ব্রীজ উড়িয়েছিল ৭নং সেক্টরের কয়েকটি ছেলে। পাহাড়পুর অঞ্চলে পাক আর্মির শক্ত বেজ ছিল। ওটা গেরিলারা রেইড করে। এখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। মুক্তিবাহিনীর ৬টি দুঃসাহসী তরুণ। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন সিলেট অঞ্চলে ছিলেন। এই যুদ্ধে শহীদ হন। যে ছেলেটি এলএমজি চালাতো সে কাভারিং ফায়ার দিতে গিয়ে আটকা পড়ে। কিন্তু সারেন্ডার করেনি। সমস্ত গুলি শেষ করে বীরের মত মৃত্যুবরণ করে।

৭নং সেক্টরে বেশীরভাগ এ্যাকশন হয়েছে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে। এ সময় মেজর গিয়াস, ক্যাপ্টেন ইদ্রিস ও ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর তাদের গেরিলা ইউনিটকে দিয়ে একের পর এক থানা রেইড শুরু করেন। শেষ অবস্থায় পাকিস্তানীরা থানা থেকে ট্রুপ তুলে নিয়ে অন্য কোন বাড়ীতে থানা তৈরী করতো। মেজর গিয়াস লালগোলা সাব-সেক্টর থেকে আক্রমণ চালাতেন পদ্মা পাড় হয়ে। এতে বেশ কষ্ট হতো, অসুবিধা হতো। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর সেজন্যে বারবার প্রস্তাব করতেন যে যদি মুক্তিবাহিনীর একটা বড় ইউনিট তৈরী করা যায় তবে ভেতরে থেকেই অপারেশন সম্ভব। প্রতিটি এ্যাকশনের সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর ওয়ারলেস ছিল না, মোটর সাইকেলের সংখ্যাও ছিল নগন্য। সেজন্যে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর পাক আর্মির কাছাকাছি থেকে আক্রমণ করতে চাইতেন।

কর্নেল জামান এই ক্যাপ্টেনের কথা উঠতেই বিষণ্নবোধ করেন, আবার আবেগে বিহ্বল হন। এই দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে, যুদ্ধের প্রথমদিকে।

ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ছিলো সত্যিকার গণবাহিনীর অধিনায়ক। আদর্শবাদী সৈনিক। কর্নেল জামান বললেন, যুদ্ধের সময় সবরকম বিলাসবসন ত্যাগ করেছিলেন। দুটি সস্তা লুঙ্গি ও গেঞ্জি ছিল তার পোশাক। আর্মি অফিসারদের যে বেতনের ব্যবস্থা ছিল তাও নিতো না। ওই টাকা দিয়ে অ্যাডভান্স ড্রেসিং সেন্টারে আহত সেনাদের ফলমূল কিনে দেওয়া হতো। শুধু নিজের টাকা নয়, অন্যান্য অফিসারদের কাছ থেকেও সে টাকা চেয়ে যুদ্ধে ব্যয় করতো। অসীম সাহসী এই যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে সবার শেষে উইথড্র করতো। ঘুমাতো ট্রুপের সঙ্গে।

কর্নেল জামান যখন ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের কথা বলছিলেন তখন সামনে এসে বসলেন মিসেস জামান ও তাঁর দুই কন্যা। সবাই স্মৃতির জগতে চলে গেলেন। লুবনা বললেন, 'আমরা যখন এ্যাডভান্স ড্রেসিং সেন্টারে কাজ করতাম নার্স হিসাবে

তখন রুগীর পাশে দেখতাম ভাল বিস্কুট বা ফলমূল। জিজ্ঞেস করলে ওরা বলতো, স্যার দিয়ে গেছেন। ইনিও আসতেন মাঝে মাঝে। কথা বলতেন খুব কম।'

ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর তেরোই ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ আক্রমণ করেন। মেজর গিয়াস অন্যদিক থেকে আরেকটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। এখানে পাক আর্মির প্রায় এক ব্যাটেলিয়ন শক্তি ছিল। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর তাঁর সাহসী গণবাহিনী নিয়ে একটা বাঙ্কার চার্জ করেন। এক সময় তিনি বাঙ্কারের মুখে গিয়ে নিচু থেকে এলএমজির ব্যারেল ধরে টেনে ছিনিয়ে আনেন। এবং হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ করেন। এই যুদ্ধেই ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর শহীদ হন। জাহাঙ্গীরের লাশ উদ্ধারের জন্য গণবাহিনীর ছেলেরা ২৪ ঘন্টা একভাবে যুদ্ধ করেন এবং শহীদের লাশ কাঁধে নিয়ে কবর দেন রাজশাহীর ঐতিহাসিক সোনা মসজিদের পাশে।

না, কোন রকম খেতাব ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর পাননি। পশ্চিম পাকিস্তানে আটক অনেক অফিসার এখানে আসবেন, তাদের যুক্তি হবে পালিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। প্রশ্ন উঠবে না তারা আদৌ মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করতেন কিনা, করলেও দেশের জন্য জীবন দেওয়ার মত দেশপ্রেম ছিলো কিনা। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর হানাদারদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পালিয়ে এসে স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে শহীদ হলেন। জীবনপণ করে এসেছিলেন সেই জীবনকেই দেশকে দান করলেন। খেতাব না পেলেও গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কাঁদতে কাঁদতে লোক এসেছিলো তাঁর জানাযায় শরিক হতে। তাদের জন্যতো ক্যাপ্টেন সাহেব মারা গেছেন। ক্যাপ্টেন সাহেব দেশমাতৃকার বীর সন্তান। মেজর গিয়াস ১৪ই ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রবেশ করেন। ওখানে পরে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে ভিক্টরী মার্চ করেন। প্যারেডে জনসাধারণের হাতে ছিল ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের ছবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড।

দিনাজপুর শহরেও মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা সবার আগে প্রবেশ করে ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে। ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের সঙ্গে ছিল দিনাজপুর ব্যাটেলিয়ন। এই ব্যাটেলিয়ন দিনাজপুরের ছেলেদের নিয়ে গঠিত।

লেফটেন্যান্ট তারেক (আর্মি লেফটেন্যান্ট নন, কিন্তু সেক্টরে এই নামে পরিচিত) ৪০০ গেরিলার একটা ইউনিট নিয়ে নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা হয়ে বগুড়ায় প্রবেশ করে ১৬ই ডিসেম্বরের আগেই। পলাশবাড়ীতে ৮ই ডিসেম্বর পাক আর্মির একটি মিটিং হয়। মিটিং শেষে একটি জীপে ফিরছিল। মেজর জেনারেল হোসেন শাহ। লেফটেন্যান্ট তার জীপ আক্রমণ করে। জেনারেল ধানক্ষেতে পড়ে পালিয়ে যায়। ড্রাইভার ও বডিগার্ড মারা যায়।

(খ)

কর্নেল জামান ৭নং সেক্টরের অনেকগুলো অসুবিধার কথা বললেন। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা ছিল যোগাযোগ এবং অফিসারের অভাব। মেজর নাজমুল অক্টোবর মাসে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে। মেজর নাজমুল হক অমানুসিক পরিশ্রম করতেন। তার উপর ভার ছিল প্রশাসন ও ইনডাকশনের। দুটোই খুব কঠিন কাজ। ঘুমাবার সময় পেতেন না। শিলিগুড়ি যাবার পথে নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। পাহাড়ে রাস্তা সাবধানে চালাতে হয়। একটু গণ্ডগোল হলে কয়েক শো গজ নীচে গিয়ে পড়তে হবে। ঠিক তাই হয়েছিল। পাহাড় থেকে গাড়ি উল্টে পড়ে মেজর নাজমুল হক মারা যান। ড্রাইভ করতে করতে ক্লান্তিতে তিনি ইস্টিয়ারিং-এর উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

মেজর হকের মৃত্যুর পর সিভিলিয়ান ডাক্তার মকসুল চৌধুরী প্রশাসন ও ইনডাকশনের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। কর্নেল নোমান যুদ্ধকালে সাহায্যকারী হিসাবে ডঃ মনিরউদ্দীন আহমেদ, ডঃ মেজবাউদ্দীন এমপিএ (বাচ্চু), রাহানপুরের এমএনএ খালেদ মিয়া, সিরাজগঞ্জের এমএনএ হায়দার আলী, প্রফেসার আবু সাঈদ (এমএনএ পাবনা), নওগাঁর জলিল সাহেব প্রমুখের নাম উল্লেখ করেন। এঁরা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। প্রথম দিকে অফিসার কম থাকলেও শেষের দিকে চারজন জুনিয়ার লেফটেন্যান্ট ৭নং সেক্টরে যোগদান করেন। এই চারজন হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম, লেফটেন্যান্ট কাইসার, লেফটেন্যান্ট আউয়াল, লেফটেন্যান্ট রফিক।

কর্নেল জামানের অভিজ্ঞতা অনুসারে ইপিআর এবং পুলিশের চেয়ে ছাত্ররা ভাল যোদ্ধা ছিলেন। রিক্রুটের ব্যাপারে প্রতি জেলা থেকে সমান সংখ্যক ছেলে গ্রহণ করা হতো। এতে কর্নেল জামান দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন পাবনা ও বগুড়ার ছেলেরা যোদ্ধা হিসেবে উত্তরাঞ্চলের মধ্যে সবচে ভালো। অবশ্যি শেষের দিকে দিনাজপুরের ছেলেরা বেশ সাহসিকতার পরিচয় দেয়।

কর্নেল জামানের কথায় সৈনিক সুলভ সজীবতা আছে কিন্তু বিশ্লেষণ আর্মির মত না। প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেন। ভারতীয় সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে বলেন, জেনারেল মহলে আমাদের প্রতি তাঁদের যতখানি সহানুভূতি ও সাহায্য করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মেজর স্তরে সেটা বিতর্কিত বিষয় বলে গণ্য হতো। ৭নং সেক্টরে কোন হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল না। ভারতীয় হাসপাতালে আহত ছেলেরা সাইকোলজিক্যাল দিক থেকে দুর্বল বোধ করতো। সেজন্য নিজেই ছোট একটি ড্রেসিং সেন্টার খোলেন। তাতে নার্স হিসেবে যোগদেন তার দুই মেয়ে ও স্ত্রী।

যোগাযোগ না থাকার জন্যে যুদ্ধের খবর অনেক ক্ষেত্রে মুজিব নগরে পৌঁছাতো না। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর একটি সফল এ্যাকশনে ভারতীয় অঞ্চলের জনসাধারণের ভেতর আলোড়ন পড়ে যেতো। এতে ছেলেরা উৎসাহিত হতো। কিন্তু কিছু কিছু ভারতীয় ডাকাত এই সময় ভেতরে এসে লুটপাট করে। এদের মধ্যে জীবন দে নামে একজন ডাকাত ও প্রাক্তন বিএসএফ জোয়ান বর্মন এক সঙ্গে সদলবলে লুট করার সময় মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়। এ ব্যাপারে জড়িত থাকায় দু'একজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেদেরও শাস্তি দেওয়া হয়।

অনেক রকম অসুবিধার মধ্যে দিয়ে সাত নং সেক্টরের যোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন। শেষের দিকে বিএলএফের (বা মুজিববাহিনী) কিছু ছেলে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। এরা মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলে বিভেদ সৃষ্টি করে।
কর্নেল জামানের কাছে সব রকম রাজনৈতিক মতাদর্শের চেয়ে স্বাধীনতার প্রশ্ন ছিল সবচে বড়। দেশ এখন স্বাধীন। তিনি অতীতের বীরত্বের কথা, তিক্ততার কথা একইভাবে এখন বলেন স্মৃতি হাতড়ে। এখন তিনি ফিরে গেছেন পুরানো কর্মক্ষেত্রে।

প্রশ্ন করলাম, 'স্বাধীনতাত্তোরকালে এই বিশৃঙ্খলা কি আশা করেছিলেন'?
'করেছিলাম। কিন্তু এতটা নয়।' কর্নেল জামান বললেন, 'মুক্তিযোদ্ধা, যারা ফাইনেস্ট সন অব দ্যা সয়েল, তাদের ব্যবহার করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন বা করেননি। এই সব ছেলেরা আমাকে বলতো, স্যার যুদ্ধ শেষে আমরা ভাঙা ব্রীজগুলো জোড়া লাগাবো, পোড়া ক্ষেতে আবার ফসল লাগাবো, কলকারখানা চলবে। দু'বছর না হয় বন্ধই থাকলো স্কুল-কলেজ। এখন যেভাবে যুদ্ধ করছি এভাবেই শুধু দু'বেলা খেয়ে দেশকে গড়ে তুলবো। জানিনা এসব প্রতিজ্ঞাদীপ্ত তরুণরা এখন কোথায় কি করছে। জানি না কেন তারা অটো প্রমোশন চায়? কর্নেল জামান বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'এদের নামে ডাকাতি কেস দেওয়া হচ্ছে, এদের দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে। আমি জানি না এসব যদি সত্যি হয় তবে এর জন্য দায়ী করা।

একটি বিষাদময় স্মৃতি – "আমি স্যাবরের শব্দ আর শুনতে চাই না"

আটাশে সেপ্টেম্বর। বৃহস্পতিবার। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দিবস। চোখ ঝলসানো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ঢাকা বিমানঘাটিতে। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠনের ঐতিহ্যময় এই দিনটি আড়ম্বরের সাথে পালনের সব রকম ব্যবস্থা করেছেন আমাদের বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ। মার্চপাস্ট, একরোবেটিক্স-এর সাথে রয়েছে রিফ্রেশমেন্টের প্রোগ্রাম।

বিমানঘাটিতে বিপুল দর্শকের সমাগম হয়েছে। গাড়ীর ভিড়ে পায়ে হাঁটা দায়। সামরিক অফিসারদের ব্যাজ-ব্রেজার-স্টার থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের ঠিক সামনের সারিতেই দেখলাম কয়েকজন ভদ্রলোক ও মহিলা চুপচাপ বসে আছেন। তাঁদের পাশে কাঠের স্ট্যান্ডে একটি প্লেট লাগানো, 'শহীদস্ ফ্যামিলি'। খোঁজ নিয়ে জানলাম এখানে বসে আছেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বিমান সৈনিক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের স্ত্রী বেগম মিলি রহমান, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নাসিরুদ্দীন ভুঁইয়ার স্ত্রী বেগম নূরজাহান, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মাহমুদ সাকলায়েনের ভাই জুনিয়র টেকনিশিয়ান মনজুর হোসেনের স্ত্রী আর মুজাফফর হোসেনের বৃদ্ধা মা। এঁরা সবাই বিষণ্ন। অনুষ্ঠানের চঞ্চলতা থেকে অনেক দূরে।

অনুষ্ঠান শুরু হলো। জাতীয় সঙ্গীতের পর ব্যান্ড বেজে উঠল 'চল চল' এর সুর। বিমান সৈনিকদের মার্চপাস্টের স্যালুট গ্রহণ করলেন প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

স্বাধীনতাযুদ্ধে বিমান সৈনিকদের বীরত্বের কথা উল্লেখ করে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। যুদ্ধে শহীদ সৈনিকদের কথা তিনি উল্লেখ করতেই কান্নার শব্দ কানে এল। দেখলাম মিলি রহমান কাঁদছেন। তিনি কান্না চেপে রাখতে চাইছেন, রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ধরেছেন, কিন্তু পারছেন না। তাঁর কান্নার সাথে সাথে শহীদ পরিবারের সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন একে একে।

রাষ্ট্রপ্রধানের ভাষণ শেষ হলো। ব্যান্ডে 'জয় বাংলার জয়' গানের সুর তুলে মার্চ করে বিমান সৈনিকরা চলে গেলেন বিমানঘাটির টারমার্ক থেকে।

আকাশ কাঁপিয়ে গর্জন করে উড়ে এল দুটি স্যাবর। বিমান মহড়া অনুষ্ঠিত হবে এবার। দু'কানে হাত চেপে চীৎকার করে উঠলেন বেগম মিলি রহমান। স্যাবর তিনি দেখতে চান না। স্যাবরের শব্দ তিনি শুনতে চান না। স্যাবর তাঁর কাছে এক দুঃসহ বেদনার স্মৃতি। মনে পড়ল, একাত্তরের ২০শে আগস্টের কথা। বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিসংগ্রামের আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে দেড় হাজার মাইল দূরে থেকেও উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর এক তরুণ বাঙালী বৈমানিক, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান। একটি অনুশীলন ফ্লাইট থেকে এক পাঞ্জাবী নবীশ-পাইলটসুদ্ধ স্যাবর নিয়ে তিনি উড়ে চললেন ভারতের দিকে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সেই নবীশ-পাইলট হত্যা করল তাঁকে। ২০শে আগস্টের এই ঘটনার খবর বের হল হানাদার কবলিত ঢাকার খবরের কাগজে ২১শে আগস্ট সকালে – 'বিশ্বাসঘাতকের আর এক নাম মতিউর রহমান', এই শিরোনামায়। অধিকৃত বাংলাদেশের মানুষ এই 'বিশ্বাসঘাতকের' খবর পড়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে। নীরবে ফেলেছে চোখের পানি।

মতিউর হত্যাকারী সেই পাঞ্জাবী পাইলটও তাঁর সাথে নিহত হয়েছিল বিমান দুর্ঘটনায়। পাকিস্তান পুরষ্কারস্বরূপ তাকে দিয়েছে মরণোত্তর খেতাব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব – 'নিশান-ই-হায়দার'। কিন্তু মতিউরকে স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও ভূষিত করা হয়নি কোন উপাধি দিয়ে। যাক সে কথা। আকাশে স্যাবর তখন শ্লো রোল, ভার্টিকুলার রোল ও ইনভার্টেড ফ্লাইং-এর মহড়া প্রদর্শন করে চলেছে। আর নীচ থেকে চীৎকার করছে মিলি রহমান। স্যাবরের শব্দ থামিয়ে দিতে হবে। আসন ছেড়ে ছুটে যেতে চাইলেন মিলি রহমান বিমানঘাটির টারমার্কে। তাঁর এক আত্মীয় টেনে নিয়ে এলেন তাঁকে। কিন্তু বসাতে পারলেন না। ওই যে ওই স্যাবরে মতি গিয়েছিল, কিন্তু আর তো ফিরে এলো না ... সামিয়ানার খুঁটি ধরে চিৎকার করতে লাগলেন তিনি। তারপর আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, এই শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না। তবু স্যাবর কেন ওড়ে।

প্রিয়জনের মৃত্যুর স্মৃতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে ব্যথিত করে। কিন্তু মিলি রহমানের আর্তচিৎকারে মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র তাঁর স্বামী মতিউরের মৃত্যু হয়েছে। তিনি সামনেই দেখতে পাচ্ছেন তার বিকৃত লাশ।

রাষ্ট্রপ্রধান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নেমে এলেন তাঁর কাছে। এলেন বিমান বাহিনীর চীফ অব স্টাফ। কিন্তু তাদের কাছে কি সান্ত্বনার বাণী আছে, যা মিলি রহমানকে প্রবোধ দিতে পারে। তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চলভাবে। কান্নাভাঙ্গা কণ্ঠে মিলি রহমানই জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার স্বামীকে আপনারা কি এওয়ার্ড দিলেন?' রাষ্ট্রপ্রধানের চোখ ততক্ষণে সজল হয় উঠেছে। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, আপনার স্বামী, আপনার আমার সকলের গর্ব। বাঙালী জাতির মহান ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। আল্লাহ্ আপনাকে শান্তি দেবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান এগিয়ে আসার সাথে সাথেই শহীদদের পরিবারের সদস্যরা সবাই বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। জুনিয়ার টেকনিশিয়ান মুজাফ্ফর হোসেনের মা রাষ্ট্রপ্রধানের হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। এতক্ষণ এক অবাক বিস্ময়ে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শহীদ নাসিরুদ্দিন ভূঁইয়ার ছোট ছেলে সালু। সেও এবার কেঁদে উঠল। রাষ্ট্রপ্রধান কোলে তুলে নিলেন ওকে।

স্যাবরের মহড়া তখনও চলছে। কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি আর আকাশে স্লো রোল, ভার্টিকুলার রোল বা ইনভার্টেড ফ্লাইং-এর প্রতি নেই। সবাই জড়ো হয়েছেন শহীদ পরিবারের চারপাশে। সকলের চোখ অশ্রুসজল। আমাদের ফটোগ্রাফার গোলাম মাওলাকে দেখলাম ক্যামেরা বন্ধ করে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

চিলমারী রেইড

লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস আবু তাহের

বিশাল ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে অবস্থিত চিলমারীর দূর্ভেদ্য শত্রুবূহ্যে এক প্রচণ্ড হানা দিয়ে আমরা শত্রুর বিপুল ক্ষতিসাধন করি। এই আক্রমণকে মুক্তিবাহিনীর মূল আক্রমণ ভেবে সে এলাকায় বৃহৎ আকারের শত্রু সমাবেশ ঘটে। এ ধরনের আক্রমণ শুধুমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মিত্রবাহিনীর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমণের কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়। যে ক্ষেত্রে সুশিক্ষিত কয়েকটি ডিভিশন, ছত্রি সেনা এবং স্পেশাল ফোর্স অংশগ্রহণ করেছিলো। সে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে কয়েক ডজন জেনারেল অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের ইতিহাসে চিলমারী বন্দর আক্রমণ একটি উজ্জ্বল ঘটনা। এই যুদ্ধ বাংলার সোনার ছেলেদের নিয়ে গঠিত আমার সেক্টরের 'প্রাইভেট আর্মি' দ্বারা সংগঠিত হয়। রোমারীর মুক্তাঞ্চলে মাত্র ১৫ দিনের অনুশীলন প্রাপ্ত এ সমস্ত ছেলেদের নিয়মিত খাবারের সরবরাহ ছিল না, হাত খরচ ব্যবস্থা ছিল না এবং শুধুমাত্র দখলিকৃত অস্ত্রের উপরই তাদের নির্ভর করতে হতো। কোন অনুমোদিত ট্রেনিং ক্যাম্পে, অনুশীলন প্রাপ্ত না হওয়ায় এ সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা সেক্টর কমান্ডারের 'প্রাইভেট আর্মি' হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের চিলমারী আক্রমণ পরিকল্পনায় দক্ষতা এবং সাহস ও নৈপুন্যের সাথে তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিদ্যার ছাত্রদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

১১নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যখন আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন বেশ অনেকগুলো চরের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল রৌমারী এলাকা যুক্ত ছিল। এর প্রতিরক্ষা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ মুজিবনগর থেকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে আমরা সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। কর্নেল জিয়ার ব্রিগেডের দুটি বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই মুক্তাঞ্চল প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল।

শুধুমাত্র কোদালকাঠি চর ছাড়া ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পাড়ের সকল এলাকা ছিল মুক্ত। কোদালকাঠিতে শত্রু সৈন্যের অবস্থান স্থানীয় গ্রামবাসীদের জন্য ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এ সকল শত্রুসৈন্য প্রায়ই পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়ে গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার চালাতো। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাঞ্চলকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করার জন্য সুবাদার আফতাবের নেতৃত্বে দুই কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকের এক রাতে গোপনে কোদালকাঠিতে অনুপ্রবেশ করে এবং শত্রুবূহ্যে মাত্র কয়েকশত গজ দূরবর্তী ঝাউবনে ট্রেঞ্চ খনন করে তাতে অবস্থান করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেঞ্চগুলোর সামনেই শত্রুনিধনের উপযোগী বিস্তৃত খোলা জায়গা ছিল। আমাদের কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেঞ্চগুলো থেকে উপস্থিতি টের পেয়ে যখন শত্রুসৈন্য তাদেরকে উৎখাত করার জন্য আক্রমণ চালাবে, তখন আক্রমণোদ্যত শত্রু সেনাদেরকে খোলা জায়গায় আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করবো। পরের দিন ভোরে আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ ঘটে এবং তা তড়িৎগতিতে প্রতিহত করা হয়। শীঘ্রই শত্রুবাহিনীর দ্বিতীয় এবং তারপর তৃতীয় আক্রমণ ঘটে। সেগুলোও সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করা হয়। নিধন এলাকা শত্রুসৈন্যের মৃতদেহ স্তূপিকৃত হয়ে উঠে। যে কয়জন শত্রুসৈন্য ট্রেঞ্চ পর্যন্ত এগুতে পেরেছিলো তাদের বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়। আমাদের অবস্থানের দু'প্রান্তে স্থাপিত মেশিনগান দুটি সেদিন আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। মেশিনগান দুটির আড়াআড়ি গুলিবর্ষণে বেশীরভাগ শত্রুসৈন্য মারা পড়েছিলো। তৃতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার পর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসে এবং শত্রুদের উপর মরণ আঘাত হানার জন্য এগিয়ে যায়। খুব অল্পসংখ্যক শত্রুসৈন্যই অপেক্ষমান গান বোটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কোদালকাঠি আমাদের হস্তগত হলো। গ্রামবাসীর মধ্যে দারুণ উল্লাসের সৃষ্টি হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব এবং দক্ষতার উপর তাদের আস্থা বহুলাংশে বেড়ে যায়। যদিও তাদের সামর্থ ছিল সামান্য তবুও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তারা রান্না করা খাবার এবং মিষ্টান্ন নিয়ে আসে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে কর্নেল জিয়া তার ব্রিগেড নিয়ে সিলেটের পথে ১১নং সেক্টর ত্যাগ করেন। সেদিন আমরা সবাই বিষণ্নবোধ করেছিলাম। সে সময় আমরা জামালপুর এবং টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকার পথে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। শুধু যে আমাদের রণনীতি পাল্টাতে হলো তা নয়, রৌমারীর বিরাট মুক্তাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব আমাকে বিচলিত করে তুললো। আমার সেক্টরে কোন নিয়মিত বাহিনী রইলো না। আমাকে রৌমারীতে ১৫ দিনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেদের উপর নির্ভর করতে হলো। এদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৫জন মাত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। রৌমারীর প্রতিরক্ষার কাজে ভারতীয় বাহিনী পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন ভারতীয়

কমান্ডার। তার সে প্রস্তাব আমি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করি। বাংলার মাটি রক্ষা করবে বাংলার বীর ছেলেরাই। রৌমারীর প্রতিরক্ষাবূহ্য আবার ঢেলে সাজাতে হবে। নেতৃত্বের পুরো ভার পড়ল সুবাদার আফতাবের উপর। চওড়া কাঁধ আর লম্বা কোকড়ানো চুলের অধিকারী এই নির্ভীক জেসিও সব সময়ই বীরত্ব এবং দক্ষতার প্রতীক ছিলো। আমি যখন পুরো পরিস্থিতি তাকে বুঝিয়ে বললাম, সে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যালুট করলো এবং বললো, 'স্যার পাকিস্তানীরা শুধুমাত্র সুবাদার আফতাবের মৃতদেহের উপর দিয়ে রৌমারীতে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু জেনে রাখবেন সুবাদার আফতাব মরবে না।' এই বিপ্লবী নেতার মনোবল যে কত উপরে ছিল তা এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়।

তখন থেকে পরবর্তীকালের বিভিন্ন সময়ে দক্ষ সৈনিক অস্ত্র এবং গোলাবারুদের অভাব পূরণের জন্য আমাকে যুদ্ধের কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানীরা চিলমারী বন্দর থেকে গানবোটের সাহায্যে রৌমারীর মুক্তাঞ্চলে প্রায়ই হানা দেয়া শুরু করেছে। কিন্তু শত্রুরা কোন সময়ই সদাজাগ্রত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা বূহ্য ভেদ করতে সক্ষম হয়নি। রৌমারীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অস্ত্রে সজ্জিত করাটা আমাদের আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো এবং আমি সবসময় চাইতাম তারা শত্রু অস্ত্রে সজ্জিত হোক এবং অস্ত্র দখলের জন্য আমরা চিলমারী বন্দরকে বেছে নিলাম। চিলমারী আক্রমণের পেছনে আরো কারণ ছিলো, কুখ্যাত মুসলিমলীগ নেতা আবুল কাশেম এবং তার সহযোগীদের নেতৃত্বে সেখানে বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিলো, চিলমারীতে অবস্থানরত পাকবাহিনীর উপর আঘাত হানাটা অপরিহায্য হয় দাঁড়ালো, তা সে যতই বিপদজ্জনক হোকনা কেন। এভাবেই চিলমারী আক্রমণের পরিকল্পনা রূপ পেলো।

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে অবস্থিত চিলমারী একটি নদী বন্দর। চিলমারীর কয়েক মাইল দক্ষিণে তিস্তা নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। নদীপথ ছাড়াও চিলমারী রেল ও সড়ক দ্বারা যুক্ত। চিলমারীতে পাকবাহিনীর যাতায়াতের জন্য সড়ক এবং নদীপথ উন্মুক্ত ছিল। আমার অক্লান্ত গোয়েন্দা অফিসার ওয়ারেন্ট অফিসার শফিকউল্লা শত্রু সম্পর্কীয় খবরাখবর সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি শত্রু সৈন্যের সঠিক অবস্থানসহ চিলমারীর বিস্তারিত এবং হুবহু মাটির নকশা তৈরী করে ফেললেন। চিলমারীতে যখন পাকবাহিনীর দুই কোম্পানী নিয়মিত সৈন্য এবং দুই কোম্পানী মিলিশিয়া অবস্থান করছিলো। তারা চিলমারীর ওয়াপদা ভবন, জোরগাছ, রাজভিটা, থানা হাট পুলিশ স্টেশন, বলবাড়ী রেলওয়ে স্টেশন এবং পুলিশ স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে ব্রীজে মোতায়েন ছিল, তাদের সাথে ছিলো কুখ্যাত ওয়ালী মাহমুদ ও পাচু মিয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বড় আকারের এক রাজাকার বাহিনী।

শত্রুকে প্রচণ্ড আঘাত হানার জন্য আমাদের দরকার ছিলো একই সময়ে বিভিন্ন অবস্থানের শত্রুসেনাদের আক্রমণ করা এবং ঐ অবস্থানে তাদের আটকে রাখা যাতে করে তারা একে অন্যের সাহায্যে বিশেষ করে চিলমারীতে সাহায্যকারী শত্রুসেনা এগিয়ে আসতে না পারে। সেজন্যে চিলমারীর বেশ পিছনে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি দল পাঠাবার প্রয়োজন ছিল। এ অভিযানের সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত ছিল শত্রুর অজ্ঞাতে অতর্কিত আক্রমণের উপর। এক বিরাট বাহিনীর পক্ষে সকলের অগোচরে প্রায় ৩ মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। এছাড়া মূল আক্রমণকে সমর্থন দেয়ার জন্য যে চারটি স্বল্প পাল্লার কামান আমাদের কাছে ছিল, সেগুলো নিকটবর্তী কোন চরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। শত্রু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংসৃহীত হলো, প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন হলো। বিভিন্ন অবস্থানের শত্রুদের উপর একই সাথে আঘাত হানার জন্য বিভিন্ন সময় আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। এই অভিযান বিফল হয়ে যাওয়ার একটি মাত্র সম্ভাবনা ছিল সেটি যদি কোন অতিউৎসাহী মুক্তিযোদ্ধা আক্রমণ মুহূর্তের পূর্বেই উত্তেজনাবশতঃ কিছু করে বসে।

অক্টোবর ৯। সড়ক এবং রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকারী প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজের নির্দেশ নিয়ে সন্ধ্যার পর রওনা হলো। গোপনে ও অতিসন্তর্পণে এই দলটিকে উলিপুর এবং রৌমারীর মাঝামাঝি স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে মূল আক্রমণ শুরু হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকতে হবে। অক্টোবর ১১। মূল বাহিনী চিলমারীর উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ষাটটি দেশী নৌকা তাদের বহন করে এগিয়ে চললো। এক সাথে এতগুলো দেশী নৌকার ব্যবস্থা করাও তাদের বিভিন্ন অবস্থান থেকে সঙ্গোপনে একই সময়ে শত্রুঘাঁটির নিকটে নিয়ে যাওয়া সেটা বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। কমান্ডার আবুল কাসেম চাঁদ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ছাত্র এ ব্যাপারে এগিয়ে থাকা আর সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলো। রাতের অন্ধকারে দূরপাল্লার কামানগুলো চালিয়াপাড়ায় স্থাপন করা হলো। এই ভারী অস্ত্রগুলোকে নৌকা থেকে নামিয়ে বালুচরের দিয়ে টেনে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করা যে কি বিপজ্জনক এবং কঠিন কাজ তা লিখে বোঝানো যাবে না। স্বাধীনতা যুদ্ধের আর এক অসম সাহসী সৈনিক নায়েব সুবাদার মান্নান। তার উপর দায়িত্ব ছিল ওয়াপদা ভবন ধ্বংস করার, সেখানে পাকিস্তানী অফিসাররা প্রমোদ বিলাসে মত্ত থাকতেন। আমরা মাত্র দুটি রকেট লাঞ্চার তার দলকে দিতে পেরেছিলাম। কমান্ডার চাঁদের নেতৃত্বে বিভিন্ন দল গোরগাছা রাজভিটা, থানাহাট পুলিশ স্টেশন এবং ব্রীজ অবস্থান আক্রমণের জন্য নির্দিষ্ট হলো। এদের অর্ধেকের সাথে ছিল ৩০৩ রাইফেল কিছু পুরোনো স্টেনগান আর বাকিদের কাছে শুধুমাত্র গ্রেনেড। মূলবাহিনীর এই ছোট ছোট দলগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছিল খালেদ দুলু, সুলায়মান, নূর আহমেদ আলো আর

নজরুল। বলবাড়ি পুলিশ স্টেশনের জন্য কোন দল পাঠানো হয়নি, কারণ আমাদের জানা ছিল শত্রুসেনারা রাত্রে সে অবস্থান ছেড়ে চলে আসতো।

আক্রমণ পরিচালনার জন্য চালিয়াপাড়ায় আমি আমার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করলাম, চিলমারীর দুই মাইল দক্ষিণে গাজীর চরকে আক্রমণকারী বাহিনীর আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তের ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেয়া হলো। গভীর রাত। ১টার সময় খবর এলো আমাদের সম্পূর্ণবাহিনীর আক্রমণস্থলের নিকটবর্তী ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছে এবং যার যার নির্দিষ্ট আক্রমণ স্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গ্রাউন্ড সিট বিছিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত সাড়ে তিনটা। আমাকে জাগানো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বাহিনী শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নানা ভাবনা সে স্বল্প সময়টুকুতে আমার মনে ভিড় জমালো। হাতিয়ারের অভাব, অল্পবয়সী ছেলেরা, এরা কি পারবে এই বিরাট আক্রমণ সাফল্যমন্ডিত করতে? কি হবে ওখানকার জনসাধারণের যখন আমরা চিলমারী ছেড়ে চলে আসবো? রাত ৪টা। খুব কাছে থেকে রকেট লঞ্চার দিয়ে ওয়াপদা ভবনের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয়েছে। সমস্ত শত্রুঘাঁটিতে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এলো। দূরপাল্লার কামানগুলো শত্রুসেনাদের গানবোটগুলোর সম্ভাব্য অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। কামানের গোলা গ্রেনেড। মেশিনগান আর ছোট অস্ত্রের আওয়াজে রাতের নিঃস্তব্ধতা ভেঙ্গে যেতে লাগলো। সকাল ৬টার মধ্যেই গোরগাছ, রাজভিটা, পুলিশ স্টেশন ও ব্রীজের অবস্থানগুলি আমাদের আয়ত্তে আসলো কিন্তু ওয়াপদা ভবনের আশেপাশের কংক্রীট বাংকার শত্রুসেনারা তাদের অবস্থান আকড়ে থাকলো এবং বলবাড়ী স্টেশনে কিছু শত্রুসেনার চলাচল আমাদের নজরে পড়লো। আমাদের একমাত্র নির্ভর রকেট লাঞ্চার দুটি শত্রু বাংকারগুলিকে নির্মূল করতে পারলো না বটে, তবে ওয়াপদা ভবনে অবস্থানরত প্রচুর শত্রুসেনা খতম করতে সক্ষম হলো। শুধুমাত্র এ দুটি অস্ত্রের উপর নির্ভর করায় আমরা শত্রুর এই অবস্থানটি দখল করতে সক্ষম হলাম না। যেহেতু সম্পূর্ণভাবে শত্রুকে ধ্বংস করা গেলনা তাই শত্রুকে তাদের ঘাঁটিতে আটক রাখার জন্য আমাদের দলটিকেও তাদের অবস্থান আকড়ে থাকতে হলো কারণ একমাত্র রাতের অন্ধকারে সফল পশ্চাদপসারণ সম্ভব। সকাল ৮টা। আমার কাছে খবর এলো, চাঁদ আরো সাহায্য চাচ্ছে, মনে হলো অবস্থা সংকটজনক। সে লক্ষ্য করেছে বলবাড়ী রেলস্টেশন থেকে শত্রুসেনারা নতুন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমার ছোট স্পীড বোটটি নিয়ে নদী পার হয়ে চালিয়াপাড়া থেকে গাজীর চরে দিয়ে পৌছালাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ বন্দীদের কাছ থেকে খবর বার করার চেষ্টা করছেন। তার ব্যবস্থাপনা আরও জানলাম চাঁদকে সাহায্য করার মত কোন বাড়তি দল রাখা হয়নি। তৎক্ষণাত আমি আমার ছোট্ট রক্ষাকারি বাহিনী নিয়ে থানা

অভিমুখে এগিয়ে গেলাম। ভাগ্যক্রমে আমাদের একটি এসএমজি ছিল। এই অস্ত্রটি সেদিন আমাদের ভীষণ উপকারে আসে। নানাদিক থেকে মাঝে মধ্যেই গোলাগুলি চলছিলো। গ্রামবাসীরা যে যেদিকে পারছিলো, দৌড়াচ্ছিল। কেউ কেউ জয়বাংলা-জয়বাংলা বলে চিৎকার করছিলো। থানার এক মাইলের মধ্যে চলে এসেছি এমন সময় একটি ফেলে যাওয়া গরুর গাড়ী রাস্তার মাঝখানে পেলাম। গাড়িতে শুয়ে ছিলো একজন মেয়েলোক, একটি হাত ভাঙ্গা, বুকের একটি স্তন নেই। পাকিস্তানী মর্টার শেলের শিকার। তার বাচ্চা ছেলেটি মায়ের রক্তে মাখা বসে আছে, কাঁদছে। এই নিস্পাপ শিশুটি তার মাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। একজন গ্রামবাসীকে ডেকে জানলাম, মেয়েটিকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছিলো। থানার পাশেই হাসপাতাল, তার ঐদিক থেকেই গুলি আসছে তাই তাকে ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। আমি ঐ লোকটিকে গাড়ী চালিয়ে আমাদের সাথে আসতে বললাম। আমরা সাথে থাকায় সে সাহস ফিরে পেলো। হাসপাতালে যখন পৌছলাম, গুলিবর্ষণ তখন আরো তীব্রতর হয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি হাসপাতালের দেয়ালে আঘাত হানছে। ভাগ্যক্রমে হাসপাতালের ভেতরে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ডাক্তারকে পেলাম, আমি সেই হতভাগ্য মেয়েলোকটিকে ডাক্তারের উপর ছেড়ে দিলাম – জানিনা আজ সে বেঁচে আছে কিনা।

হাসপাতাল থেকে বের হয়েই দেখি চাঁদ দৌড়ে আসছে আমার দিকে। সে কাঁদছিলো। আমাকে জানালো তার দলের ছেলেরা ৭৬টি দখল করা অস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ ফেলে থানার অবস্থান ছেড়ে চলে এসেছে। তাকে উৎসাহ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম পূর্ব অবস্থান পুনর্দখলের জন্য। মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি আমার উপর দিয়ে চলে গেল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রায় ১০০ গজ দূরে রেললাইনের উপর অবস্থান নিয়েছে। বাঁশঝাড়ের আড়ালে আড়ালে আমরা এগিয়ে গেলাম এবং শত্রুবাহিনীর একপাশে আমার রক্ষাকারী বাহিনীর এল.এম.জি স্থাপন করলাম। এক নাগাড়ে গুলি করার পর কিছু পাকিস্তানী সেনা পড়ে গেল। বাকিরা তাদের অবস্থান ছেড়ে রেললাইনের ওপারে চলে গেল। তড়িৎগতিতে আমরা রেললাইন দখল করলাম। গুলি চালিয়ে আরো কিছু পলায়নপর পাকিস্তানী সৈন্য খতম করা হলো। কিছুক্ষণপরই বলবাড়ী স্টেশনের অবস্থান থেকে শত্রু সৈন্যরা আমাদের উপর গুলি চালালো। আমরা পিছু হটে পুলিশ স্টেশনে অবস্থান নিলাম। সেখানে পাকিস্তানীদের তৈরী ট্রেঞ্চের অভাব ছিল না। দখল করা অস্ত্র এবং গোলাবারুদ গাজীর চরে পাঠানো হলো। একটি ঘরে আমি দশ বস্তা চাল ও দুই বস্তা গম পেলাম। চেয়েছিলাম এগুলো গ্রামবাসীরা নিয়ে যাক কিন্তু নেওয়ার মত কেউ সেখানে ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পর আমি একজন বুড়ো লোককে পেলাম। আমি তাকে দরকার থাকলে কিছু চাল নিতে বললাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিক থেকে লোকজন আসতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো তারা যেন মাটি ফুঁড়ে বের হচ্ছে। হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো ছেলে, বুড়ো, পুরুষ-মেয়েলোক সবাই কাড়াকাড়ি করছে, যা পাচ্ছে তুলে নেওয়ার জন্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানা ও থানার পাশের পুলিশের বাসাগুলো খালি হয়ে গেলো। সে দৃশ্য ভোলার নয়। রাতের অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে আমি কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা রেখে আসার উদ্দেশ্য ছিলো যাতে পাকিস্তানীরা আমাদের পিছু নিতে না পারে।

যদিও আমরা ওয়াপদা ভবনের বাঙ্কারগুলো এবং বলবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনের অবস্থান সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারিনি তবু পাকিস্তানী সেনাবাহিনী দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অতিনিকট থেকে সম্পূর্ণ ঘেরাও হয়েও শত্রু সৈন্যরা আত্মসম্পর্ণ করেনি। সত্যিই তারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলো। আমরা জানতাম, আমাদের চলে আসার পর ঐ এলাকার জনসাধারণের উপর পাকিস্তানীরা কি ভয়াবহ অত্যাচার চালাবে। কিন্তু আমাদের উপায় ছিল না। পেছনে ব্রহ্মপুত্র নদীর বিরাট বাধা নিয়ে আমাদের পক্ষে দখল করা অবস্থান আকড়ে থাকা সম্ভব ছিল না। এই আক্রমণের উদ্দেশ্যই ছিলো শত্রুকে অকস্মাৎ আঘাত হানা, যত বেশী সম্ভব শত্রুসেনা খতম করা, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করা। আমরা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলাম। আমরা চলে আসার দুদিন পর পাকিস্তানীরা ঐ এলাকার নিরীহ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। নিরস্ত্রজাতি এমনভাবে অত্যাচার সহ্য করেই বাংলার স্বাধীনতা এনেছে।

ওয়ারেন্ট অফিসার শফিকউল্লার নেতৃত্বে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকারী দলটি অভূতপূর্ব সাফল্যের সাথে তাদের কাজ সম্পাদন করে। তারা শুধু সড়ক এবং রেলপথের ব্রীজগুলো ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, জায়গায় জায়গায় রেলওয়ে লাইন এবং রাস্তা কেটে তারা সমান করে দেয়। বেশ কিছুদিনের জন্য এই যোগাযোগ ব্যবস্থা পাকিস্তানীরা ব্যবহার করতে পারবে না।

অক্টোবর ১৩। বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী এবং প্রচুর অস্ত্র গোলবারুদ নিয়ে আমরা রৌমারী ফিরে এলাম। জনগণের আদালতে ওয়ালী মাহমুদ ও পাঁচু মিয়ার বিচার হলো দেশপ্রেমিক হত্যা, রাজাকার বাহিনী সংগঠন এবং লুণ্ঠনের অপরাধে তারা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। বহু সংখ্যক বাঙ্গালী রাজাকার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। ওয়ারেন্ট অফিসার শফিকউল্লাহ, নায়েব সুবাদার মান্নান চাঁদ, দুলু, আলো, সুলেমান, নজরুল এবং আরো অনেকের বীরত্ব এবং ত্যাগের কথা কোনদিনই ভোলা যাবে না। এরাই বাংলার সোনার ছেলে।

শহীদ লেফটেন্যান্ট সামাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

শাহরিয়ার কবির

লেফটেন্যান্ট সামাদ উত্তরের রণাঙ্গণে এক বছর আগে এক ভয়াবহ যুদ্ধে মাথায় গুলি লেগে শহীদ হয়েছেন। গত ২০শে নভেম্বর ছিলো তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁর উপর রিপোর্ট অনেকেই হয়তো পড়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আমাকেও কিছু লিখতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে এটা একজন সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব। অথচ আমি জানি সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ তাঁকে এবং পুরো সামাদ পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এতো বেশী নিবিড় যে বিচ্ছিন্নভাবে সামাদ ভাই সম্পর্কে কিছু লেখার কথা আমি ভাবতে পারি না। আরো ভাবতে পারি না শহীদ লেফটেন্যান্ট সামাদের ওপর রিপোর্ট লেখার কথা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এই পরিবারটির ভূমিকা যে কোন জাতির ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল ভাষায় লিখিত হতে পারে। যুদ্ধের ইতিহাসে যে সকল মহান বীরদের ত্যাগ, আদর্শ, কর্মক্ষমতা, সাহস এবং শৌর্যের কথা পড়ে একদা আবেগে আপ্লুত হতাম বাস্তবে লেফটেন্যান্ট সামাদের জীবনের শেষের দিকের ঘটনাগুলো সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ম্লান করে দিয়েছি। যুদ্ধের সময় ভাবতাম, এই সকল মহান দেশপ্রেমিকদের কথা লিখতে হবে যা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এক বিরাট অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। জাতীয় চেতনার যে ব্যাপক বিকাশ দেখে এক সময় গর্বিত হতাম, কতগুলো মৃত্যু এবং পরবর্তী প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো। প্রথম আঘাত পেয়েছিলাম অগ্রজপ্রতীম আশফাকুস সামাদের মৃত্যুতে এবং দ্বিতীয় আঘাত ছিলো আমার অগ্রজের নিহত হবার

সংবাদে। তারপর মৃত্যুর পর মৃত্যু। আঘাতের পর আঘাত এবং আরো আঘাত। কোথাও এতটুকু সান্ত্বনার ছায়া দেখিনি।

বহুদিন ধরে ভাবছিলাম লেফটেন্যান্ট সামাদ সম্পর্কে কিছু লেখা উচিত। ক্রমাগত তাঁর সম্পর্কে যে সকল আশ্চর্য অসাধারণ সংবাদ এবং তথ্য পাচ্ছিলাম তাতে ইতিহাসে পাঠকদের বিস্মিত না হবার অবকাশ নেই। স্বাধীন বাংলা বেতার প্রথম সংবাদ দিয়েছিলো। তারপর আকাশবাণী এবং আবার একাধিকবার স্বাধীন বাংলা বেতারে লেফটেন্যান্ট সামাদের শহীদ হবার সংবাদ এবং পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁকে সমাহিত করার সংবাদ প্রচার করা হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো যে জয়মনিরহাটের যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বীরত্বে গর্বিত ও মুগ্ধ হয়ে সেই জায়গার নাম রেখেছেন সামাদনগর। এরপর শত্রু মুক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে। গৌরবোজ্জ্বল সেই যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারপরের ইতিহাস হঠাৎ এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে থেমে গেছে। এখনো থেমে আছে, কারণ লেফটেন্যান্ট সামাদ আজো সরকারের খাতায় জাতীয় বীরের মর্যাদা পাননি। তাঁকে মরণোত্তর কোন সম্মানে ভূষিত করার ব্যাপারে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কার্পণ্য সবাইকে বিস্মিত করেছে; বিশেষ করে উত্তর রণাঙ্গনের সেই সকল মানুষদের যাদের কথা আর স্মৃতিতে সামাদ কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হয়েছেন। ইতিহাস তবু থেমে থাকবে না। কারণ সরকারের স্বীকৃতির জন্য কোন জাতীয় বীরের মর্যাদা কখনো কোথাও ক্ষুণ্ন হয়নি। জাতি হিসেবে বাঙালী যদি অকৃতজ্ঞ না হয় লেফটেন্যান্ট সামাদকে আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করা যায়।

সেদিন এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে লেফটেন্যান্ট সামাদের বাবার কাছে গিয়েছিলাম। বন্ধু সাংবাদিক তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, পঁচিশে মার্চের পর থেকে সামাদের বিভিন্ন কার্যক্রম। বাবা বললেন, মার্চের আটাশ তারিখে ও বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলো। তিরিশ তারিখে একবার এলো তারপর এলো এপ্রিলের চার তারিখে। সেবার তার সঙ্গে ছিলো বদি আর দুইজন ছেলে। দেখলাম কোত্থেকে অস্ত্র জোগাড় করে এনেছে। প্রায় সবই থ্রি-নট-থ্রি। সারাদিন ওগুলো বাড়িতে লুকিয়ে রাখলো। তারপর বললো, যুদ্ধে যাবার কথা। এরপর থেকে শুরু হলো লেফটেন্যান্ট সামাদের দ্বিতীয় জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা। বাড়িতে আসতেন। বাবা-মা শুনতেন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। ছোট দুটি ভাইও চলে গেছে যুদ্ধে। তখন বাড়ি বাড়ি সামরিক তল্লাশী চলছে। বাবা-মা আর সবচেয়ে ছোট ভাই এই তিনজন কখনো এখানে কখনো সেখানে। খবর শোনেন তাদের বড় ছেলে কোনদিন কোন সামরিক অফিসারকে নিয়ে যাচ্ছে সীমান্ত পার করে। কখনো কোন রাজনৈতিক নেতাকে। বেশ কয়েকবার তাঁকে ঢাকা আসতে হয়েছিলো। বাবা-মার সঙ্গে তাঁর

শেষ দেখা জুনের দু'তারিখে। এরপর মেলাঘরে গিয়ে গড়ে তুললেন গেরিলা শিবির। কর্নেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে গড়ে উঠলো মুক্তিবাহিনীর গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। জুলাইয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অফিসার্স ট্রেনিং-এ মনোনিত হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলে যান। বাবা-মা তাঁর কমিশন পাবার সংবাদ শুনেছেন অক্টোবরে। অক্টোবরে তিনি ট্রেনিং শেষ করে কমিশন অফিসার হিসেবে ছয় নম্বর সেক্টরে যোগদেন।

ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে এই অভিযোগে লেফটেন্যান্ট সামাদের বাবাকে পাক সামরিক শিবিরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। নির্মম অকথ্য অত্যাচার তারা চালিয়েছিলো কথা বের করার জন্যে। পর্যবেক্ষণ মহলে ধারণা আলতাফ মাহমুদ ছাড়া এতোখানি দৈহিক অত্যাচার কোন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে তারা নাকি করেনি। আলতাফ মাহমুদ শহীদ হয়েছিলেন। বাবা আজিজুস সামাদ মৃতপ্রায় হয়ে বেঁচেছিলেন। মা সাদেকা সামাদ পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন তাঁকে ছাড়ানোর জন্য। কি মনে করে শেষ পর্যন্ত সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সর্বদা তাঁর ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখা হয়েছে। অবশেষে একদিন সেই নজরবন্দী অবস্থার এক সুযোগে ঢাকা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন ছিলো ১৯শে নভেম্বর। সেই রাতে উত্তরবঙ্গের এক রণাঙ্গনে চলছিলো এক ভীষণ যুদ্ধ। সাড়ে সাতশ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্য লেফটেন্যান্ট সামাদের দক্ষ পরিচালনায় হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ভীষণ এক সম্মুখযুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিলেন। তারপরদিন তিন ভাই শহরের উপকণ্ঠে এক গ্রামে রাত কাটিয়েছেন। মা বললেন, সে রাতে আমি ঘুমুতে পারিনি। উলফতের সঙ্গের ছেলেরা অস্ত্র হাতে ঘোরাফেরা করছে। সেই অস্ত্র দেখে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। শেষে অন্য বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। তিনি নন, তাঁর স্বামীও নয়, সামাদের ছোট তওফিক, উলফত, শওকি কেউ তখন কল্পনাও করতে পারেনি সেই রাতে উত্তর রণাঙ্গণে দু'পক্ষের ভীষণ যুদ্ধে অন্ধকারে অতর্কিতে শত্রুপক্ষের একটি বুলেট লেফটেন্যান্ট সামাদের মাথা ভেদ করে চলে গেছে। অয়্যারলেসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জোশী রণাঙ্গনের খবর পাঠিয়েছেন, পুরো অপারেশনের মূল্যের বিনিময়ে হলেও লেফটেন্যান্ট সামাদের লাশ আমি ফেরত চাই। অকুতোভয় তেজোদীপ্ত এই তরুণ অফিসারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এই ব্রিগেডিয়ার। ঈদের দিন বিকেলে জয়মনিরহাটে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এসব কথা তাঁরা জেনেছেন অনেক পরে। ততোদিন কবরে সবুজ ঘাস গজিয়েছে। বিজয় উৎসবের পালা শেষ হয়ে গেছে। ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এসেছে। সবাই আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। শুধু কিছু চেনা মুখের অভাবে কখনো কোথাও প্রবহমান সময় সহসা স্থির হয়ে যাচ্ছে। যখন ভার্সিটির করিডোরে কিংবা ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে পরিসংখ্যান বিভাগের

দীর্ঘদেহী সুদর্শন অমায়িক তরুণ ছাত্রটিকে মনোযোগের সমস্ত পরিবেশটাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে চলে যেতে বা মাতিয়ে তুলতে দেখা যায় না তখন মুহূর্তের জন্যে হলেও সময় থেমে যায়। বন্ধু পরিচিত, চেনা এবং অচেনা সকলেই অনুভব করে সামাদ নেই। একজনকে তারা হারিয়েছে যে অভাব চিরকাল অনুভূত হবে।

আমি ভেবেছিলাম, লেফটেন্যান্ট সামাদের পরিচিতদের কাছে যাবো, তথ্য সংগ্রহ করবো বিশেষ করে যাঁরা তাঁর যুদ্ধের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা সকলেই বিমূঢ় এবং হতবাক। তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুটির মৃত্যুতে সকলেই বলার মতো ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাদল প্রায়ই বলেন, ওর তো মরবার কথা ছিলো না, আমিই ওকে জোর করে অফিসার্স ট্রেনিং-এ পাঠিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম অফিসার হলে ওকে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতে হবে না। আমি ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।

বন্ধুরা যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই জীবনের আশা ছেড়েই যুদ্ধ করেছেন। অথচ আশ্চর্য তাঁরা সকলেই চেয়েছিলেন সামাদ নিরাপদ থাকুক। ফতেহ আলী বললেন, সামাদ আমার ছোটবেলার বন্ধু। ওর সম্পর্কে কোন কথাই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ নিজের সম্পর্কে আমি যেমন বলতে পারবো না, তেমনি সামাদ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা যাবে না। এতো কাছে থেকে ওকে দেখেছি যে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে ও মিশে আছে। ফতেহ আলী যুদ্ধে যাবার কথা বললেন। আমাদের ভেতর সামাদই যুদ্ধে যাবার কথা সবার আগে ভেবেছিলো। প্রথম ও প্রতিরোধ যুদ্ধ অংশ নিয়েছিলো কিশোরগঞ্জে। কর্নেল সফিউল্লাহ ছিলেন নেতৃত্বে। ওঁরা মুখোমুখি টিকতে না পেরে পিছিয়ে যান। সামাদ ঢাকা এলো আমাদের নিতে। মেলাঘরে তখন গেরিলা ট্রেনিং-এর আয়োজন করা হচ্ছে। আমাকে একদিন এসে বলে ফেললো যুদ্ধে যাবার কথা। মানসিকভাবে আগেই তৈরী ছিলাম। আমি মায়াকে বললাম। লঞ্চে তুলে দিয়ে সামাদ রসিকতা করে বললো, তুই মরলে কিন্তু আমি দায়ী হবো না। আমি অবাক হয়ে বললাম, আমার মরার জন্য তুই কেন দায়ী হবি? দেখলাম ওর চোখে পানি এসে গেছে।

মেলাঘরে আমরা সবাই জড়ো হলাম। তৈরী হলো ক্র্যাক প্লাটুন। যে ক্র্যাক প্লাটুন যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ঢাকায় শত্রুর বুকে ভীষণ সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলো তার নেপথ্যে সামাদের ভূমিকা ছিলো বিরাট, সত্যি কথা বলতে কি সামাদই ক্র্যাক প্লাটুন সৃষ্টি করেছিলো। ট্রেনিং এর সময় আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির যতো অপরাধ সব ও নিজে বয়ে নেয়ার জন্যে এগিয়ে আসতো। মনে আছে একবার এক গুরুতর শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হলো আমার বিরুদ্ধে, সামাদ এগিয়ে এসে আমার অপরাধ নিজের ঘাড়ে তুলে নিলো। অবশ্য ওকে দেখে অন্যান্য ছেলেরাও এগিয়ে

এসেছিলো। আসলে সামাদ যে কি ছিলো কেউ কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না। ওর বন্ধু ছিলো সমাজের অতিউচ্চতর থেকে অতিনিম্নস্তর পর্যন্ত। সকলের সাথে সমান আন্তরিকতা নিয়ে মিশতে পারতো। মেয়েরা ওকে দেখে মুগ্ধ হতো। কখনো কাউকে ও হতাশ করেনি। চলাফেরায় খুবই সাধারণ ছিলো। ইচ্ছে করলে রীতিমতো ফ্যাশান দুরস্ত থাকতে পারতো। অথচ ওর জামাকাপড় ছিলো খুবই সাদামাটা। ওকে আমার যথেষ্ট রোমান্টিক মতো হতো। চমৎকার গাড়ি চালাতো। ওর আকর্ষণটা এতোই উন্মাদ আর বেপরোয়া ছিলো যে কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। ভার্সিটিতে কতো মেয়ে যে ওর প্রেমে পড়েছিলো তার হিসাব দেয়া যাবে না।

রাজনীতিগতভাবে ও বরাবরই যথেষ্ট সচেতন ছিলো। মনে আছে মেলাঘর ক্যাম্পে ও যখন অফিসার ট্রেনিং-এর জন্য মনোনীত হলো তখন ওকে বলেছিলাম, নাইবা গেলি ট্রেনিং-এ আমাদের সঙ্গেই থেকে যা না। মরতে যদি হয় একসঙ্গেই মরবো। এ কথার জবাবে সামাদ আমাকে অনেক কথা বলেছিলো, যার প্রত্যেকটি শব্দ আমার মনে আছে। সামাদ বলেছিলো, দ্যাখ যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে বছর পাঁচেকের আগে থামবে বলে মনে হয় না। আর যেভাবে যুদ্ধ চলছে সেভাবে গণমুক্তিফৌজ গঠন করতে হলে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বেই করতে হবে। সামরিক বাহিনীতে সমস্ত ক্ষমতা হাতে না আসা পর্যন্ত গণযুদ্ধের কথা বর্তমান অবস্থাতে আমি ভাবতে পারি না। আমরা যদি দেশের সার্বিক মুক্তি চাই তার প্রস্তুতি এখন থেকেই আমাদের নিতে হবে। আমি আবার বলেছিলাম, ভেবে দ্যাখ অফিসার হওয়া মাত্র তুই অনেক দায়িত্ব আর বিধিনিষেধের ভেতর আটকা পড়ে যাবি। একজন সরকারী কর্মচারীর ভূমিকা তুই পালন করবি। অথচ আমরা গেরিলাই থাকবো। আমাদের কেউ তাদের খেয়ালখুশি মতো চালাতে পারবে না। আমাদের আসল পরিচয় ঠিকানা কেউ জানবে না। জবাবে সামাদ বলেছিলো, সরকার যা খুশি ইচ্ছে করলেই আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। আমরা যতোদিন যুদ্ধে থাকবো এবং দেশ স্বাধীন হবার পরও ক্ষমতা আমাদের হাতেই থাকবে। তোরাও চলে আয়। অফিসারদের ভেতর প্রগ্রেসিভ চিন্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমাদের এভাবেই নেতৃত্ব নিতে হবে। সামাদের উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিলো। ও চলে গেলো। আমরা মেলাঘরে পড়ে রইলাম। অক্টোবরে খবর পেলাম ও বুড়িমারিতে আছে। উলফত আমাদের সঙ্গেই ছিলো। এর ভেতর একদিন ও মা বাবাকে আনার জন্যে ঢাকা চলে গেলো। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সবাইকে নিয়ে ফিরে এলো। ও যখন আগরতলার পথে তখন আমরা স্বাধীন বাংলা বেতারে সামাদের শহীদ হবার সংবাদ শুনলাম। খবরে বলেছিলো লেফটেন্যান্ট সামাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। তবু আমরা ঠিক বুঝেছিলাম ও আমাদেরই সামাদ।

তওফিকরা যখন আগরতলা এলো তখন আমরা ছুটে গিয়েছিলাম ওদের দেখতে। দেখলাম ওরা খবর শোনেনি। আমরা কেউ সামাদের খবর ওদের বলতে পারিনি। সবাই অপ্রতিভ হয়ে ফিরে এসেছিলাম। কদিন আগে মানিকের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলাম। সামাদের খবর শোনার পর আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়ি। প্রিয় বন্ধুরা এক এক করে মরে যাচ্ছে। ক্যাম্পে থাকা অসহনীয় হয়ে উঠলো। একরকম জোর করেই এরপর অপারেশনে মেরে পাঁচটা মৃতদেহ এবং এক পাঞ্জাবীকে জ্যান্ত ধরে এনেছি। মৃতদেহগুলির ছবি বোধহয় খবরের কাগজে দেখেছ। গত পরশু দিন প্রায় ছ'ঘন্টা কাদার মধ্যে পড়েছিলাম। গিয়েছিলাম পাঞ্জাবীদের একটা কনভয়কে এ্যামবুশ করতে। এ্যামবুশ করার পর হতভাগারা আমাদের উপর এমনভাবে গুলি চালান শুরু করে যে এক ব্রিজের নিচে বিকেল তিনটে থেকে রাত প্রায় নয়টা পর্যন্ত কাদার মধ্যে মাথা ডুবিয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল। পরে রাত নটার দিকে আমাদের আর্টিলারী সাপোর্ট পাওয়ার পর কোনমতে ফিরে এসেছি। আজ প্রায় আটদিন পর গা ধুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। তাও ওরা বোধহয় আজ রাতে ঘুমুতে দেবে না। তোমাকে লিখতে আরম্ভ করার পর এ পর্যন্ত প্রায় কুড়িটি শেল আমাদের উপর পড়ল। এই অবস্থায় তোমার সুন্দর চিঠিটা পড়লাম। বোমা, গুলি, বারুদ এবং মৃত্যু, ধ্বংসের বাইরে যে আর একটা পৃথিবী আছে তোমার চিঠিটা তা নতুন করে মনে করিয়ে দিল। তুমি হয়ত ভাবছ তোমার লেখা একটি সামান্য চিঠিকে আমি কেন একটি ফেডারের কেস বানাচ্ছি। কিন্তু এই মুহূর্তে, এই পরিবেশে, এই বাঙ্কারের মধ্যে এটা তাই-ই। একটু অপেক্ষা কর – আমার একটি মোরগ আছে ওটাকে বাঙ্কারের ভেতর নিয়ে এলাম। বাঙ্কারের মধ্যে আপাতত ওটাই আমার সঙ্গী। বাইরে কি সুন্দর পূর্ণিমার আলো। কিন্তু হতভাগাদের জন্য তাও উপভোগ করা যাবে না। বাইরে বেশীক্ষণ থাকলে পৈতৃক প্রাণটা হারাতে হতে পারে। ওরা আজ ভীষণ ক্ষেপেছে। কারণ আজ দুপুর ১টার দিকে একটি মাত্র আর্টিলারী শেল ওদের উপর ফেলেছিলাম। তাতেই ওদের একজন অফিসারসহ প্রায় ১১ জন মৃত অথবা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এইমাত্র ইন্টেলিজেন্স এর খবরে শুনলাম। একটা মজার কথা জান, ওরা এত শেল আমাদের উপর ফেলেছে কিন্তু একটিও আমাদের উপর ডাইরেক্ট হিট হয়নি অথবা আমার কোন লোকের ক্ষতি হয়নি। অথচ আমরা শেল করলে ৮০% রেজাল্ট পাই। ওরা একশটি মারলে আমরা দুটি মারি তাতেই ফল পাওয়া যায়। এইত, ওরা মেরে চলেছে, আমি শেষ রাতের দিকে বেশী না চারটি শেল ডাইরেক্ট করব। ওরা চুপ হয়ে যাবে। মুক্তিবাহিনীর এই একটা ব্লেসিং আছে। আমাদের খুব কম গুলি বৃথা যায়।

আমাদের অনেক কথা লিখলাম। তোমরা কেমন আছ? নাইনু কেমন আছে? কোলকাতায় আমার পরিচিত কারা আছে জানিও। আমার ছোট দুই ভাই বর্ডার-

এর কোন ক্যাম্পে যে আছে জানি না। বাড়ির জন্য মাঝে মাঝে মন ভীষণ খারাপ লাগে। বিশেষ করে ট্রুপরা এসে যখন ছুটি চায় বাবা মার সাথে দেখা করার জন্য তখন হঠাৎ আব্বা-আম্মাকে মনে পড়ে যায়। যাক, মাহফুজ আনম কোলকাতায় কিভাবে এল? ও না করাচী গিয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। তুমি টিটোর কথা লিখেছ ত? তোমার কবিতাটা খুব ভাল লাগল। তাহলে মনে হচ্ছে আমাদের 'মাস গ্রেভ'এর ওপর একটা কবিতা বা অন্য কিছু লেখা থাকবে। তুমি ওটা লিখে দিও। আমি অবশ্য অত শিগগিরই মরছি না। তোমাকে ভীষণ লম্বা একটা চিঠি লিখে ফেললাম। আজ শেষ করি। প্রীতি নিও। উত্তর দিও। জয় বাংলা। ইতি, সামাদ ভাই

তিন তারিখের চিঠিতে লেফটেন্যান্ট সামাদ লিখেছিলেন আমি অবশ্য অত শিগগিরই মরছি না। যখন তাঁর চারপাশে অবিরাম গোলাবর্ষণ যে কোন একটি গোলায় বাঙ্কার উড়ে যেতে পারে ঠিক সেই মুহূর্তে কতখানি ভয়শূন্য হলে এ ধরনের সহজ, সরল ও কৌতুকমণ্ডিত চিঠি লেখা যায় অনুমান করতে রীতিমতো কষ্ট হয়। যখন শুনি তাঁর অন্তিম সহযোদ্ধা সুবেদার ওহাব বলেন, 'মারা যাবার আগেরদিন তিনি বলেছিলেন, আমি যদি মারা যাই আপনি আমার লাশ আনবেন, আর আপনি যদি মারা যান তাহলে আমি আপনার লাশ আনবো। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক গলায় তিনি কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি হাসছিলেন। মানুষটি কি ধাতুতে গড়াছিলো ভেবে শুধু বিস্মিত হতে হয়। ছোট ভাই শওকি কিছুদিন আগে মাকে তাঁর কবর দেখতে চলে গেলাম। উলফত বললো, কোলকাতা গিয়ে আমি ভাইয়ার খবর শুনেছিলাম। কিন্তু আব্বা-আম্মা কাউকে বলতে পারিনি। বরং পরিচিত যাঁরা জানতেন তাঁদের সবাইকে বলে এলাম, ওঁদের যেন কেউ এ সম্পর্কে কিছু না বলেন। একদিন হোটেলে খাচ্ছি। হঠাৎ শুনলাম আকাশবাণীর খবরে বলা হচ্ছে লেফটেন্যান্ট সামাদ শহীদ হয়েছেন। একুশবার তোপধ্বনি সহকারে তাঁর সৎকার করা হয়েছে। একটু পরে দেখলাম আব্বা ছুটে এলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বললেন, খবর শুনেছো। আমি ভাব দেখালাম যেন এই প্রথম শুনেছি। আব্বা হু হু করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমার বিশ বছরে জীবনে তাঁকে প্রথম কাঁদতে দেখলাম। এর আগে কোন মৃত্যু সংবাদেই তাঁকে এতো ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি।

লেফটেন্যান্ট সামাদের বাবা-মা কেউ সেই আঘাত এখনো সামলে উঠতে পারেননি। তাঁদের দেখে মনে হয় আজীবন তাঁরা এই মৃত্যুশোক বয়ে বেড়াবেন। শরীর আর মন দুটোই ভেঙ্গে গেছে। আত্মীয়-স্বজনরা বলেন, তোমাদেরতো আরো তিনটি ছেলে আছে। ওদের কথাও ভাবো। ওরাতো বেঁচে আছে। আমি জানি এভাবে ওঁদের সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না। তানির মৃত্যু সংবাদ ঝড়ের মতো তাঁদের

সংসারের সকল সুখানুভূতি থেকে উপড়ে বহু দূরে ছুড়ে ফেলেছে। বেঁচে থাকাটা এখন শুধু যান্ত্রিক কোন লোকাচারে পরিণত হয়েছে। মরতে পারছেন না বলেই বেঁচে আছেন। স্মৃতির এ্যালবামে টুকরো টুকরো ছবিগুলো সযত্নে জুড়ে রাখেন। বার বার অতীতে হারিয়ে যান। বিষন্ন গলায় ছেলের বন্ধুদের বলেন, তোমরা আসোনা কেন? তোমাদের দেখতে ইচ্ছে করে। বেঁচে থাকার যে দুঃসহ যন্ত্রণা পৃথিবীর কোনো কোনো মানুষকে সইতে হয় তার সবটুকুই তাঁদের অবিরাম ক্ষতবিক্ষত করছে।

তওফিক, উলফত আর শওকিকে দেখে অচেনা কারো মনে হতে পারে ওরা হয়তো স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে। অথচ আমি জানি ওরা কেউ এখনো আগের মতো স্বাভাবিক নয়। কিছুদিন লক্ষ্য করলে ওদের আচরণে ধরা পড়ে। ভীষণ হতাশায় ভুগছে ওরা। ভুলে যেতে চাইতে রক্তাক্ত স্মৃতিগুলো। তবু বার বার সেই বেদনাবহ স্মৃতি দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। ওরা সবাই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ৭১-এর মার্চের আগে ওদের যেভাবে দেখতাম বর্তমানের সঙ্গে তার মিল খুবই সামান্য। একটি মৃত্যু এতোখানি শোকাবহ হতে পারে সামাদের আগে আমার সেটা জানা ছিলো না। অথচ কি আশ্চর্য, এই সামাদ মৃত্যুকে বাস্তবের একটি তুচ্ছতম ঘটনা ছাড়া ভাবতে পারেনি। তাঁর সহযোদ্ধারা বলেন, সেই ভীষণ রণাঙ্গনে শত্রুর গোলার গন্ডীতে থেকেও তাঁর মুখের হাসি মুহূর্তের জন্যে ম্লান হয়নি। স্বাভাবিক আচরণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও অস্বাভাবিকতা আসেনি। আমি বিস্মিত হয়েছি রণাঙ্গন থেকে বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিগুলো পড়ে। এ চিঠি উদ্ধৃত না করলে বোঝানো যাবে না মৃত্যুকে কতোখানি তুচ্ছ জ্ঞান করলে এক ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে বসে স্বাভাবিক নিয়মে কৌতুক করা যায়। তাঁর শেষ চিঠি সম্ভবত ৩রা নভেম্বরে লিখেছিলেন তাযিন মুর্শেদকে। সম্পূর্ণ চিঠিখানাই তুলে ধরছি।

প্রিয় রুমা, আজ এই সাত মাস পরে এই প্রথম কারু কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। কাজেই বুঝতেই পারছ কি রকম লাগছে। জানো, সামান্য একটি চিঠি, সামান্য কটি লাইন – তা সে যার কাছ থেকেই হোক না কেন, কোন কোন সময় এত ভাল লাগে যে তা বুঝিয়ে বলবার নয়। আমার অবস্থাটা তোমাকে লিখছি। গত পনের দিন কম করে হলেও চার হাজার আর্টিলারী শেল আমার আশেপাশে পড়েছে এবং এই মুহূর্তে পড়ছে। কোন কোনটা আমার ১০ গজের মধ্যে পড়েছে। মাথার উপর দিয়ে কত বুলেট যে গেছে তার হিসাব নেই। কতগুলো পাঞ্জাবী যে ক'দিনে আমাদের হাতে মারা পড়েছে তার হিসাব নেই। কম করে হলেও আড়াইশ জন। পাঁচজনের কম মারা পড়লে আমরা হিসাব করি না। দিন চারেক আগে ওদের প্রায় ৪০জনকে মেরেছিলাম। টুকরো টুকরো অনেকগুলো ঘটনা বললো শওকি। যার প্রত্যেকটির নায়ক লেফটেন্যান্ট সামাদ। হঠাৎ মনে হয় এ নায়ক

আজকের যুগের কোন নায়ক নয়। মনে হয় প্রাচীনকালের নায়কদের মতো একটা আদর্শকে ধ্রুব জেনে মৃত্যু থেকে শুরু করে প্রতিটি ভয়কে তুচ্ছ জেনে আগ্রহ করে, হাসিমুখে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান, মৃত্যুর কালোছায়া কখনো স্পর্ধিত হয় না সে হাসি মুছে দেয়ার। তাঁর আদর্শ কি ছিল প্রশ্ন জাগতে পারে। আমি সরাসরি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চাই না। আমি জানি মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন। যে কোন মানুষকেই ভালোবাসতেন। সমাজ, দর্শন, রাজনীতি কোনদিন সেই ভালোবাসার প্রতিবন্ধক হয়নি।

সুবেদার ওহাব মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সামাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন, ব্রিগেডিয়ার জোশী বার বার লেফটেন্যান্ট সামাদকে এই অপারেশনে যেতে মানা করেছিলেন। তাঁর মরিয়া ভাব দেখে ব্রিগেডিয়ার বলেছিলেন, তোমাকে চারদিন আগে বদলি করা হয়েছে। তোমার উচিত বদলির জায়গায় যাওয়া। জোর করে সামাদকে তিনি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন সারারাত ধরে তুমুল যুদ্ধ হবে। কিছুটা অনির্ধারিত আক্রমণ ছয় নম্বর সেক্টরের সামরিক অধিনায়করা জরুরী বৈঠকে বসেছেন। রাতে লেফটেন্যান্ট সামাদ আবার এলেন। তাঁর হাতে একটি টর্চ আর সেই এলাকার নকশা। বললেন, আমাকে যেতেই হবে। ব্রিগেডিয়ার জোশী কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, তুমি তাহলে সুবেদার শামসুল হকের সঙ্গে থাকবে। ওর কথা মেনে চলবে। সায় জানিয়ে সামাদ বেরিয়ে এসেছিলেন। তবে শেষ মুহূর্তে তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টে ওহাবের সঙ্গে থাকবে বলে মনস্থির করলেন। শামসুল হক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সুবেদার ওহাবও। তাঁদের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। তাঁরা ভালোবাসতেন অসীম সাহসী ওই তরুণ অফিসারটিকে। বলেছিলেন, আমাদের কথা মতো আপনার চলা উচিত স্যার। সামাদ হাসিমুখে অগ্রাহ্য করলেন। ওহাবের মনে পড়লো গত কালকের কথা। আমি যদি মারা যাই, আপনি আমার লাশ আনবেন। শামসুল হক আবার বললেন, আমার সঙ্গে আপনি নিরাপদে থাকবেন। ততক্ষণে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়েছে। লেফটেন্যান্ট সামাদের ওপর সুবেদার ওহাবের শুরু থেকেই আস্থা ছিলো। ঝিমিয়ে পড়া এই ফ্রন্টটি লেফটেন্যান্ট সামাদ আর লেফটেন্যান্ট আবদুল্লাহ্ আসার পর মুহূর্তেই সজিব হয়ে উঠেছিলো। ভারতীয় সেনা নায়করা প্রথমে এদের ওপর ততোখানি আস্থাশীল ছিলেন না। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন একের পর এক শত্রুপক্ষের ঘাঁটি দখল করে এরা এগিয়ে যাচ্ছে আর মুক্তাঞ্চল দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে তখন সরবরাহের দরজা না খুলে থাকতে পারেননি। কিছুদিনের মধ্যেই কর্নেল সায়মন, ব্রিগেডিয়ার জোশী এবং অন্যান্য সমরবিদদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন সামাদ। যে কোন নীতিনির্ধারণী বৈঠকে লেফটেন্যান্ট সামাদ উপস্থিত থাকতেন। ব্রিগেডিয়ার জোশী বলেছেন, দেয়ার মতো অবস্থা না থাকলেও ওকে

আমি যখন যা চেয়েছে তা দিয়েছি। কখনো বিদেশী সাংবাদিক, কখনো ভারতীয় জেনারেলদের নিয়ে ব্রিগেডিয়ার জোশী ফ্রন্টে চলে এসেছেন লেফটেন্যান্ট সামাদের ক্যাম্প নিয়ে তিনি গর্ব অনুভব করতেন। বিদেশী সাংবাদিকদের সামাদ প্রায়ই জ্যান্ত পাঞ্জাবী সৈন্য ধরে এনে হতবাক করে দিতেন। একবার সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছয় জন পাঞ্জাবী ধরে এনেছিলেন।

অস্ত্রের ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা ওহাব এখনো ভুলতে পারেন না। মর্টার শেলিং-এর কি আশ্চর্য এক কৌশল লেফটেন্যান্ট সামাদ বের করেছিলেন যে জন্যে প্রত্যেকটি শেল শত্রুর লক্ষ্য ভেদ করতো। তিনি হিসেব করেতেন তার নিজের মতো করে। আর্টিলারীর কেউ ইতিপূর্বে কোনদিন এ ধরনের লক্ষ্য ভেদ দেখেনি। প্রচণ্ড এক আস্থার জন্যেই সুবেদার ওহাব লেফটেন্যান্ট সামাদকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি। সামাদ সোজা চলে এলেন অবর্জাভেশন পোস্টে। সঙ্গে অয়ারলেস সেট। রাত তখন এগারোটার মতো। উভয়পক্ষের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। ভীষণ শব্দে এক গজ দূরে দাঁড়িয়ে কোন কথা বললেও শোনা যায় না। ব্যাংকারে বসে অয়ারলেসে অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বললেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণের জন্যে সুবেদার ওহাব বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন সামাদ নেই। দুজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি সামনে এগিয়ে গেছেন। শেষবার অয়ারলেসে লেফটেন্যান্ট আব্দুল্লাহ আর সুবেদার শামসুল হকের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পজিশন জেনেছিলেন সামাদ। গোলাগুলির মুহূর্তের বিরাম নেই। পজিশনের দিক থেকে শত্রুপক্ষ সুবিধে পাচ্ছিলো। ভূমি ওদিকে অনেক উঁচু ছিলো। অয়ারলেসের কথা বলার কিছুক্ষণ পরই অন্ধকারে একটা গুলি সামাদের মাথা ভেদ করলো। দু'পাশে দু'জন সৈন্য। মাঝখানে তিনি পড়ে গেলেন। সুবেদার ওহাব এসে দেখলেন সব শেষ হয়ে গেছে। শত্রুপক্ষের চাপ আরো বেড়েছে। কিছুটা পিছু হটে এলেন। হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠালেন, লেফটেন্যান্ট সামাদ ইজ ডেড। ব্রিগেডিয়ার জোশী অধীর আগ্রহে বসেছিনে অয়ারলেসের সামনে। বললেন, লাশ নিয়ে এসো। জবাব এলো এ মুহূর্তে লাশ আনা সম্ভব নয়। অবর্জাভেশন পোস্টেরও অনেক আগে পড়ে আছে লাশ। ব্রিগেডিয়ার জোশী বললেন, পুরো অপারেশনের মূল্যের বিনিময়ে হলেও আমি লাশ ফেরত চাই। অবশেষে লেফটেন্যান্ট সামাদের মৃতদেহ আনা হলো। ততোক্ষণে উত্তর রণাঙ্গন শান্ত হয়ে গেছে। কর্নেল সায়মন বললেন, ব্রিগেডিয়ার জোশী সে রাতে কেঁদেছিলেন।

তারপরের ঘটনা শুধু কান্নার ইতিহাস। যে শুনেছে সেই কেঁদেছে। এখনো লেফটেন্যান্ট সামাদের বন্ধু, সহযোদ্ধারা সেই যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। যদি কখনো কেউ উত্তরবঙ্গের জয়মনিরহাটে যান দেখবেন তার নাম হয়েছে সামাদনগর। কুড়িগ্রাম থেকে ঝকঝকে পাকা রাস্তা চলে গেছে ভুরুঙ্গামারি

অবধি। শত্রুবাহিনী এই অঞ্চলের ওপর কতোখানি গুরুত্ব দিয়েছিলো তার সাক্ষ্য বহন করছে দশ ফুট চওড়া নতুন সেই ঝকঝকে পাকা রাস্তা। যে বাসে করে যাবেন সেই বাসের ড্রাইভারকে আপনি যদি বলেন সামাদের কবর দেখতে যাচ্ছেন সে এক অদ্ভুত গল্প শোনাবে। বলবে এই যে আমি আজ বেঁচে আছি, গাড়ি চালাচ্ছি সবই তো ওর জন্যে। বলবে কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে সামাদ তাকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই এলাকার লোকেরা বলবে লেফটেন্যান্ট সামাদ কিভাবে দূর্ধর্ষ পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন দিলদার খাঁকে মেরেছেন। জয়মনিরহাটে এক বুড়ো আছে, তার কাছেও শুনতে পারেন সামাদের মহানুভবতার ইতিহাস। আর ভুরুঙ্গামারীতে যদি সেই লাঞ্ছিতা রমণীরা এখনো থেকে থাকেন, যাঁদের সামাদ ভুরুঙ্গামারী অপারেশনের পর মুক্ত করেছিলেন, তাঁরা আপনাকে সেই অবিস্মরণীয় মুক্তির কাহিনী শোনাবে। ঢাকা থেকে বহুদূরে জয়মনিরহাটের এক মসজিদের পাশে রয়েছে শহীদ লেফটেন্যান্ট সামাদের কবর। আমি তাঁর কবরে এখনো যাইনি। জানি না সেখানে কোন স্মৃতিফলক লেখা হয়েছে কিনা। তবে একটু জানি গ্রামের লোকেরা সেই কবরে ফুল দেয়, লোবান জ্বালায়। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এক নির্ভীক তরুণকে। যিনি যুদ্ধের জন্যে নয়, মানুষের জন্যে যুদ্ধ করেছিলেন। যিনি বলেছিলেন, যুদ্ধের শেষে আবার আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবো। আমি বিদেশে যাবো। ওদের বলবো পৃথিবীতে কোন দেশ এতো অল্প সময়ে স্বাধীন হয়নি। আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্যে কিভাবে যুদ্ধ করেছি ভবিষ্যতের স্বাধীনতাকামীরা জেনে রাখুক।

হাটখোলার দোতালা বাড়ির অসহায় বিচ্ছিন্ন মানুষদের সান্ত্বনা শুধু এইটুকু হতে পারে, তাঁদের সামাদ দেশকে আর দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন বলেই মানুষে মুক্তির জন্যে জীবন দিতে পেরেছেন। প্রতিদিনই তো মানুষের জীবনে মৃত্যু আসছে। মানুষ মরছে। তার হিসেব কেউ রাখে না। মহৎ সেই মৃত্যু যা দেশের জন্যে, দেশের মানুষের জন্যে, এবং মানুষের মুক্তির প্রতি নিবেদিত। সামাদ ভাইকে নিয়ে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় আরো অনেককে নিয়ে লেখা। আমার প্রার্থনা একজন সৎ লেখক, জাতির এই মহান বীরদের কথা সময় শেষ না হতেই লিখে রাখবেন। কারণ এর জন্যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আমাদের জবাব দিতে হবে।

১৬ই ডিসেম্বরে স্মৃতি

হুমায়ুন আজাদ

আবাল্য, যখন থেকে হাফপ্যান্ট পরে পাঠশালায় যেতে শুরু করেছি, সে নৈসর্গিককাল থেকেই আমি গৃহকাতর। পাঠশালার লম্বা বেঞ্চে বসে আদর্শলিপির বড়ো বড়ো অক্ষরের ভেতর আমি গৃহকে দেখতাম, মাস্টারসাব যখন বানান শেখাতেন, ক এবং ত যুক্ত হয়ে কি হয়, বলতেন, তখন আমার সরল অগোলকদ্বয়ের মধ্যে গৃহের চিত্র ভাসতো। অবশ্য, আমার গৃহ যে কোনটি, তা আমি তখনো স্থির করে উঠতে পারিনি, কখনো মনে হতো মায়ের বাহুই আমার গৃহ, কখনো মনে হতো আমার বিছানা আমার গৃহ, কখনো শুধুমাত্র লালনীল নকশিকাঁথাটিকেই মনে হতো আমার গৃহ। সে থেকে আমি গৃহকাতর, এবং তারপরে যখন বড়ো হতে লাগলাম, ক্লাশ ফোরে ওঠলাম, তখন আমার গৃহবোধ ভূগোলবোধের সাথে সাথে বিস্তৃত হলো স্বদেশকে মনে হলো গৃহ। এবোধ আমাকে ভয়াবহ উল্লাস ও আনন্দ দিয়েছিলো, মাতাল করেছিলো, রবীন্দ্রনাথ সদরস্ট্রিটে প্রভাত-রৌদ্র রশ্মি দেখে যে উল্লাসবোধ করেছিলেন, তা আমার উল্লাস আর আনন্দের মতো। ফোরে, ভূগোলের ক্লাশে স্বদেশের সীমা মুখস্ত বলতাম গানের মতো, কিন্তু একদিন আমার সঙ্গীত প্রচণ্ড মর্মান্তিক ধাক্কায় শিউরে উঠলো। ফোরে যখন মাস কয়েক পড়ে ফেলেছি, ভূগোলের জ্ঞান বেশ হয়েছে, তখন হঠাৎ একদিন বুঝতে পারি, পাকিস্তান বলে যেদেশকে আমি স্বদেশ ভাবি, যাকে নিয়ে আমি বিভোর হয়ে আছি, তা এক অদ্ভুত দেশ। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠেছিলো। সেদিন যখন আমি বুঝলাম, পশ্চিম পাকিস্তান আমার সজল মেঘাকান্ত দেশ থেকে বারোশ মাইল দূরে। আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিলো একথা, বার বার আমি মনে

মনে চীৎকার করেছি, না এ হতেই পারে না, হতে পারে না। পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম, আমি আমার কল্পনার শরীরে এটিই প্রথম আঘাত। এ আঘাতে আমি নতুন হলাম, মুহূর্তে আমার মনে স্বদেশের আয়তন তিন লক্ষ কতো বর্গকিলোমিটার থেকে যেনো চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইলে পরিণত হলো। সেদিনটি এবং পরের কয়েকটি দিন কাটলো আমার অস্থির শূন্যতার মধ্যে। যেনো কেউ আমার কোনো অতিপ্রয়োজনীয় অংগ কেটে নিয়েছে, যেনো কেউ আমার নাগরিকত্ব হরণ করেছে, আমাকে বিতাড়িত করেছে গৃহ থেকে বিমর্ষ হয়ে রইলাম। ক্রমে আমার কল্পনা থেকে মৃত পাতার মতো ঝরে গেলো পশ্চিম পাকিস্তান, চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইল হলো আমার স্বদেশ, ভূগোলে কল্পনায়, জাগরণে স্বপ্নে।

ক্রমে অনেকের মতো অজান্তে এবং জ্ঞাতসারে স্বদেশকে আমি নিজের জন্যে অপরিহার্য করে তুলেছি। অপরিহার্য, অবিচ্ছেদ্য, যাকে বাদ দিল আমি বাঁচতে পারি না। উনিশ শো একাত্তরের পঁচিশে মার্চ আমাকে সে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলো। আমি, সকলের মতো হয়ে উঠলাম স্বদেশে উদ্বাস্তু। কবিতায় যে চেতনাকে আধুনিক কবিরা অনেকদিন ধরে প্রকাশ করে আসছেন, আমি নিজেও অনেক সময় যে শিকড়হীনতা বোধ করেছি চেতনায়, তা দেখা দিলো বাস্তবে। স্বদেশ ব্যতীত কেউ বাঁচতে পারে না, গাছের যেমন মৃত্তিকা, মানুষের তেমন স্বদেশ। তবু সকলের স্বদেশ না হলেও চলে কেউ কেউ হতে পারেন যে কোন এলাকায় সুখী, কেউ কেউ সুখী বোধ করেন বিশ্ব নাগরিক হয়ে। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় আমি ন্যুঅর্কে গেলে বাঁচবো সাতদিন, জাপানে তিনদিন। হয়তো একদিন না আমি চিত্তে লালন করেছিলাম শিল্পকলা, আর বেছে নিয়েছিলাম এরকম এক মাধ্যমকে যা একমাত্র সার্থক হতে পারে স্বদেশে। আর কোনোখানে নয়। আমার দুঃখ আমি সদ্য যাত্রা শুরু করেছি, প্রথম পদক্ষেপই এখানে পতিত হয়নি মাটিতে, সে সময় আমি গৃহহীন হয়ে পড়লাম সাহিত্যকে কবিতাকে করে নিচ্ছিলাম আমার নিবারণের প্রাণ বায়ু, তা রচিত হচ্ছিলো বাঙলা ভাষায়। তাই আমার জন্যে স্বদেশহীনতার অর্থ হলো মৃত্যু। গ্রীস থেকে নির্বাসিত হয়ে জীবন্মৃত হয়ে পড়েছিলেন অমিত শক্তিধর লেখকেরা, প্যারিস বা লন্ডন তাঁদের বাঁচাতে পারেনি। আর সবাই কাজনজাসিক নয় যে নির্বাসিত হয়েও সাধনা করবেন স্বভাষার, তাকে অনুবাদ করবেন, করাবেন বিশ্বের ভাষায় এবং নিজেকে জীবিত রাখবে। আমি যদি চিত্রকর হতাম, রং আর তুলি যদি হতো আমার মাধ্যম, আমি যদি সুরকার হতাম, সুর হতো যদি আমার মাধ্যম, বা আমি যদি কাপড়ের কলের শ্রমিক হতাম যন্ত্র নৈপুণ্য যদি হতো আমার সহায়, তাহলে আমি বেঁচে থাকতে পারতাম পৃথিবীর যে কোন ভূভাগে। কিন্তু আমার মাধ্যম হলো বাঙলা বর্ণমালা, আমি বাঙলা স্বর আর ব্যঞ্জনধ্বনির কারুকার, তাই আমার জন্য চাই স্বদেশ, বাঙলাদেশ, চাই আমার জন্য

বাঙালিদের যাঁরা আমার শ্রমের শস্য গ্রহণ করবে। সেই আমি গৃহহীন হলাম পঁচিশে মার্চে উনিশো একাত্তুরে গৃহহীনতার অর্থই হলো আমার জন্য মৃত্যু।

তবে পঁচিশে মার্চের বহু আগে শুরু হয়েছিলো আমাদের গৃহহীন করার পালা। ইতিহাসের বদলে বর্তমান রচনায় আমি ব্যক্তিতার উপরে জোর দিচ্ছি, দেবো, তাই স্বকাহিনীই ব্যক্ত করছি। স্বদেশের 'বাঙলা', বঙ্গ পূর্ব বাংলা, বাংলাদেশ ইত্যাদি নামগুলো প্রেমিকার নামের মতো ভালো লাগতো আমার। এ নামগুলো ছাড়াতে সরকারী পূর্ব পাকিস্তান নামটিকে আমি সহ্য করতে পারিনি, ভালো লাগতো না বলেই। ১৯৬৯ সালে রচিত আমারই একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। ওই কবিতাটির একটি পঙক্তি আমার নিজের খুব ভালো লাগতো। আমার সে স্বরচিত প্রিয় পঙক্তিটি হলো, আজ রাতে সারা বঙ্গে আমি হই একমাত্র কবি। এই পঙক্তিটি নিয়ে আমি মনে মনে অনেকদিন বিভোর ছিলাম। পঙক্তিটির 'সারা বঙ্গে' কথাটিই আমাকে মাতাল করেছিলো। আমি যদিও ওর বদলে লিখতাম সারা বিশ্বে তাহলে আধুনিক কাব্যে হয়তো বক্তব্যের অর্থ সম্প্রসারিত হতো, কিন্তু আমার কাছে সারা বঙ্গ সারা বিশ্বের চেয়ে শতগুণে বৃহৎ এবং আমি এ অর্থকেই প্রবিষ্ট করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তখন বঙ্গ শব্দ অনুচার্য তাই দৈনিক পত্রিকায় এটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমি দেখতে পাই ওটি সম্পাদিত হয়ে সারা বঙ্গের স্থলে 'সারা দেশ' হয়ে গেছে। এ কবিতাটিকে তৎকালীন বেতারে পাঠ করতে গেলে আমাকে বঙ্গকে বাদ দিতে বলা হয়। এভাবে শুরু হয়েছিলো আমাদের ইহুদী করার নাট্য। বাঙালী মুসলমানেরা গৃহহীন ছিলো অনেকদিন, তাঁরা যখন ঘর বাঁধতে গেলো তখন পুনরায় শুরু হলো গৃহ ধ্বংসের অভিযান।

পঁচিশে মার্চে ঘুমাতে গিয়েছিলাম দশটার দিকে। সামান্য তন্দ্রিত হতে না হতে বাসার সামনে কোলাহল কানে এলো। উঠে গেলাম সদর রাস্তায়। সেখানে যেয়ে দেখি শ'খানেক লোক বাড়ির দেয়ালটিকে ঠেলে রাস্তায় ফেলে দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। তারাই জানালো, আজ রাত্রে আবার সান্ধ্য আইন ঘোষিত হবে, আমি রাজনীতি দুর্বল, বিস্মিত হলাম। সাতাশে মার্চ বের হলাম, একা। আমি তখনো বুঝিনি এরকম ঘটে গেছে সারাদেশে, আমার কল্পনার সর্বাংশে তা ছিলো বাইরে। আজিমপুরের চৌরাস্তার সামনে এসে আমি সর্বপ্রথম জীবনে যথার্থভাবে বুঝতে পারলাম, উদ্দেশ্যহীনতা কাকে বলে। যে যেদিকে পারছে চলে যাচ্ছে, যেনো কারো কোনো গন্তব্য নেই, শিকড় তুলে ফেলা হয়েছে নীল অরণ্যের। ওই দৃশ্য আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো বাল্যকালের দেখা একটি দৃশ্যকে। বাল্যকালে পুকুরে মাছ ধরতে দেখেছি। শ শ লোক পুকুর থেকে কচুরিপানা তুলে ফেলে সারি বেঁধে পলো হাতে নেমে যেতো পানিতে। অনেকক্ষণ তারা পলো চাপাতো পুকুরে, একবার এ প্রান্ত থেকে যেতো সে প্রান্তে আবার ফিরে আসতো, এমনি করে চলতো মাছ ধরা।

তারা যখন সবাই উঠে যেতো পুকুর থেকে, পুকুরের পানি ঘোলাটে ভারি হয়ে যেতো, আর তার মধ্যে পুকুরের এদিক সেদিকে ভাসতে থাকতো ছিন্নবিচ্ছিন্ন ময়লা কচুরিপানা। সেদৃশ্যটা আমার মধ্যে প্রবহতার উপমা হিসেবে গেঁথে আছে, আর আমি সাতাশে মার্চে ঢাকার রাজপথ দেখে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কচুরিপানার মতো দেখেছি লক্ষ লক্ষ সহোদরকে। তাদের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে রক্তপায়ী মিলিটারি ট্রাক, রাইফেল তাক করে আছে তারা, যেকোনো সময় ট্রিগার টানতে পারে। আমি কোনদিকে যাব? ন্যুমার্কেটের সামনে দিয়ে ধানমন্ডির দিকে হাঁটতে লাগলাম, সব জায়গাতে একদৃশ্য, ছিন্নবিচ্ছিন্ন কচুরিপানা। শুধু কাঁচাবাজারে চোখে পড়লো জীবনের দৃশ্য, একটি অবাঙালি তরুণী, চকচকে মসৃণ, যেনো এইমাত্র কাউকে চুমু খেয়ে এসেছে, সে বাজার করছে, তার চোখে ভয়হীন, সে কচুরিপানা নয়, সে গোলাপ। জীবনের এ মর্মান্তিক বিরোধিতা বাঙালিরা দেখেছে অনেকদিন, আর যুদ্ধের ন'মাস তারা বাস করেছে মৃত্যুকে সাথী করে।

সমগ্র যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে আমি ভয় পাই মেশিনগানকে। ওটি বাজতো ঢাকা শহরে যখন তখন, যেনো খেলনা পেয়েছে শিশুরা। বার বার নিজেকে বলতে হতো, তুমি মারা গেছো, তুমি নিহত হয়েছো, অথচ তোমাকে কেউ শহীদ বলবে না। বইগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম গ্রামে, কবিতার খাতা নেই, আমি ছন্দ ভুলে গেছি, শব্দ ভুলে গেছি, বর্ণমালা ভুলে গেছি। এটাই হলো আমার কাছে মৃত্যুর মতো, দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে তা বড়ো। কারো সাথে দেখা হয় না, কারো মুখ দেখি না, যাদের মুখ দেখি তাদের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না। পালাবো? কোথায়? মাঝে মাঝে হাতছানি দিতো মুক্তাঞ্চল, কিন্তু আমার মধ্যে সে শক্তি নেই। মাকে বলতেই তিনি অজ্ঞান হয়েছিলেন, তাঁকে আর বলা যায় না। আর আমি নিজে চির ঘরকোণো, চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের আর কোথাও যাইনি। কিন্তু বাংলাদেশে, তখন থাকার একমাত্র অর্থ ছিলো মৃত্যুকে বক্ষে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকা। উত্তেজিত হয়ে থাকাটা স্বভাবে পরিণত হলো। তীব্র উত্তেজনাবোধ করলাম সেদিনগুলোতে, উত্তেজনা, উত্তেজনা। উত্তেজনা রক্তে, মাংসে, উত্তেজনা সৎ অসৎ, উত্তেজনা বিদ্রোহী কাপুরুষিক, উত্তেজনা যৌন অযৌন, সবরকম। ঢাকা শহরকে প্রথমদিকে যেমন ঘিরে ফেলেছিলো, মিলিটারিরা, আমাকে তেমনি উত্তেজনা।

এ থেকে মুক্তি চাইতাম, অথচ আমার কিছুই করার ছিলো না। আমি বসে আছি তাদের অপেক্ষায় যারা যুদ্ধ করছে, দেশকে মুক্ত করবে, আমাকে বাঁচাবে। এরকম ছিল অনেকে, যারা প্রতিদিন স্বাধীনতার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে থাকতো। স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ, সংগীত বাঁচার প্রেরণা দিচ্ছিলো সবাইকে। সবাই জানতো, দেশ স্বাধীন হবেই। শুধু সময়ের প্রশ্ন। যদি কোনো কিশোর এসে বলতো, কালই দেশ স্বাধীন হবে তবে তাকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হতো যে তরুণীকে গ্রহণ করতে

পারিনা, যদি সে বলতো শীঘ্র দেশ স্বাধীন হবে, তবে তাকে বিবেচনা করতে ইচ্ছে হতো। আমার জন্যে স্বদেশ দরকার, যেমন দরকার আর অনেকের। দিনগুলো ভরে গিয়েছিলো যাতনায়, অন্ধ বিকলাংগ ভিক্ষুকে যেমন বেঁচে থাকে, তেমনি বেঁচেছিলাম। কিছুদিন ছিলাম এক সাথে তিন অধ্যাপক। একদিন আমাদের বাসাতেই এলো এক রিভলবারধারী পুলিশ। সব সময় এদের এড়িয়ে চলেছি, অথচ এরাই এলো বাসায়। আমার সাথী, ইংরেজির অধ্যাপক, ডক্টরেট, ইংরেজী বলতে ভুলে গিয়েছিলো ওই কালো মিশমিশে অশিক্ষিত লোকটির সামনে। সে ইংরেজি বাঙলা উর্দু মিশিয়ে আপ্রাণ বুঝাতে চাইলো, সে ভালো, সে খুব ভালো, সে মুক্তিবাহিনীর নাম কখনো শোনেনি। যারা হামলা করছে বর্ডারে, তারা হলো ইনফিলট্রেটর। এরচেয়ে মৃত্যুও অনেক কাম্য ছিলো আমাদের অথচ মৃত্যু এসে পড়লে ভয় পেতাম ভয়াবহ। আমরা যখন রিকশার চাকা ফাটার শব্দকেও মুক্তিবাহিনীর গোপন বোমা ভেবে উল্লসিত হতাম, খবরটি নানা জায়গায় বলে তৃপ্তি পেতাম, সে সময়ই আবার কাপুরুষের মর্মান্তিক অভিনয় করতে হতো। ক্রমে বেপরোয়া হয়ে উঠতে হলো। বন্ধু কবির যে বাড়ীতে থাকতে কখনো ভালোবাসে না সে এতদিন বাড়ীতে লুকিয়ে থাকতো। আবার সে বেপরোয়া হয়ে উঠলো, সন্ধ্যায় বের হতে শুরু করলো, রাত দশটায় ফিরতে শুরু করলো। সে অনেক রাতে মগবাজার থেকে ফিরে আসতো লালবাগে, মিলিটারিদের সামনে দিয়ে, মাঝে মাঝে লাথি খেতো, তবু সে তার স্বাভাবিকতাকে অটল রাখতে লাগলো। সঙ্গে আমিও। ন্যূমার্কেটে মিলিটারিদের ভেতর দিয়ে চলে যেতাম, মিরপুর দিয়ে ঘনঘন যেতাম, রাজাকারদের সাথে তর্ক করতাম। এসবই ছিলো অস্থিরতার ফল, জীবনকে শূন্য অর্থহীন করে তুলেছিলাম। প্রতারিত প্রেমিকের যেমন সবকিছু অর্থহীন মনে হয়, আমাদেরও হয়েছিলো তেমনি, প্রতারিত প্রেমিকের চোখে যেমন থাকে, যেমন নরম হয়ে থাকে, আর ভালোবাসার ভুবন, আমাদের চোখেও ছিলো তেমন স্বদেশ।

চোখে আমি কম দেখেছি মৃতদেহ, ধ্বংসাবশেষ কেননা যাইনি। বুড়িগঙ্গায় বান্ডিল করা মানুষের মৃতদেহ দেখেছিলাম, মিরপুর ব্রিজে সর্বদাই দেখতাম লাল রক্তের দাগ। যে কোনো সময় আমি নিজেও অন্য কারো সাথে বান্ডিলে পরিণত হয়ে ভাসতে পারতাম বুড়িগঙ্গা বা কালিগঙ্গার জলে, যে কোনো সময় আমারও কানে আসতো, ও বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে এক তরুণীকে, সে বাড়ী থেকে নিয়ে গেছে এক তরুণকে। আমাকে কোনদিন নেবে? কবে এসে হানা দেবে সে ফ্ল্যাটটিতে, যে ফ্ল্যাটে আজো বাস করে সে মেয়ে, যাকে নিয়ে ধ্বংস রক্ত মৃত্যুর মধ্যে ও আমি গৃহনির্মাণের স্বপ্ন দেখি? ভাবতেই, রক্ত শাদা হয়ে যেতো, যেনো আমার রক্ত নিঙড়ে সব লবণ আর লাল অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। তবু এর মাঝে বেঁচে থাকতে হলো। আসলে মানুষ জীবনকে সবচেয়ে ভালোবাসে। মুনীর চৌধুরীর

সাথে দুদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম, কয়েকদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম মোফাজ্জল হায়দার স্যারের সাথে। তাঁরা কি বেঁচে ছিলেন তখন? আমি যেনো আমার দু'জন মৃত শিক্ষকের সাথে দেখা করে এলাম, এরকম মনে হয়েছিলো বাসায় ফিরে। তাঁরা পালাতে পারলেই বেঁচে যেতেন, কিন্তু পারেননি, জীবনের মোহ তাঁদের কেটে গিয়েছিলো। জীবন হয়ে উঠেছিলো শূন্য। কিছু দৃশ্য আজ জাগছে গাছ হয়ে। মানুষগুলো যেনো কেমন হয়ে গিয়েছিলো। একটি ছেলে সে ন'মাসে রিক্সা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ গুন গুনিয়ে উঠেছিলো 'সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি' একটি চল্লিশোত্তর লোক রিকসাটাকে ডেকে থামিয়ে কান্না ভেজা স্বরে বলে 'ভাই' ও গান আর গাইবেন না। 'তার ভেতর থেকে উদ্ভিদের মতো উঠছিলো সবুজ অভিমান, ভালোবাসা। আজিমপুরের কিশোররা হঠাৎ চিৎকার করে উঠতো, 'জয় বাঙলা'। বুড়োরা খুশি হতো। স্টেডিয়ামের কাছের খদ্দরের বাজারের নাম হয়ে গেলো 'জয় বাঙলা বাজার'। তরুণ-তরুণী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সবাই ভিড় করতো সেখানে। আমি যেতাম, দুর্বল হাতে খুঁজতাম স্বাধীনতা, স্বদেশ। আমি মরে যাচ্ছিলাম, আমার মনে কোনো কবিতা নেই, স্বপ্ন নেই, এরকম বাঁচতে আমি চাইনি বাঁচা মানেই কবিতা নিয়ে বাঁচা, বাঙলা বর্ণমালা নিয়ে বাঁচা। দন্ডিত হয়ে আছি, যদি গোপনেও ওরা সংবাদ পায় আমার ভেতর বর্ণমালার গীতিকা গীত হচ্ছে, তাহলে আমি নিহত হবো ওদের হাতে। আমার ভেতর সত্যি তখন বাংলা বর্ণমালা কম্পিত হতো। অথচ আমি অনেকবার কিছু লিখতে বসেও লিখতে পারিনি, অক্ষরগুলো বেঁকে গেছে, বক্তব্য শিশুর মতো হয়ে গেছে। ব্যর্থ প্রেমিক ব্রথেলে গেলেও যেমন খোঁজে সে ছলনাময়ীর মতো মুখ, দন্ডিত হন্তা প্রেমিক দ্বীপান্তরে যেয়েও যেমন বারংবার চোখ বুলায় মায়াবিনীর ফটোগ্রাফে, আমি ও তেমন স্বদেশ চাই, নিজের বর্ণমালা চাই। স্বাধীনতা চাই। কিন্তু তখন আমি কিছু লিখতে পারিনি। স্বাধীনতার পরেও আমি এমন কিছু লেখিনি কিন্তু তখন আমার নিকট লেখার অধিকার আর বাঁচা সমার্থক ছিলো।

ডিসেম্বর তিন তারিখের রাতে প্রথম বিমান আগমনের ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। আকাশে আগুনের শিখা, ওই শিখার মধ্যে জীবন আবার জ্বলে উঠলো। যুদ্ধ বাঁধলে স্বাধীনতা আসবে আধ মাসে, একথা সবাই জানতো। ভোরে উঠে, ছাদে গিয়ে প্রথম মিগ বিমান আকাশকে নদীতে পরিণত করেছে। স্বাধীনতা এসে গেছে, ভাবছি সবাই। ছ'তারিখে আমি সাভারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবনে ফিরে এলাম ঢাকা থেকে। আসার পথে মিরপুর। মোহাম্মদপুরে একটি ভারতীয় বিমান ভুপাতিত হয়েছিলো। দেখলাম সেটাকে ঘিরে অবাঙালিদের কি আনন্দ। অথচ ওটির জন্যে আমাদের মনে বেদনা। মিগের আকাশ পর্যটক শিল্পের চরম নিদর্শন মনে হলো আমার। মিগ কি বিমান? না সে কোনো পারিজাতভুখ পাখি? স্পেনডারের বিমান

অবরোহনের চমৎকার বর্ণনা আছে, মোর সফটার দ্যান দি মথ। ওটি হলো যাত্রীবাহী বিমানের কথা। মিগ ওড়ে স্বপ্নের মতো, স্বাধীনতার মতো, স্বদেশের মতো। ঢাকায় বিমান এলেই সাভারে বসে তার শব্দ পেতাম, বিমান আসতো বিরতি পড়লে খারাপ লাগতো। এবার যুদ্ধে একটি কথা আমার মনে হয়েছে, বিমান ভ্রমণের জন্যে ট্রেঞ্চে কাটার কোনো দরকার নেই, বিমান এলে ছাদে ওঠো, দেখো বিমান আসছে, উড়ছে, শত্রুর নগর পুড়ছে। বাসভবনের ছাদে বসে দেখেছি, বিমান এসে, বোমা ফেললে বিমান ঘাঁটির পর, তারপর উড়ে চললো উত্তরে, পুণরায় ছোঁ মেরে বোমা ফেলে দিলো ঢাকার বহু উত্তরের গোলাবারুদের কারখানায়, তারপর আবার এলো ঢাকায়। আমাদের সামনেই ছিলো বেতারের সম্প্রচারণ কেন্দ্র। সেখানে বোমা ফেলেছে বিমানগুলো, বাধাহীন। বাসভবন ত্যাগের কথা ভাবলাম, কেননা সাভারে যুদ্ধ হবে, এপথে আসবে মুক্তিমৈত্রীবাহিনী, যুদ্ধ হবেই। ছেড়ে দিলাম বাসা, মাইল দুই দূরের এক কৃষকের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। তখন সবাই অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর। এবং মনে ভয় যুদ্ধের। চৌদ্দ তারিখ ভোরে জেগে উঠলাম ভয়াবহ মর্টারের শব্দে। সবাই ভয়ে কাতর। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দলে দলে লোক যেতে লাগলো রাস্তার দিকে। কেন না, সেখানে মিত্রবাহিনী এসে গেছে, পাকিস্তানীবাহিনী সরে গেছে ঢাকাতে। যুদ্ধের ভয়ের চিহ্ন মুছে গেলো সকলের মুখ থেকে। সাভার মুক্ত হলো, স্বাধীন হলাম। ঢাকা তখনো শত্রুকবলিত। কিন্তু তা সবাই বুঝে গেছে। ষোল তারিখের সন্ধ্যায় ইন্দিরার ভাষণ শুনে লাফিয়ে উঠলাম। ফিরে এসেছে আমার স্বাধীনতা, স্বদেশ, বর্ণমালা, কবিতা। সে সময় আমার মনে সাড়ে সাতকোটি মানুষের মুখাবয়ব ভেসে উঠলো, যেনো আমি সকলকে চিনি, সকলের নাম জানি, যেনো সকলের গ্রামে আমি গিয়েছি, যেনো এর নাম করিম আলি, বাড়ি বিক্রমপুরে, ওর নাম আনোয়ার থাকতো কাউনিয়ায় বরিশাল শহরে। পরেরদিন, সতেরো তারিখে, মিত্রবাহিনীর এক ট্রাকে চেপে তাই আসতেই হলো ঢাকা শহরে ওকে দেখা চাই, কেননা ও সকলের প্রেম, আর ওই সবচেয়ে ধর্ষিতা।

এবোটাবাদ থেকে দেবীগড়

লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস আবু তাহের

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সাল। কোয়েটা ইনফেন্ট্রি স্কুলে সিনিয়র টেকটিক্যাল কোর্স করছি। সারাক্ষণ অনেক ব্যস্ততায় কাটে। এই ব্যস্ততার মাঝেও মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হতো। আমরা সবাই ভাবতাম পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন আসবে। বেশীর ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসাররা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস্ পার্টিকে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক দল বলে মনে করতো এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের পাওয়ার পক্ষপাতি ছিল। কিছুসংখ্যক অফিসাররা ভাবতো কোন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতা দেওয়া উচিৎ নয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একাত্মতা বজায় রাখার জন্য মার্শাল ল চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। অল্প কিছুসংখ্যক অফিসাররা মনে করতো পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন। এইসব আলাপ আলোচনা নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের মধ্যে প্রায়ই অনেক কথা কাটাকাটি ও মনমালিন্যের সৃষ্টি হতো। যে সময় পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালীদের মনে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিপুল উদ্দিপনার সৃষ্টি হয় এবং আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম যে যতই গণ্ডগোল হোক না কেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবেই। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রার্থীদের সম্বন্ধে আমরা সবাই ও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকেই একটি উচ্চ ধারণা পোষণ করতো। সবাই ভাবতো এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ ও প্রবীণ সামরিক কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই জনপ্রতিনিধিগণ

পাকিস্তানে সুষ্ঠু গণতন্ত্র স্থাপনে সক্ষম হবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন আসবে। সামরিক বাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং এই ক্ষেত্রে আমরা একটি বড় রকমের রদবদল আশা করেছিলাম। একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনা আমরা কোনদিনই আশা করিনি। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আমরা ভেবেছিলাম একটি আপোস মিমাংসা হবেই এবং শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন।

২৬ তারিখ সন্ধ্যায় রেডিয়োতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা শোনার পর সর্বপ্রথম আমি জানতে পারি বাংলাদেশে কি বিভীষিকা নেমে এসেছে। অল ইন্ডিয়া রেডিও ও বিবিসির খবর শুনে বাংলাদেশের ঘটনাবলী আরো জানতে পারলাম। সারারাত কোয়েটার নির্জন রাস্তায় পায়চারী করে কাটলো। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা আমি দেখতে পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালাবার সংকল্প নিলাম। পরদিন বাঙালী অনেক অফিসারের সঙ্গে দেখা হলো। তারা কেবল নিঃসহায়ভাবে দেখাতে লাগলো আমরা যে এই গণযুদ্ধে অংশ নিতে পারি, তারা কেউ একথা চিন্তা করতেও সাহস পেল না। অপরপক্ষে বাঙালী সৈনিক যারা ছিল তারা একটা কিছু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং অফিসারদের কাছ থেকে নেতৃত্বের আশা করতে লাগলো। গুটিকয়েক তরুণ অফিসার ছাড়া বাকি সবাই ভীত ও ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং তারা এমন কোন কাজ করতে এবং ভাবতেও চাইতো না, যাতে করে পাকিস্তানীরা তাদের উপর কোন সন্দেহ করতে পারে। যখন আমি বাঙালী অফিসারদেরকে পালিয়ে, বিপ্লবে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব করলাম তখন তাদের মধ্যে কয়েকজন এমনও বলে বসলেন যেন আমি কোয়েটা থেকে না পালাই, তাহলে তারা বিপদে পড়তে পারেন। শিক্ষিত উচ্চপদস্থ বাঙালীরা, বাঙালী জনগণের আন্দোলনে যে কতটুকু বিস্ময়কারী অপ্রয়োজনীয় অংশ তা আমি সেদিন বুঝতে পারি। তাই বারশত বাঙালী অফিসারদের মধ্যে মাত্র ১৩জন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। চেষ্টা ও দৃঢ় সংকল্প থাকলে এদের বেশীরভাগই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারতো। অপরপক্ষে সৈনিকদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৩০শে মার্চ আমাদের কোর্স অসমাপ্ত অবস্থায় শেষ করে দেয়া হয়। এর মধ্যে কোয়েটা থেকে একটি ডিভিশন ও খারিয়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে আরো একটি ডিভিশন হাওয়াই জাহাজে করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। বাংলাদেশে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, তা আমরা সবাই ভালোভাবে বুঝতে পারি। পয়লা এপ্রিল

আমরা নিজ নিজ ইউনিটে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় স্কুল কমান্ডেন্ট মেজর জেনারেল বি এম মোস্তফা আমাকে ডেকে পাঠান। আমার বিরুদ্ধে সরকারী নীতি ও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগ আনা হয় এবং আমাকে কোয়েটা ছেড়ে না যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সিনিয়র টেকটিক্যাল কোর্সের অফিসাররা কোয়েটার বিরাট চিলতান হোটেলে থাকতো। সবাই নিজ নিজ ইউনিটে চলে গেছে – আমি একা সেখানে রয়ে গেলাম। সারাদিন বিভিন্ন দেশের রেডিও শুনে আর অনিশ্চয়তার মাঝে সময় কাটে। সারাদিন কেবল ভাবি কোন পথে পালিয়ে যাওয়া যায়। সে সময় পর্যন্ত আমার মনে সংশয় ছিলো ভারতবর্ষ আমাদের এই সশস্ত্র বিপ্লবে কতটুকু সাহায্য করবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সশস্ত্র বিপ্লবে কতটুকু সাহায্য না থাকায় আমার এই সংশয় জাগে। আফগানিস্তান সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না যে আফগান সরকার আমাকে বাংলাদেশে যেতে কতটুকু সাহায্য করবে।

পয়লা এপ্রিল থেকে সামিরক ইনটেইলজেন্স ব্রাঞ্চের বেশ কয়েকজন লোক আমার পেছনে লেগে থাকতো। তাদেরকে এড়িয়ে আফগানিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অনেক বিপদজনক ছিলো। ৭ই এপ্রিল আমাকে খারিয়া ক্যান্টনমেন্টে পাঠানো হয়। দুজন অফিসার আমাকে লাহোরের পথে কোয়েটা এয়ারপোর্টে হাওয়াই জাহাজে তুলে দিয়ে আসলো।

কোয়েটা এয়ারপোর্টে প্রত্যেক যাত্রীকে বেশ করে তল্লাশী করা হলো। হাওয়াই জাহাজকে ছিনতাই হতে বাঁচাবার ব্যবস্থা। হাওয়াই জাহাজে মাত্র আমরা কয়েকজন যাত্রী। আমি একা বসে আছি। একজন বাঙালী স্টুয়ার্ট এসে আমার পাশে বসলেন। দেশের অনেক কথা হলো এবং হাওয়াই জাহাজটি ছিনতাই করার সম্ভাবনা নিয়েও আলাপ হলো। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, তার কাছে কোন অস্ত্র নেই, কাজেই কিছু করা যাচ্ছে না। তাকে আমি বললাম, কিচেন থেকে দুটো ছুরি নিয়ে আসতে এবং সেগুলো দিয়ে আমরা ককপিটে ঢুকে পাইলটকে জাহাজটি ভারতে নিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারবো। ভদ্রলোক আমার কথায় রাজী হলেন, কিন্তু এরপর আর আমার কাছে ফিরে এলেন না। আমরা খারিয়া পৌঁছলাম। এর মধ্যে আমার ইউনিট দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন আটক কোর্ট থেকে বাংলাদেশে চলে গেছে। খারিয়াতে আমাকে একটি আর্টিলারী রেজিমেন্টের সঙ্গে সাময়িকভাবে রাখা হলো। সেখান থেকে বেশ কিছুসংখ্যক বাঙালী অফিসার নিয়ে পালাবার পরিকল্পনা নিলাম, কিন্তু এখানেও আমাকে নিরাশ হতে হলো। বাঙালী অফিসাররা ড্রয়িং রুম বসে অনেক কথাই বলতো এবং দেশপ্রেম দেখাতো, কিন্তু যখনই কিছু করার প্রশ্ন উঠতো, তাদের উৎসাহ ও সাহস শেষ হয়ে যেতো। এর মধ্যে একদিন ইপিআর এ কার্যরত ক্যাপ্টেন দেলোয়ার খারিয়াতে এসে হাজির হলো। ২৫শে মার্চ

রাতে ঢাকায় তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং আমি যে আর্টিলারী রেজিমেন্টে ছিলাম সেখানে তাকে পাঠানো হয়। দেলোয়ারের কাছ থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা আরো জানতে পারলাম। দেলোয়ার আমার সঙ্গে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে রাজি হলো। অনেক করে বুঝিয়ে আমরা ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীকে আমাদের সঙ্গে আসতে রাজী করালাম। কোন রাস্তায় পালানো যায় সেই চিন্তাই আমরা ৩ জন সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম। দেলোয়ার ও পাটোয়ারী অবিবাহিত কাজেই সে ব্যাপারে তাদের কোনো ভাবনা ছিল না। আমার স্ত্রী সে সময় ময়মনসিংহ ছিলেন এবং আমরা জানতাম আমি পালিয়ে আসলেই পাকিস্তানীরা তাকে ধরে নিয়ে যাবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অফিসারদের পালানোর প্রধান বাধা ছিল দুটি। আমরা জানতাম ধরা পড়লেই বিচারের অপেক্ষা না রেখে আমাদেরকে হত্যা করা হবে এবং দ্বিতীয়তঃ পালিয়ে আসলে বাংলাদেশে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর নেমে আসবে সামরিক বাহিনীর বর্বর নির্যাতন। পালাবার চেষ্টা নেবার আগে মনের দিক থেকে এই দুই বাধাকে অস্বীকার করার মনোবলের প্রয়োজন ছিলো।

সে সময় খারিয়াতে আমাদের কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের রেডিও শোনা আর বসে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা। সাধারণতঃ পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারেরা আমাদের সাথে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা করতো না। অল্প কিছুসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসার বাংলাদেশের ঘটনাবলীর জন্য অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতেন ও আমাদেরকে কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ করে থাকার উপদেশ দিতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণ কোন সময়ই বাঙালীদের উপর কোন বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেনি। সকলের ধারণা ছিল সহসাই একটা আপোস মিমাংসা হবে। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আমাকে এবোটাবাদ বেলুচ রেজিমেন্টাল সেন্টারে বদলী করা হয়। আমি ঠিক করে নিলাম খারিয়া থেকে এবোটাবাদ যাওয়ার পথেই পালাতে হবে। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ও ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী রাওয়ালপিন্ডি বেড়াতে যাওয়ার বাহানা করে কয়েকদিনের ছুটি নিল। আমরা ঠিক করলাম আজাদ কাশ্মীর হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে আমরা ভারতে পৌছবো। এর মধ্যে আমার বড় ভাই আরিফুর রহমান যিনি প্লানিং ডিভিশনে ছিলেন এবং ইসলামাবাদে থাকতেন। সীমান্ত এলাকার পাঠানদের কাছ থেকে ৩টি রিভলবার কিনে আমাদের দেন। ২৯শে এপ্রিল বিকাল, আমরা ৩জন সঙ্গে বেশ কিছু খাবার ও পানি নিয়ে বাসে চড়ে মঙ্গলা বাঁধের পাশে আজাদ কাশ্মীরের ছোট্ট শহর মীরপুরে এসে পৌছি। সেখানে একজন বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার থাকতেন আমরা ঠিক করেছিলাম বিকালটা তার বাড়ীতে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর শহর ছেড়ে পাহাড়ের পথ ধরে সীমান্ত অতিক্রম করবো। মীরপুর থেকে সীমান্ত প্রায় ৩০ মাইল দূরে। বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী পৌছে দেখি দরজা জানালা বন্ধ, তিনি সপরিবারে

রাওয়ালপিন্ডি বেড়াতে চলে গেছেন যদিও তার সঙ্গে আমাদের আগেই কথা হয়েছিল। উপায়ন্তর না দেখে বিকালটা তার বারান্দায় বসেই কাটালাম। সন্ধ্যার পর তার বাড়ী থেকে বের হয়ে শহর ছাড়বো কিন্তু কেউ এগিয়ে যেতে সাহস করছে না। একটি অপরিচিত শহর ছেড়ে বস্তি এলাকার মাঝখান দিয়ে কারও সন্দেহের কারণ না হয়ে চলে যাওয়া যে কত বিপদজনক, সেদিন আমরা বুঝতে পারি। রাত ৮টায় আমরা পায়ে হেঁটে শহর ছেড়ে এক পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। সেখান থেকে দিক নির্ণয় করে আমরা চলতে শুরু করলাম। ঘন্টা দুই চলার পর আমরা বেশ হাঁপিয়ে উঠলাম। পাথরের উপর দিয়ে উঁচু নীচু পথ চলা অত্যন্ত কষ্টকর এবং আমরা ভেবে দেখলাম এভাবে চলতে গেলে নিরাপদ স্থানে রাতারাতী পৌছানো সম্ভব হবে না। নির্জন অন্ধকার রাত। কোন জনপ্রাণীর সাড়া শব্দও নেই। আমরা ঠিক করলাম পাহাড় ছেড়ে রাস্তা ধরেই এগিয়ে যাব। রাস্তা ধরে চলতে শুরু করার একটু পরেই রাস্তার পাশে একটি সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম। পাটোয়ারী ও দেলোয়ারকে রাস্তার ঝোপের পাশে বসিয়ে রেখে আমি সাইনবোর্ডটি পড়ে দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম। এ বোর্ডটি ছিল রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত একটি সাপ্লাই ইউনিটের দিক নির্দেশক বোর্ড। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার এর মধ্যেই আমার পিছু পিছু এসে বোর্ডটি দেখলো এবং পেছনের দিকে চলতে শুরু করলো। এই সাপ্লাই ইউনিটটি সীমান্তে অবস্থিত ঘাঁটিগুলোতে খাদ্য ও সরঞ্জাম সরবরাহের কাজে নিযুক্ত ছিল। পেছনে ফিরে এসে দেলোয়ার ও পাটোয়ারীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম এবং তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা এপথে এগুতে রাজী হলো না। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে যাওয়াও তারা বিপদজনক বলে মনে করলো। বাধ্য হয়েই আমাদের আবার মীরপুর শহরে ফিরে আসতে হলো। ভাগ্যক্রমে একটি বাস পেয়ে গেলাম এবং তাতে চড়ে লাহোর-পিন্ডি গ্র্যান্ড ট্যাংক রোডে পৌছলাম। সেখান থেকে আমি এবোটাবাদের পথে ইসলামাবাদ চলে এলাম। ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী ও দেলোয়ার খারিয়া ক্যান্টনমেন্ট চলে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালাবার প্রথম চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হলো। যদি সেদিন সাহস করে আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম তবে সীমান্ত অতিক্রম নিশ্চয়ই সম্ভব হতো।

এবোটাবাদ পৌছে ব্যর্থতায় সারামন ভরে উঠলো। এবোটাবাদের পাশেই পাহাড়ের গায়ে কাকুল সামরিক একাডেমী। একশত জনের উপর বাঙালী ক্যাডেট তখন সেখানে ছিল। বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালী অফিসার একাডেমীতে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছিলো। সে সময়টাতে ৫ জন বাঙালী ক্যাডেট একাডেমী থেকে পালিয়ে যায় এবং এই নিয়ে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এবোটাবাদেও বেশ কিছুসংখ্যক বাঙালী অফিসার ছিলো। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করতো কিন্তু যখনই পালিয়ে যাওয়ার কথা উঠতো তখনই তারা নানা অজুহাত

দেখিয়ে সরে পড়তো। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ও ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী আবার আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং পালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে সময় আমাদের গতিবিধির উপর এত কড়া নজরদারি রাখা হতো না। এবং আমরা ছুটি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে আসার অনুমতি আমাদের দেয়া হতো না। প্রতি রোববারে আমি এবোটাবাদ থেকে পিন্ডি যেতাম। খারিয়া থেকে ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী ও দেলোয়ারও প্রায়ই সেখানে আসতো। সেখানে ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের ভাই সাত্তার সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সাত্তার সাহেব প্লানিং ডিভিশনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে পালিয়ে আসতে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং সে জন্যে তার স্ত্রীকে বিদেশিনী হওয়াতে তাকে পাঠানো সম্ভবপর হয়। মেজর জিয়াউদ্দিন (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এং সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্তকৃত) সে সময় রাওয়ালপিন্ডি জেনারেল হেডকোয়ার্টারে চাকুরী করতো। একদিন কথায় কথায় সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং আমরা তাকে আমাদের দলে টেনে নেই। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা আর কোনো অফিসারকে আমাদের সাথে পালাতে রাজী করাতে পারলাম না।

এবার আমরা ঠিক করলাম শিয়ালকোটের পথে সীমান্ত অতিক্রম করবো। মেজর জিয়াউদ্দিন জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে একটি ম্যাপ জোগাড় করলো। সীমান্তের রাস্তা দিয়ে আমরা ৫ জন বাঙালী যদি বাসে চড়ে যাই, তাতে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে ভেবে আমরা সবাই মিলে একটি পুরোনো ভোক্সওয়াগান গাড়ী কিনে ফেললাম। দিক নির্ণয়ের জন্য একটি জাপানী খেলনা কম্পাস কেনা হলো। আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি ঠিক হয়ে এলো।

ইতিমধ্যে বেলুচ রেজিমেন্টাল সেন্টার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ওসমান আমার স্ত্রীকে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলো। নানা অজুহাত দেখিয়ে আমি তা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। জুলাই মাসের মাঝামাঝি জেনারেল ইয়াহিয়া, জেনারেল হামিদ এবং আরো বেশ কিছু সংখ্যক জেনারেল কাকুল মিলিটারী একাডেমীতে বেশ কিছুদিনের জন্য এসে থাকে। এ সময় গুজব রটে শেখ মুজিবুর রহমানকে আলোচনার জন্য এবোটাবাদ আনা হয়েছে। নিক্সনের উপদেষ্টা কিসিঞ্জারের সঙ্গে নাথিয়াগলিতে শেখ মুজিব ও ড: কামাল হোসেনের আলোচনা হয়েছে বলেও একটা গুজব আমরা শুনতে পাই। এই সময় আমি সর্বপ্রথম বাড়ী থেকে চিঠি পেলাম। ২৫শে মার্চের পর এই প্রথম চিঠি। যদিও চিঠিতে বিস্তারিত কিছুই লিখা ছিল না, জানতে পারি, আমার মেয়ে জয়া ৬ই এপ্রিল বিপ্লবের মাঝে ভূমিষ্ট হয়েছে। নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমার স্ত্রী গ্রামের বাড়ীতে দিন কাটাচ্ছে। এই খবর শুনে একটা দুর্বলতা আমাকে পেয়ে বসে যা

কাটিয়ে উঠতে আমার আরোও কয়েকদিন সময় লাগে। আরো জানতে পারি আমার ছোট ভাইরা সবাই বাড়ীতে এবং আমাদের গ্রামে এখনও পাকস্তানী সৈন্যের আগমন ঘটেনি। আমার ভাইদের এবং আরো কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময থেকেই আমি গেরিলা যুদ্ধ ও বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছিলাম। এই সব বিষয়ের উপর বিভিন্ন সামরিক প্যামপ্লেটও আমি তাদের দিয়েছিলাম। ২৫শে মার্চের আগে ঢাকায় কয়েক হাজার মলোটভ ককটেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড তৈরী করে এরা বিভিন্ন দলকে দেয়। বাড়ী থেকে চিঠি পাওয়ার পর আমি তাদেরকে লিখে জানাই, ময়মনসিংহ জেলার মোহনগঞ্জের ভাটি এলাকায় চলে যাওয়ার জন্য।

২২শে জুলাই আমি পিন্ডি থেকে একটি টেলিফোন কল পাই। টেলিফোনধারী নিজের পরিচয় না দিয়ে আমাকে ব্রিগেডিয়ার খলিলের সঙ্গে দেখা করার কথা বলে টেলিফোন বন্ধ করে দেয়। জুলাই মাস শেষ হওয়ার আগেই আমাদের পালাতে হবে এই পরিকল্পনাই আমরা নিয়েছিলাম। ২৩শে জুলাই আমার স্ত্রী বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে আসছে বলে আমি ব্রিগেডিয়ার ওসমানকে জানাই। ব্রিগেডিয়ার ওসমান খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠে এবং করাচী যেয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য ১০ দিনের ছুটি দেয়। এই ১০ দিনের মধ্যেই আমাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে পালাতে হবে। ২৩ তারিখ দুপুর এবোটাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে বিকেলে পিন্ডি পৌছি। ২৪ তারিখে ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের পিন্ডি পৌছার কথা। ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী ইতিমধ্যেই খারিয়া থেকে বদলী হয়ে ঝিলাম চলে এসেছে। আমরা ঠিক করলাম পাটোয়ারীকে শিয়ালকোট যাওয়ার পথে তুলে নেয়া যাবে। ২৪ তারিখ ভোরে ক্যাপ্টেন দেলোয়ার আমাদের টেলিফোনে জানালো সে এবং সাত্তার সাহেব আমাদের সাথে যাচ্ছে না। ভাবলাম বোধ হয় ভয় পেয়েছে, তাই মত পাল্টিয়েছে। সেদিন বিকেলে আমি এবং জিয়াউদ্দিন ব্রিগেডিয়ার খলিলের বাড়ী যাই। ব্রিগেডিয়ার খলিলের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম যে এক পাঠান ন্যাপ কর্মীর সহায়তায় তোরখান সীমান্ত দিয়ে কাবুল পৌছানো যেতে পারে। কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে সাত্তার সাহেবের পরিচিত এক ভদ্রলোক রয়েছেন, যার সহায়তায় ভারতে পৌছানো সম্ভব। সাত্তার সাহেব ও ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় কাবুল রওয়ানা হচ্ছে। এ কথা শুনে মেজর জিয়াউদ্দিন খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো এবং তাদের সঙ্গে যাওয়া সমীচীন মনে করলো। একজন পাঠানকে বিশ্বাস করতে আমার মন সায় দিলো না, তাই আমি আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিয়ালকোটের পথে সীমান্ত অতিক্রম করা যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মনে করলাম। ব্রিগেডিয়ার খলিলকে বললাম যদি শিয়ালকোটের পথে পালিয়ে যেতে আমরা ব্যর্থ হই তবে কাবুলের পথে আবার নতুন করে চেষ্টা শুরু করবো।

ব্রিগেডিয়ার খলিল সাহেবের বাড়ী থেকে এসে আমরা কিছুক্ষণ পিন্ডি ক্লাবে কাটালাম। এরপর আমরা চলে যাই পিন্ডি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। বেশ রাত হয়ে গেছে, হঠাৎ দেখী ক্যাপ্টেন দেলোয়ার আমাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির। সে বললো সাত্তার সাহেব আমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন। সাত্তার সাহেবের সঙ্গে আমাদের অনেক আলোচনা হলো। তিনি বললেন, কাবুলে নিরাপদে পৌছতে পারলে তিনি আমাদের খবর পাঠাবেন। যেন আমরা সেই পাঠানের সঙ্গে কাবুলে পৌছতে পারি। বাঙালী বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে এই ভদ্রলোকের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রবল স্পৃহা এবং দেশপ্রেম অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। রাত দুটোয় তাদেরকে শুভ কামনা জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

জিয়াউদ্দিনের ঘরে গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন মুজিব ঘুমিয়ে আছে। সে উইক এন্ড কাটাতে এবোটাবাদ থেকে পিন্ডি এসেছে। তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানী ঘেঁষা কার্যকলাপোর জন্য তাকে আমরা বিশ্বাস করতাম না এবং এ সময় তার উপস্থিতিতে আমরা অত্যন্ত বিরক্তবোধ করি কিন্তু কিছু বলারও উপায় ছিল না। ২৫শে জুলাই ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আস্তে আস্তে জিয়াউদ্দিনকে জাগালাম। সামান্য কিছু জিনিসপত্র আর রিভলবার গুলি নিয়ে ক্যাপ্টেন মুজিবকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে বেরিয়ে পড়লাম। সদ্য কেনা পুরোনো ফোক্সওয়াগানটি বেশ ভালই চলছিলো। গুজরানওয়ালার কাছাকাছি এসে আমরা কিছুক্ষণের জন্য থেমে রাস্তার পাশের দোকানে চা খেলাম। পরিচিত কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় সে জন্য একটি গল্পও তৈরী করে রাখতে হলো। জিয়াউদ্দিন যাচ্ছে লাহোরে ১০ দিনের ছুটি কাটাতে, আমি যাচ্ছি লাহোর থেকে পিআইএর নাইট কোচ ধরে করাচী থেকে স্ত্রীকে আনার জন্য। সকাল ৯টার মধ্যেই ঝিলাম পৌছে গেলাম। ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীর ঘরে পৌছে দেখি রোববার বলে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারসহ তারা গল্প করছে। তাকে আমাদের নতুন কেনা গাড়ীতে নিয়ে বেড়াবো বলে, সেখান থেকে উঠিয়ে আনলাম। আমরা এই সপ্তাহে পালাবো বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু কোনদিন যাবো তা পাটোয়ারীকে জানাতে পারিনি, তাই তাকে এক কাপড়ে আমাদের সাথে উঠে আসতে হলো, গাড়ীতে বসে যখন তাকে সব জানালাম সে বললো ব্যাংকে তার কয়েক হাজার টাকা রয়ে গেছে এবং তা তুলে নেয়া প্রয়োজন, কিন্তু রোববার বলে ব্যাংক বন্ধ এবং সেখানে আরো একদিন দেরী করা নিরাপদ মনে করলাম না। অবশ্য সে সময় টাকার প্রয়োজনীয়তাও আমরা বিশেষ মনে করিনি। বেলা একটার সময় আমরা শিয়ালকোট সীমান্ত রাস্তায় পৌছলাম। সেখানে গাড়ী ছেড়ে ৯ মাইল পায়ে হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে। ভাবলাম দিনের বেলা জায়গাটা একটু দেখে নেয়া যাক। সেই এলাকায় সে সময় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি ব্যাটেলিয়ন ও একটি আর্টিলারী রেজিমেন্ট সীমান্ত

রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। রাতের অন্ধকারে এই প্রতিরক্ষা ব্যূহের মাঝখান দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবো বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সন্ধ্যা হওয়ার এখনও কয়েক ঘন্টা বাকি। শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্ট কাছেই। মেজর মঞ্জুর সে সময় শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্টে থাকতো। ভাবলাম দিনটা মেজর মঞ্জুরের বাড়ীতে কাটানো যাক। সীমান্ত রাস্তাটি দেখা শেষ করে বেলা আড়াইটার সময় আমরা মেজর মঞ্জুরের বাড়ীতে পৌঁছলাম। মঞ্জুরের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। শেষ পর্যন্ত আমাদের পালাবার পরিকল্পনা তাকে বললাম এবং তাকেও আমাদের সঙ্গী হতে অনুরোধ জানালাম। মঞ্জুরের স্ত্রী, তিন বৎসরের একটি মেয়ে ও কয়েক মাসের একটি ছেলে নিয়ে সে সময় তার সাথেই ছিলো। এ অবস্থায় পালানো, মঞ্জুর বিপদজনক মনে করলো, এবং আমাদের সাথে যেতে রাজী হলো না। কিন্তু মঞ্জুরের স্ত্রী আমাদের সাথে আসার জন্য জেদ ধরে বসলো। এ সময় মঞ্জুর আমাদেরকে বললো আমাদের পরিকল্পিত রাস্তায় না যেয়ে শিয়ালকোট-জাফরওয়াল রাস্তা দিয়ে গেলে সীমান্ত অতিক্রম করা আরো সহজ হবে এবং সে এলাকার একটি ম্যাপ এনে আমাদের দেখালো। শিয়ালকোট-জাফরওয়াল সীমান্ত রাস্তার এক জায়গায় ভারত সীমান্ত খুবই নিকটে এবং সে স্থান দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম সহজ হবে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মঞ্জুর এখনো মন স্থির করতে পারছে না। মঞ্জুরের স্ত্রী যদি পীড়াপীড়ি না করতো এবং সাহস না দেখাতো তা হলে তারা কোনদিনই আমাদের সাথে আসতে পারতো না। রাত সাড়ে আটটা তখনও মঞ্জুর যাবে কি যাবে না তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বললাম আমাদের সময় নষ্ট করে লাভ নেই এবং আলোচনারও আর প্রয়োজন নেই। ৯টার মধ্যেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি সবাই কিছু খেয়ে নিলো। এরপর বিপদ হলো মঞ্জুরের ব্যাটম্যান আলমগীর খানকে নিয়ে। আলমগীর খান বাঙালী তখন পর্যন্ত তাকে কিছুই বলা হয়নি। বললে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে, সে সম্বন্ধে মঞ্জুরের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো, কিন্তু না বলেও উপায় নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে নিলো। ছুটিতে বাড়ী এসে বিয়ে করবে বলে ভাবি বধুর জন্য সে বেশ কয়েকটি শাড়ী কিনেছিলো। তাই গুছিয়ে নিলো আর সঙ্গে নিল একটি বড় ছুরি।

রাত পৌনে ৯টায় কোন রকমে চাপাচাপি করে আমরা গাড়ীতে বসে রওয়ানা হলাম। চলার পূর্বে মিসেস মঞ্জুর বাচ্চা দুটোকে শান্ত রাখার জন্য স্লিপিং পিল খাইয়ে দিলেন। মিসেস মঞ্জুর একটি বোরকা পরে নিলেন, যাতে করে কারো সন্দেহের উদ্রেক না হয়। শিয়ালকোট থেকে জাফরওয়ালের পথে চলছি। রাতটি ছিল ভীষণ অন্ধকার, অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছে। পালাবার জন্য এক উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্ট পার হবার পরই একটি এমপি চেকপোষ্ট আমাদের

অতিক্রম করতে হবে। আমরা ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন সেখানকারই বাসিন্দা, জাফরওয়াল বেড়াতে যাচ্ছি। সাধারণ বেশ কয়েকটি পাঞ্জাবী শব্দও রপ্ত করে নিয়েছিলাম, যেন কারও সন্দেহের উদ্রেক না হয়। ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে চেকপোষ্টের মিলিটারী পুলিশ বাইরে না দাঁড়িয়ে চেকপোষ্টের ভেতরে বসে ছিল ও আমাদের গাড়ী চেক করার জন্য দাঁড় করালো না। শিয়ালকোট-জাফরওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় রাত পৌনে দশটায় পৌছে গেলাম। গাড়ী দাঁড়ালো, কিন্তু কেউ নামছেন না। পেছনে তাকিয়ে মনে হলো যেন একটা গাড়ী আসছে। তাড়াতাড়ি সবাই গাড়ী থেকে নেমে মাঠের পথে ভারত সীমান্তের দিকে চলতে শুরু করলাম। শিয়ালকোট জায়গাটি অত্যন্ত নীচু। ভাল ধান জন্মে বলে এই জায়গার খ্যাতি আছে। মাঠ তাই কর্দমাক্ত। ১০-১৫ গজ চলার পর আমরা রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম। জাপানী খেলনা কম্পাসটি সেদিন আমাদের বেশ কাজে আসে। সোজা উত্তর দিকে দুমাইল গেলে আমরা সীমান্ত অতিক্রম করবো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দিক নির্ণয়ের জন্য ধ্রুবতারাটিও আকাশে দেখা যাচ্ছে না। এক হাতে কম্পাস এবং অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি কিছুক্ষণ চলার পর মিসেস মঞ্জুরের একটি ক্যানভাসের জুতো যে কাদার ভেতর ঢুকলো তা আর বেরিয়ে এলো না। খালি পায়ে হাঁটা সেখানে অত্যন্ত কষ্টকর। ভদ্রমহিলাকে আমাদের কাঁধে ভর করতে হলো। পাকিস্তানী দুটি সীমান্ত ঘাঁটির মাঝামাঝি রাস্তা দিয়ে আমরা সীমান্ত অতিক্রমের পথ বেছে নিয়েছিলাম। ঘন্টাখানেক চলার পর আমি নিশ্চিত হলাম, আমরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছি। মেজর মঞ্জুর বিভিন্ন কাজে এই সীমান্তে পূর্বে কয়েকবার এসেছিলো। সে বলতে লাগলো আমাদের আরোও ডান দিকে যেতে হবে এবং আমরা এখনও সীমান্ত অতিক্রম করিনি। তার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই আমরা ডান দিকে চলতে শুরু করলাম। প্রায় এক ঘন্টা চলার পর হঠাৎ করে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের সামনেই একটি সীমান্ত ঘাঁটি। সবাইকে ঝোঁপের আড়ালে বসিয়ে রেখে আমি এগিয়ে গেলাম। একটি সীমান্ত খুঁটি ছিল পাকিস্তানী সীমান্ত ঘাঁটি। নিঃশব্দে ফিরে এলাম। সবাইকে নিয়ে আস্তে আস্তে আবার ভারতের দিকে চলতে শুরু করলাম। আমরা এবার ঠিক করে নিয়েছি ভারতের বেশ কয়েক মাইল ভেতরে চলে যেতে হবে। যে কোন মুহূর্তে সীমান্ত টহলদার বাহিনী সামনে পড়তে পারে। সে অঞ্চলের গ্রামবাসীরা ক্ষেতের কাজের জন্য মাঠের মধ্যেই ছোট ছোট ঘর বানিয়ে থাকতো। তাদের সামনে পড়াও বিচিত্র ছিল না। এ সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের ছিল, কিন্তু ভয় ছিল কেবল মিসেস মঞ্জুর আর তার বাচ্চাদের জন্য। রাত দুটোর সময় একটা শুকনো খালের পাড়ে আমরা উপস্থিত হলাম। খালের ভেতর বসে টর্চ জ্বালিয়ে আবার ম্যাপটি ভাল করে দেখা হলো। এবার আমরা ভুল করিনি। সীমান্ত থেকে ৩ মাইল ভেতরে আমরা চলে এসেছি। কয়েক শত গজ দূরেই ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটি দেবীগড়। মিসেস মঞ্জুর আর বাচ্চাদের

একটি গাছের নীচে শুইয়ে দিয়ে ভোরের প্রত্যাশায় আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

* সাত্তার সাহেব ও ক্যাপ্টেন দেলোয়ার আফগান সীমান্ত অতিক্রম করতে যেয়ে পাকিস্তান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। গত জানুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন দেলোয়ার জেল থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসতে সমর্থ হয়।
** সিপাহী আলমগীর খান এখনও কর্নেল মঞ্জুরের সঙ্গেই আছে। বহুদিন আগে কেনা বিয়ের শাড়ীগুলো নিয়ে শুনেছি এ মাসে সে বিয়ে করতে বাড়ী গেছে।

সম্মুখ সমরে বাঙালী

মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী

প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট আকবর একদা বাংলায় এক ক্ষুদ্র দুর্বিনীত ভূস্বামীর ঔদ্ধত্য দমন করার জন্যে তাঁর দরবারের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রাজা মানসিংহকে পাঠিয়েছিলেন এই বাংলাদেশে। গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষকদের নিয়ে গঠিত বারো ভুঁইয়ার অন্যতম বীর ঈশা খাঁর দূর্ধর্ষ বাহিনীর হাতে পরাজয় ঘটেছিলো রাজা মানসিংহের মুঘল বাহিনীর। ইতিহাসে বাংলার সেই বীর সেনানীদের কথা খুব সামান্যই লেখা আছে। তবে কিংবদন্তী হয়ে আজো সেই কাহিনী সজীব হয়ে আছে। ছোট ছোট নৌযানে ঈশা খাঁর সেই ক্ষুদ্র অথচ সংগঠিত বাহিনী কিভাবে বিশাল মুঘল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিলো ইতিহাসে তার অংশ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। রাজা মানসিংহ বাংলা জয়ের আশা পরিত্যাগ করে তাঁর অপরাজেয় বাহিনীর সঙ্গে পরাজয়ের কালিমা নিয়ে দিল্লীর দরবারে গিয়ে বলেছিলেন, বাংলাকে কোনদিন সামরিক বাহিনী দিয়ে জয় করা সম্ভব হবে না। বাংলাকে জয় করতে হবে ভালবাসা দিয়ে।

প্রথমবারের মতো পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারির ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলার সাধারণ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পেল। কিন্তু ভাগ্যের ফের। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে বাংলা সম্বন্ধে রাজা মানসিংহের সেই ঐতিহাসিক উপলব্ধি যা সম্রাট আকবর বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতো সমানভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই উপলব্ধি ব্ল্যাক ডগ মাতাল অতিরিক্ত উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উষ্ণ স্নায়ুতে উর্বর বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ইয়াহিয়া ইতিহাস থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নেবার অবসর পেল না – সম্ভবতঃ

ব্লু-ব্লাডের গরিমায় গর্বিত আর বহুল প্রচারিত আমদানীকৃত প্রবাদ 'বাঙালীরা যোদ্ধা নয়' একে বেদবাক্য রূপে গ্রহণ করায় ইয়াহিয়া তার আত্মম্ভরিতার জন্য প্রচণ্ডভাবে আক্কেল সেলামী দিল। মূঢ় ইয়াহিয়া ভুলে গিয়েছিল যে, শুধুমাত্র বাংলার মাটিতেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্ম হয়। যেমন করে জন্ম নিয়েছিল তোপের মুখে উড়ে যাওয়া শহীদ তিতুমীর আর ফাঁসির মঞ্চে ঝুলন্ত অমর সূর্যসেন। এ বাঙালীরা ধুঁকে ধুঁকে মরে না, মরে মাঠে ময়দানে। পৌরুষের ব্যঞ্জনা এদের প্রতি অঙ্গে। এরা জাগ্রত জনতার মূর্ত প্রতীক। অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের আশার আলো 'পরশুরামের কুঠার'।

এবারের মুক্তি সংগ্রামে শত্রুর সাথে মুখোমুখি লড়াই শুরু করি আগস্ট '৭১-এর পর থেকে। এর আগে আমরা ছিলাম ডিফেন্সে আর শত্রুরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করে আর আমরা আক্রমণকারীর। আমাদের ব্রিগেডের (জেড ফোর্স) প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন মেজর (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) মুঈনুল হুসেন চৌধুরী (১ম ইস্ট বেঙ্গল)। ডেলটা কোম্পানী নিয়ে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মোমতাজ ও ব্রেভো কোম্পানী নিয়ে ক্যাপ্টেন হাফিজ এ আক্রমণের ব্যূহ রচনা করেন। আর ক্যাপ্টেন মাহবুব (যিনি পরে সিলেট রণাঙ্গনে শহীদ হন) কাট অফ পার্টি নিয়ে ওঁত পেতে বসেন শত্রু ডিফেন্সের পেছনে। আক্রমণ করাকালীন একটি বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, তা হলো – সিংহ হৃদয়। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'লায়ন হার্ট'। ডিফেন্সে যারা থাকে তারা বাংকারে থাকে; ফলে স্বভাবতই ছোট ছোট হাতিয়ার এমনকি ডাইরেক্ট আর্টিলারী শেল থেকে রেহাই পায়। সে জন্যই সাধারণতঃ দেখা যায় যে একটি ডিফেন্সকে আর্টিলারী থেকে শুরু করে ট্যাংক ও বিমান হামলা করে সেই ডিফেন্সটিকে তছনছ করে ফেলার পরেও মাত্র দু-একজন সাহসী যোদ্ধা অকুতোভয় মনোবলে বলীয়ান হয়ে বাংকার থেকে সেই প্রচন্ড গোলাগুলির মাঝে মাথা নীচু করে মুখ থুবড়ে পড়ে না থেকে আক্রমণকারীর উপর পালটা গুলিবর্ষণ করে পায়ে পায়ে এগুয়ে আসা আক্রমণকারীর আক্রমণ সপূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেয়। তার প্রধান কারণই হচ্ছে আক্রমণকারীরা এসেম্বলী এরিয়া পর্যন্ত লুকিয়ে আসে কিন্তু এফইউপি-এর পর থেকে সোজা দাঁড়িয়ে সংগীন উঁচু করে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। এই এফইউপি (ফর্ম আপ সেন্স) সাধারণতঃ লক্ষ্যস্থল (টারগেট) থেকে পাঁচশ থেকে হাজার গজ দূরে হয়ে থাকে। পদাতিক বাহিনী এই দূরত্ব তিন মিনিটে একশ গজ এই হিসাবে অতিক্রম করে, ফলে বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত শত্রুর ছোট ছোট হাতিয়ার থেকে শুরু করে মাটিতে পোতা মাইন আর পিছন থেকে নিক্ষিপ্ত আর্টিলারী ফায়ার এমনকি ট্যাংক ও বিমান হামলা সবকিছুর টারগেট হয়ে ও পায়ে পায়ে এগুতো থাকে। তাই বুঝি বলা হয়, যে সৈন্যদল কমান্ডারের আদেশে আক্রমণ করতে যেতে পারে সে সৈন্যদল কমান্ডারের

হুকুমে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস রাখে। আর সাহস রাখে বলেই যুদ্ধের ময়দানে আক্রমণকারী সৈন্যদল হলো সকলের নমস্য। লাল, নীল আর সবুজ রঙের বাহার সে সালামকে ভূষিত করা যায় না। সে সালাম রক্তাক্ত দেহের রঞ্জিত হস্তের সংগ্রামী সালাম। শহীদের রক্তের মতই শাশ্বত অমর সে সালাম। অন্যদিকে ডেলিবারেট ডিফেন্স পজিশান আক্রমণ করাতে ঝুঁকি আরও অনেক বেশী (বিশেষতঃ বর্তমান যুগে) কারণ শত্রু শুধুমাত্র সকল প্রকার আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতিতে বলীয়ান নয় বরং সকল প্রকার আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। সে জন্যই সাধারণতঃ একটি লোক ডিফেন্স-এ থাকলে তিনটি লোক তাকে আক্রমণ করতে যেতে হয় এবং তিনটি লোক আক্রমণ করলেই যে আক্রমণ সার্থক হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, যে লোকটি ডিফেন্সে থাকে তার মনোবল ভেঙ্গে না পড়লে একের উপর তিন-এর এ আনুপাতিক আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিকের অভাবে এ অনুপাত আমরা কোনদিনই রক্ষা করতে পারিনি। ফলে অধিকাংশ সময় যেখানে কোম্পানী ডিফেন্সে থাকলে ব্যাটেলিয়ন এ্যাটাক করা উচিত ছিল সেখানে কোম্পানীর উপর কোম্পানী এ্যাটাক করেছে। সকল প্রকার সুষ্ঠু আক্রমণই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি পূর্বাহ্নে পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয়। আর সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন কমান্ডার নিজে চুপি চুপি শত্রু শিবির দেখে আসে – মিলিটারী ভাষায় এই চুপি চুপি দেখে আসার নাম হচ্ছে 'রেকি পেট্রোলিং' অর্থাৎ গা ঢাকা দিয়ে শত্রুর বাংকার থেকে শুরু করে রসদপত্র আনা নেয়ার রাস্তা, হাতিয়ারের ক্ষমতা ও অবস্থা এবং শক্তি বৃদ্ধির মতো এই সকল কিছু জানলে আক্রমণের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা যায়। অবশ্য প্রায় প্রত্যেক লড়াইতে দেখা যায় সাধারণতঃ কমান্ডার নিজ প্রাণের মায়ায় চুপি চুপি শত্রুর শিবির দেখা হতে বিরত থাকে। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ ছিলেন এক অদ্ভুতপূর্ব ব্যতিক্রম, অনন্য সাধারণ সৈনিক। পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পালিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন – যোগ দেওয়ার পর থেকে শত্রুর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। ময়মনসিংহের কামালপুর বিওপি ছিল শত্রুদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি কারণ জল ও স্থল উভয় পথেই জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা সড়কের প্রবেশ দ্বার ছিল এ কামালপুর। তাই শত্রুরা এইখানে বাংকারগুলো অত্যন্ত মজবুত করে তৈয়ার করে – বাংকারের প্রথম আস্তরে মাটি ও টিনের দেয়াল তারপর ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফুট ব্যবধানে রেলের লোহার বীম। এই একই প্রকার ব্যবধানে পাকা সিমেন্টের আস্তর। বাংকারের ওভার হেড কাভারের বেলায়ও একই প্রকার প্রস্তুতি নেয়া হতো – প্রত্যেকটি বাংকারই প্রায় ঘরের মত উঁচু অন্যদিকে সমস্ত ডিফেন্স টানেলের মারফত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল; এদিকে মাইন বুবি ট্রেপ ও

বাঁশের কঞ্চি সমস্ত ডিফেন্সটিকে দূর্ভেদ্য দূর্গের মত করে রেখেছিল। পর পর দুদিন রেকি করার পরেও সালাহউদ্দিন স্বচক্ষে শত্রু শিবির দেখার জন্য লেফটেন্যান্ট মান্নানকে সাথে করে তৃতীয়বারের মত রেকি পেট্রোলিং নিয়ে নিজে শত্রুর শিবিরের দিকে গেলেন। বিওপির কাছে পৌছে জমির আইলের উপর লেফটেন্যান্ট মান্নান, সুবেদার হাসিম, নায়েক সফি ও দলের অন্যান্য সবাইকে রেখে শুধু সুবেদার হাইকে সঙ্গে করে শত্রুর বাংকারগুলো রেকি করতে গেলেন। বলা বাহুল্য পাকিস্তানীরা রাত্রিতে সব সময় সেকেন্ড লাইন ডিফেন্সে চলে যেত। কামালপুর রণাঙ্গণে শত্রুরা সাধারণতঃ দিনের বেলায় অনেক এলাকা জুড়ে ডিফেন্স নিয়ে থাকত কিন্তু রাত্রিবেলায় দূরের বাংকারগুলো ছেড়ে দিয়ে ছোট অথচ ঘন ডিফেন্সে চলে যেতো। খালি বাংকারগুলি দেখে সালাউদ্দিন ও হাই আরও ভিতরে চলে গেলেন। এমতাবস্থায় দুজন শত্রু সেনা সম্ভবতঃ পেট্রোলিং করে ফিরে আসার সময় এদের দু'জনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। একশ পাঁচ পাউন্ড ওজন আর ৫ -৫ উচ্চতা বিশিষ্ট ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছয় ফুট লম্বা খাঁন সেনার উপর যার হাতে .৩০৩ রাইফেল ছিল। অন্ধকারে খানসেনা ভ্যাঁবাচ্যাকা খেয়ে 'সানু খালেদ হুঁ' (আমি খালে;) বলে নিজেকে সঙ্গীন কবল থেকে ছাড়াতে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারল যে, আসলে তারা মুক্তিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সালাউদ্দিন 'মান্নান' বলে চিৎকার করে উঠলেন, মান্নান ছুটে এলো। স্টেন ধরে জিজ্ঞাস করলো উপরে কে? সালাউদ্দিন গোংগানীর স্বরে বললো 'উপরেই তো ঐ শালা'। লেফটেন্যান্ট মান্নান গাব গাছের নীচে তাড়াতাড়ি পজিশন নিলেন। এদিকে সুবেদার হাইকে হেন্ডস আপ বলার সাথে সাথে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে খানসেনারা জি থ্রি রাইফেল কেড়ে নিলেন, কিন্তু খানসেনা মুহূর্তের মধ্যে পেছনের বাংকারে ঢুকে পড়লো। আর নায়েক শফি যে এতক্ষণ ইতস্ততঃ করছিল গুলি করবে কি করবে না (কেন না ঘুটঘুটে অন্ধকারে কার গায়ে গুলি লাগে বলা মুশকিল) মুহূর্তের মধ্যে ধাবমান শত্রুর দিকে গুলি ছুড়ল অবশ্য গুলি হাই ও খানসেনার মাঝখান দিয়ে চলে যায় এদিকে শত্রু বাংকার থেকে গুলি ছুঁড়ল কিন্তু সম্ভবতঃ অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি বলে বাঁ পাশের দালানে গিয়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হাই বাংকার লক্ষ্য করে স্টেনের এক ম্যাগাজিন গুলি ছুড়ল – গুলি ছুড়ে জিথ্রি রাইফেলসহ ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের দিকে এগিয়ে এলো। গাব গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় মান্নান আস্তে জিজ্ঞেস করলো কে? ত্বরিত বেগে আমি হাই বলে সালাউদ্দিনের উপরে অবস্থানরত খানসেনাকে স্টেনের বেরেল দিয়ে গুতা দিল। উপরের লোকটি সালাউদ্দিনকে ফেলে দৌড়াতে শুরু করলো। সুবেদার হাই ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। অতঃপর রাইফেল দুটি নিয়ে ওরা তড়িৎ বেগে শত্রু শিবির ত্যাগ করে। কিন্তু ধস্তাধস্তির সময় পড়ে যাওয়া সালাউদ্দিনের ব্যায়নেটটি শত্রু শিবির অঞ্চলে রয়ে যায়। এদিকে রাইফেল চেক

করে দেখা গেল যদিও জিগ্রির চেম্বারে গুলি ছিল না কিন্তু ৩০৩ রাইফেলের চেম্বারে গুলি ভরা ছিল। সালাউদ্দিন হেসে বললো 'শালার বেটা ভড়কে না গেলে আমাকে ইজিলি মারতে পারতো'।

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসে সালাউদ্দিনের সাহস গেল আরও বেড়ে। এ রেকী পেট্রোলিং থেকে দুটি জিনিস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তা হলো সুবেদার হাই ও ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের অদম্য সাহস ও অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। কিন্তু এতে আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তা প্রকাশ পায় যে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ আসন্ন ফলে রাতারাতি শত্রুরা তাদের সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে ফেললো, তাতে করে কামালপুরে পাকবাহিনীর ৩১ বেলুচ ব্যাটালিয়নের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো দুই কোম্পানী (রাজাকার ছাড়া)। দুদিন পর ৩০-৩১শে জুলাই প্রথম ইস্ট বেঙ্গল (সিনিয়র টাইগার) রাতের আঁধারে রওনা হলো। প্রথমে সালাউদ্দিনের ডেলটা কোম্পানী ফলোআপ কোম্পানী হলো ক্যাপ্টেন হাফিজের ব্রেভো, যার পিছে হলো ব্যাটালিয়ন আর গ্রুপ এবং এই আর গ্রুপে ছিলেন মেজর (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) মঈন এবং উনার সাথে ছিলেন কর্নেল জিয়াউর রহমান। সম্ভবতঃ ব্রিগেডের প্রথম এটাক সরেজমিনে তদারক করার জন্য কর্নেল জিয়া নিজেও এ্যাটাকিং ট্রুপসের সাথে রওনা হন। আক্রমণের এইচ আওয়ার ছিল ৩০/৩১শে জুলাই এর রাত ৩.৩০ মিনিট। কিন্তু গাইডের অভাবে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল এফইউপি-তে সময় মত পৌঁছাতে পারেনি, ফলে ৩.৫০ মিনিট সময় টাইম প্রোগ্রাম মোতাবেক আমাদের নিজস্ব আর্টিলারী ফায়ার যখন শুরু হয় (ফায়ারের সংকেত ধ্বনি ছিল হিস করে ওয়ারলেসের উপর শব্দ করা) তখনও আমাদের ছেলেরা এফইউপি-তে পৌঁছার জন্য প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে। কাদামাটিতে এতগুলো লোকের এই দৌড়াদৌড়ির ফলে যথেষ্ট শব্দ হয় তাতে করে দুশমনের পক্ষে আক্রমণের ডাইরেকশন নির্ধারণ করা একেবারে সহজ হয়। এবং নিমেষের মধ্যে তাদের আর্টিলারী ফায়ার এসে পড়তে থাকে। এদিকে প্লাটুন পর্যায়ে ডেপথ (টু আপ) হওয়ার ফলে লোক আগে পিছে হয়ে যায় ফলে কমান্ডও কন্ট্রোল করা ভয়ানক মুশকিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এসেম্বলী এরিয়া থেকে পূর্ব নির্ধারিত এফইউপি-তে আসার মাঝ পথে আমাদের নিজস্ব আর্টিলারী ফায়ার শুরু হওয়াতে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই কোনক্রমে ফর্ম আপ হতে থাকে ফলে সে কি চিৎকার আর হট্টগোল। আবার ডাইরেকশানের অভাবে এডভান্স করাকালীন একে অন্যের উপর চড়ে বসে। আর অপেক্ষাকৃত নীচু কর্দমাক্ত জমির উপর আসার সাথে সাথে পাকিস্তানী ও আমাদের যুগ্ম আর্টিলারীর ক্রস ফায়ারিং এর নীচে আসার ফলে আমাদের বেশ কিছু ছেলে হতাহত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অয়্যারলেস সেট জ্যাম হওয়াতে সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় তাতে বিশৃংখলা চরমে পৌঁছায়। অবস্থা

দেখে মনে হচ্ছিল হাটবাজার বসেছে আর নীলকর আদায়কারী উট সাহেবদের দেখে কে কোথায় পালাবে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এ অবস্থায় প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে আক্রমণের ব্যূহ রচনা করা আদৌও সম্ভব ছিল না। বরং সৈন্য দলের পক্ষে পালিয়ে আসাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কারণ এটাকিং ট্রুপস যদি ঠিকমত ফর্ম আপ না হতে পারে তবে তাদের পক্ষে আক্রমণ করার প্রশ্নই ওঠে না। ৬৫ সনের যুদ্ধে বাকী সেক্টরে বিআরবির ওপরে ভারতের এক ডিভিশন সৈন্য যখন ফর্ম আপ হচ্ছিল তদানীন্তন পাকিস্তানী তিনটি মাত্র ট্যাংক আচম্বিতে সে সৈন্যদলের উপর হামলা চালায় ফলে ভারতীয় সৈন্যদল পালিয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে এ ঘটনা অহরহ ঘটেছে এবং ঘটবে। এদিকে কর্নেল জিয়াউর রহমান বাঘের মত গর্জে উঠলেন, 'কাম অন, এট এনি কস্ট উই উইল লাঞ্চ দি এ্যাটাক' মেজর (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) অয়্যারলেস ছেড়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছিলেন। আর ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও হাফিজ একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদিকে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল প্রসিডিউরের চামড়া পর্যন্ত তুলে ফেলছে, অন্যদিকে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মেগাফোনে বাংলা-ইংরেজী-উর্দুতে মিশিয়ে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল তার সৈন্যদলকে কারোও বা কলার ধরে লাইন সোজা করে আগের দিকে (টারগেট মুখী) মুখ করে দিচ্ছে আর কাউকে বা হাফিজ স্টেনের বাট দিয়ে মারছে। মোগল রাজপুতের প্রথম যুদ্ধে আশিটি যুদ্ধ বিজয়ী রানা সংগ্রাম সিংহের বিপুল রণভিজ্ঞ সৈন্য বাহিনীকে দেখে আকারে ছোট মোঘল বাহিনী ভড়কে গিয়েছিল যুদ্ধের প্রারম্ভেই কিন্তু ভেলকিবাজীর মত বাবর সে সৈন্য বাহিনীকে বাগে এনে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন তাই সামরিক নেতা হিসেবে ইতিহাসে বাবরের স্থান অতি উঁচুতে। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও হাফিজের কৃতিত্ব বুঝি সেখানেই। চরম বিশৃংখলার মাঝে শুধুমাত্র মনের জোর ও অদম্য সাহসে বলীয়ান হয়ে সালাউদ্দিন ও হাফিজ সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজ নিজ কোম্পানীকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত করতে সক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আক্রমণ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। যুদ্ধের ময়দানে ফলাফলটা সকল সময় সবকিছুর পরিমাণ নয়, বরং ঘটনাটি কিভাবে ঘটিত হলো সেটাই সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় মহাসমরে মন্টোগোমারীর কাছে রোমেল চরমভাবে মার খেলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, মাইলের পর মাইল পশ্চাদপসরণ অভিযান অব্যাহত রাখতে হয়েছে রোমেলকে সাহারার দুস্তর মরু পথে পথে। অথচ মন্টোগোমারীর বিজয়াভিযানের চেয়ে রোমেলের সেই পশ্চাদাভিযানই সকলের মনে অনুপ্রেরণা জোগায় তাই বুঝি রোমেল শুধুমাত্র রোমেলই। এফইউপি-র চরম বিশৃংখলা থেকে সামান্য রেহাই পেয়ে প্রথম প্রথম ইস্ট বেঙ্গল সবেমাত্র অগ্রসর

হয়েছে অমনি পাকিস্তানী আর্টিলারীর সেলভো ফায়ার এসে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হতোদ্যম সৈন্যরা মাটিতে শুয়ে পড়লো শেষ মুহূর্তে বুঝি আর আক্রমণ করা সম্ভব হলো না দেখে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। একদিকে সমগ্র বাঙালী জাতির মানইজ্জতের প্রশ্ন অন্যদিকে দু'শ ছেলের জীবন। সালাউদ্দিন তখন ক্ষ্যাপা দুর্বাসা ছিন্নমস্তক চন্ডী-রনদা সর্বনাশী, 'জাহান্নামের আগুনে বসে হাসছে পুষ্পের হাসি। মারছে লাথির পর লাথি। কারো বা কলার চেপে ধরে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল বেশরম বেগায়রত, শালা নিমক হারামির দল আগে বাড়' আবার সৈন্যদলের মন চাঙ্গা করার জন্য নিজের অবস্থান জাহির হয়ে যাবে জেনেও পাকবাহিনী লক্ষ্য করে মেগাফোনে উর্দুতে বলছিল, 'আভিতক ওয়াকত হ্যায়, শালালোক সারান্ডার করো, নেহীত জিন্দা নেহি ছোড়েঙ্গা।' তারপরের ইতিহাস প্রতিটি বাঙালীর গৌরবের ইতিহাস। বাঙালী সৈন্যরা তখন ছুটছে 'ঝড়ের মতন করতালি দিয়া স্বর্গ মর্ত্য করতলে' বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মত প্রথম ইস্ট বেঙ্গল মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে দিল পাক বাহিনীর ডিফেন্সের প্রথম সারি বাংকারগুলো। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত গুরু গর্জন করে সিনিয়ার টাইগার (প্রথম ইস্ট বেঙ্গল) জয় বাংলা আর আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তুলল যুদ্ধের ময়দানকে। বাংকার অতিক্রম করে বিশ পঁচিশটা ছেলে কমিডিনিটি সেন্টারে ঢুকে পড়লো। যাদের ভিতর মাত্র দু'একজন আহত অবস্থায় ফেরৎ আসতে পেরেছিল আর বাকী সবাই হাতাহাতি যুদ্ধে শাহাদাৎবরণ করেন। প্রচণ্ডভাবে তখন হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। বাঘের থাবাতে যত্রতত্র ভূপাতিত পাক সৈন্যরা পিছনে তখন আমাদের পরে লাশ আসা শুরু হয়ে গেছে। কর্নেল জিয়া তখন বলছেন, 'আই উইল একসেপ্ট নাইনটি ফাইফ পারসেন্ট কেজুয়েলটি – [...]'। আহত ক্ষত-বিক্ষত জওয়ানরা বলছে, 'স্যার নিয়ে এলেন কেন? আর সামান্য বাকী – কি হত আমি না হয় মরে যেতাম' গর্বে বুক ফুলে উঠছিল। পিছনের উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকেরাও বুঝতে পারছিলেন বাঙালীরা শুধু বসে বসে (এমন কি না খেয়ে) কবিতা লিখে কিংবা গাল-গল্প করে আর শ্লোগান দিয়ে ভাবালুতার মাঝে দিন কাটায় না, যুদ্ধও করতে জানে বৈ কি। আজকে শুধু আফসোস হচ্ছে যে আজকের পেপার টাইগাররা যদি সেদিন যুদ্ধের ময়দানে থাকতেন তবে সম্ভবতঃ আজ আর তারা আমাদেরকে খোদার খাসী বলার দুঃসাহস প্রকাশ করতে না। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের গায়ে তখনও রিলিফের সেই সাদা সার্টটা ছিল। মহানগরীর নিউ মার্কেটে গিয়ে মার্কেটিং করার অবসর তার ছিল না, না ছিল সঙ্গতি কিংবা তেমন নীচ মনোবৃত্তি। তবে হাঁ বন্য পশুদের মত আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছি। তাই বুঝি লুঙ্গি মালকোচা বেঁধে সিভিল সার্ভিস অফিসার তৌফিক এলাহি (বর্তমানে টাঙ্গাইলের ডিসি) যশোহর রণাঙ্গনকে কাঁপিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন – কথার ফুলকী দিয়ে নয় জীবন টোটার রহস্য জানতে গিয়ে

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরে। তাই বলছি হে মহাত্মন, রক্তের ওজন নাও শরীরের ওজন নাও খোদার খাসী কে ওজন মাপার যন্ত্র নির্ভুল বলে দেবে।

এদিকে মাইন ফিল্ডে ফেঁসে যাওয়া সুবেদার হাই-এর প্লাটুনের ডানে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন বুঝতে পারলেন যে শত্রুরা মাইন ফিল্ডের পেছনের বাংকারগুলো ছেড়ে দিয়ে আরও পেছনে সেকেন্ড লাইনে সরে গিয়ে কাউন্টার এর্টাকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ম্যাগাফোনে হাইকে বললেন হাই প্লাটুন নিয়ে ডানে যাও। প্রথম আক্রমণ শুরুকালে সুবেদার হাই-এর লোকসংখ্যা ছিল ৪০ জন কিন্তু লক্ষ্যে পৌছা পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়াল ১৫ হতে ২০ জনে। এদিকে মাইনের আঘাতে নায়েক সফির হাত উড়ে গেল আর ধাবমান শত্রুদের পিছু নেওয়ারকালে জোয়ানরা বারবার সালাউদ্দিনকে অনুরোধ করলো। 'স্যার পজিশনে যান' (মাটিতে শুয়ে পড়া)। সালাউদ্দিন ধমকে উঠলো বেটা স্যার স্যার করে চিৎকার করিস না। শত্রুরা আমার অবস্থান টের পেয়ে যাবে চিন্তা করিস না তুই বেটা আমার কাছে এসে দাঁড়া গুলি লাগবে না ইয়াহিয়া খান আজও আমার জন্য গুলি বানাতে পারেনি'। দু'দিকে বৃষ্টির মত গুলির মাঝে দাঁড়িয়ে একথা বলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তাই বুঝি আজও ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের প্রাণপ্রিয় সালাউদ্দিনকে। দ্বিতীয়বার ম্যাগাফোনে হাই বলার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের সামনে ২/৩টি বোমা এসে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে সালাউদ্দিন ধরাশায়ী হলেন। তার দেহটা প্রথমে বামে পরে আধা ডানে ও শেষে দড়াম করে পেছনের দিকে পড়ে গেল। আশপাশের জোয়ানরা ছুটে আসে স্যার কলেমা পড়েন। কিন্তু বাংলার একান্ত গৌরব সালাউদ্দিন উত্তর দিল আমার কলেমা পড়ার দরকার নেই। খোদার কছম যে পেছনে হটবি তাকে গুলি করবো। তারপর বিড় বিড় করে আবার বলে উঠলো মারতে হয় এদেরকে মেরে মর বাংলাদেশের মাটিতে মর। এমন মরণ দুনিয়ার ইতিহাসে যে বিরল তা নয় তবে এ মৃত্যুতে আনন্দ আছে গর্ব আছে। যা সহজে করা যায় না। উঁচু মাটির ঢিবিতে পড়ে থাকা সালাউদ্দিনের লাশটাকে ২/৩ জন জোয়ান শত্রুর এলাকা থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করলো কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সকলেই মৃত্যুবরণ করে। পরিশেষে একটি বিহারী ছেলে আটটি গুলি খেয়েও শেষবারের মত চেষ্টা করে নিজে গুরুতরভাবে আহত হয়ে লাশটি আনতে ব্যর্থ হয়। সালাউদ্দিনের গায়ে তখনও সেই সাদা সার্টটি ছিল যা তার খুলে ফেলার কথা ছিল কারণ সাদা সার্ট রাত্রি বেলায় বেশী দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের ঘড়ি, স্টেন ও অন্যান্য কাগজ নিয়ে আসা হয় ওদিকে ক্যাপ্টেন হাফিজ বেঁচে গেলেন অলৌকিকভাবে হাতের স্টেন তোপের মুখে উড়ে গেলেও সামান্য আহত হয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বেঁচে গেলেন। কিন্তু ৬০০ গজ পিছনে এক ইউপি তত্ত্বাবধানে কর্মরত লেফটেন্যান্ট মান্নান উরুতে গুলি

খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন যদিও বা একই জায়গায় একইভাবে ফ্লাইং অফিসার লিয়াকতও শুয়েছিলেন। অন্যদিকে আহত ক্যাপ্টেন হাফিজের অয়ারলেস সেট নিরাপদ জায়গায় রেখে পুনরায় হাফিজকে উদ্ধারকল্পে লেন্স নায়েক রবিউল ছুটলো শত্রু অভিমুখে। কয়েক কদম যাওয়ার পর দুই হাতেই গুলি এসে লাগল তথাপি তার প্রাণপ্রিয় তথা বাংলাদেশের অমূল্য রত্ন ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধার করার সংকল্প থেকে এতটুকু টলাতে পারেনি। যথাস্থানে পৌঁছে দেখে হাফিজকে অন্য কেউ নিয়ে গেছে। পড়ে থাকা ওয়ারলেস ও রকেট লাঞ্চার উঠাবার সময় লেফটেন্যান্ট নায়েক রবিউলের বুকে গুলি লাগল। রবিউল মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মুখ থেকে রক্ত পড়তে লাগল। পাশের জোয়ান সাহায্যের ভয়ে পাশ কেটে চলে গেল। রাগে দুঃখে রবিউল গ্রেনেডটা হাতে নিয়ে (উদ্দেশ্য বন্দী হবে না) জীবনের আশা ত্যাগ করে নিকটবর্তী ইক্ষু ক্ষেতের দিকে দিল ভোঁ দৌড়। বৃষ্টির মত শত্রুর গুলি আসছিল। কিন্তু আশ্চর্য রবিউলের গায়ে লাগল না। কোন মতে টেনে হেচড়ে ইক্ষু ক্ষেতে গিয়ে পৌছালেই রবিউলের প্রতীতি জন্মালো সে সহজে মরছে না। আর অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে বাঁচতে পারছে। বাঁ হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ডান হাতের হাড়টি বের হয়ে আছে। নাকে মুখে রক্তের ছাপ – এ অবস্থায় পালিয়ে যেতে দেখে এগিয়ে এসেছিল গ্রামের গৃহবধুরা যদিও গৃহস্বামীরা দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিল। নিজের সাথী যখন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল তখন সে আর কারো সাহায্য প্রত্যাশী নয়। তাই গৃহবধুদের হাত ছাড়িয়ে সে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলো কিন্তু পরের ইতিহাস আজও তার কাছে ঝাপসা হয়ে আছে। তার বিশ্বাস দুই রমণীর কাঁধে ভর দিয়ে সে এফইউপির এরিয়া পর্যন্ত পৌছায়। এদিকে সালাউদ্দিনের মৃত্যুর পর আমাদের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে ও সেই ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ছোট ছোট গ্রুপে ওরা শত্রুর বাংকারগুলির উপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। বেলা তখন ৭টা বাজে অযথা লোকক্ষয় না করে উইথড্রল করা শ্রেয় জেনে ও মেজর (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) মুঈন তার সৈন্যদলকে কিছুতেই পশ্চাদাপসরণ করতে পারছিলেন না, আমাদের আর শত্রুর লাশে কমিউনিটি সেন্টার ভরে গেলো – শেষ পর্যন্ত বেলা ৭.৩০ দিকে আমাদের সৈন্যদল পশ্চাদাপসরণ করে। এ যুদ্ধে আমাদের একজন অফিসারসহ ৩০ জন নিহত কিংবা নিখোঁজ আর দুইজন অফিসারসহ ৬৬ জন আহত হয়। শত্রুদের লাশের সংখ্যা ৩ ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যেতে গ্রামের লোকেরা দেখেছে। পরদিন হেলিকপ্টারে পাক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারেরা সম্ভবতঃ জিওসি আসেন কামালপুর পরিদর্শন করে।

বলাবাহুল্য ঐদিনই পাক বেতারে কামালপুরে যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় যে প্রায় চারিশত দুষ্কৃতিকারী নিহত হয়েছে। এক অপারেশনে এত বড়

সংখ্যক দুষ্কৃতিকারীর নিহত হওয়ার সংবাদ ইয়াহিয়া বেতারে আর কখনও প্রচার করা হয়নি।

ফলাফল

বাংকারে বসে থাকা খানসেনাদের মনে ভীতি সঞ্চার করাই এ যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এ যুদ্ধে প্রমাণিত হলো বাঙালীরা দূর থেকে ফায়ার করে শত্রুকে শুধুমাত্র হেস্তনেস্ত করে দূর থেকেই আর পালিয়ে যাবে না বরং বাংকার থেকে খানসেনা তাড়ানোই তার উদ্দেশ্য। তাই বুঝি এ আক্রমণের পর থেকে খানসেনারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তথা কামালপুরের নাম শুনলেই আঁতকে উঠতো। তখনকার দিনে পাক শিবিরে বন্দী মেজর আজিজের ভাষায় বলতে হয় 'পাকিস্তানীদের নিজেদের মতে কামালপুর হলো পাকসৈন্য-এর মরণ ঘাঁটি'। ইন্টারোগেশনের সময় মেজর আজিজকে জিজ্ঞাসা করা হতো 'হোয়ার ইজ ধানিয়া কামালপুর' কিংবা 'হোয়ার ইজ ইওর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট' কথা প্রসঙ্গে সেই জুলাই আগস্ট (১৯৭১) পাক অফিসাররা কখনও বা হঠাৎ বলে ফেলতো ইওর বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইজ ফাইটিং লাইক রিয়েল টাইগারস। আক্রমণটি ব্যর্থ হলেও এর চরম সাফল্য এ উক্তির মাঝেই নিহিত আছে। তাই বুঝি পরবর্তীকালে বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে মেজর আজিজ শত দুঃখ কষ্টকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে যুগসৃষ্টিকারী কামালপুর রণাঙ্গণে যোগ দেন।

কালো পাহাড়, হাজী শরীয়তউল্লাহ কিংবা দুদু মিয়াকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। দেখিনি কোনদিন মাস্টারদাকে, কিন্তু তোমাকে দেখেছি সালাউদ্দিন। তাই মনের মনিকোঠায় সাজিয়ে রেখেছি তোমাকে যত দেখি তত যেন আরও কাছে পেয়ে যাই – মনের আশ মেটে না কিছুতেই। মৃগনাভীর সুগন্ধ ছড়ায় তোমার অবয়ব থেকে। তাই বুঝি তুমি শাশ্বত চির অমর – সংগ্রামী জনতার জীবন্ত স্বাক্ষর হে বীর সৈনিক – জাগ্রত বাংলার সালাউদ্দিন দি গ্রেট।

জেড ফোর্সের দ্বিতীয় আক্রমণ পরিচালনা করেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাফায়াত জামিল (৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ৩১শে জুলাই ১৯৭১ সনে প্রায় ৩৫০জন লোক নিয়ে দেওয়ানগঞ্জ বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণের জন্য ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রওনা হয়। ঐ অঞ্চলের একটি আইন পাশ করা ছেলে বরারামপুর গ্রামের নাসের ছিল এই আক্রমণের পথপ্রদর্শক। যার দূরদর্শিতার ফলে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৩টি বড় বড় নদী ক্ষিপ্র গতিতে সকলের অগোচরে ১১টি নৌকাসহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং গান বোটে পাহারারত পাক সৈন্যদের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে পাশ কেটে ১৫/২০ মাইল পথ নিরাপদে অতিক্রম করে রাত তিনটার সময় পূর্ব নির্দিষ্ট এফইউপিতে পৌছাতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন আনোয়ারের

অধীনে আলফা কোম্পানী নৌকাঘাটে (হাইড আউট) পাহারারত থাকে আর ১২ নাম্বার প্লাটুন ইপিআর-এর নায়েব সুবেদার আলী আকবরের অধীনে কাট অব পার্টির কাজ করে। ডি কোম্পানী লেফটেন্যান্ট নূরুন নবীর অধীনে বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। নায়েক সুবেদার বুলু মিয়া ১১ নম্বর প্লাটুন নিয়ে যায় যাত্রীবাহী ট্রেনের দিকে। আর সুবেদার করম আলী ১০ নম্বর প্লাটুন নিয়ে যায় রেলওয়ে ট্রেনের জেটির দিকে। তখন ভোর হয় প্রায়। রেল লাইনের ও পার্শ্বে দুশমনরা তখন স্টেন্ডটুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এদিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন তখন রেল লাইনের উপর শানটিং করছিল। গাড়ী শানটিং করে পিছে যাওয়ার সাথে সাথে সুবেদার করম আলী প্লাটুনের রকেট লাঞ্চারটি নিজে কাঁধে করে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে মালগাড়ীতে অবস্থানরত জেনারেটার এবং পরমুহূর্তে অগ্রসরমান শান্টিং গাড়ীর অবস্থানরত জেনারেটার এবং পরমুহূর্তে অগ্রসরমান শান্টিং গাড়ীর ইঞ্জিনকে ফায়ার করে অকেজো করে দেন আর সাথে সাথে ডাইনে অবস্থানরত সুবেদার ভুলু মিয়ার প্লাটুন-ফায়ার শুরু করে এবং গ্রেনেড পার্টি রেলের প্রত্যেক কামরায় গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করেন প্রায় প্রত্যেক কামরাতেই ৩/৪ জন খাকি পোশাক পরিহিত লোক শুয়ে ছিল। এদিকে একশান পার্টি (প্লাটুন ২টি) উইড্রলের সাথে সাথে তিন ইঞ্চি মর্টার গর্জে উঠে, ফলে স্থানীয়ভাবে যে দুটি ফাস্ট ক্লাস কামরা আর্মি গার্ডের জন্য রাখা হয়েছিল তা ধ্বসে পড়ে এছাড়া রেলওয়ে স্টেশান, বহু রেলওয়ে বগী এবং ঘাটে অবস্থানরত মালগাড়ী বহনকারী স্টিমার এবং জেটির ছাদের উপর দুশমনের মেশিনগানের বাংকার ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয়। স্টেশান এরিয়া হতে উইড্রল করাকালীন দুশমনের একটি গুলি নায়েব সুবেদার বুলু মিয়ার বাম বাহুতে লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। এই আক্রমণকালে নায়েব সুবেদার বুলু মিয়া ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কেউ হতাহত হয়নি। পরদিন সুবেদার করম আলী গেলেন পার্শ্ববর্তী ব্রিজ উড়াতে। ব্রিজ উড়ানোর আওয়াজ শুনে দেওয়ানগঞ্জে অবস্থানরত পাকসৈন্যরা বাহাদুরাবাদ ঘটের দিকে ধাবমান হলে সঙ্গে সঙ্গে আলফা ও ডেলটা কোম্পানী ক্ষিপ্রগতিতে দেওয়ানগঞ্জ বাজার, সুগার মিল ও রাজাকার হেডকোয়ার্টার পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করে সেই এলাকা সম্পূর্ণভাবে তছনছ করে। তিনদিন বিজয়ের বেশে অবস্থান করার পর ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিজ ক্যাম্পে ফেরৎ আসে। এই আক্রমণটিকে একটি পরিপূর্ণ সার্থক আক্রমণ বলা চলে। এই সফলতার প্রধান কারণ হচ্ছে চৌকস গাইড ধীর স্থির ও সিংহ হৃদয়ের অধিকারী কর্নেল শাফায়াত জামিলের সৃষ্ট পরিকল্পনা ও দক্ষ পরিচালনা এবং ৩য় ইস্ট বেঙ্গল ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক অধিক সংখ্যায় থাকার জন্য ব্যাটেল প্রসিডিউর মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে পেরেছিল বলেই। কিন্তু পূর্ব বর্ণিত ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কামালপুর আক্রমণ (৩০/৩১শে জুলাই) কে পূর্ণাঙ্গ সার্থক আক্রমণ বলা চলে না কারণ এলাকা দখল করে নিজেদের কব্জার মধ্যে রাখার

প্রয়াস আমরা করিনি বরং ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের মৃত্যুর পর পরই শত্রুরা ডিফেন্স ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করে, ফলে আমাদের হতউদ্যম ক্ষত-বিক্ষত সৈন্যরা আরো ভড়কে যায়, যার ফলে সালাউদ্দিনের লাশটাও ফেরৎ আনা সম্ভব হয়নি – এমন প্রচন্ড আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুদের এই পাল্টা আক্রমণ সত্যই প্রশংসারযোগ্য। এ ধরনের আত্মরক্ষামূলক মনোভাবকে মিলিটারী ভাষায় 'এ্যাগ্রেসিভ ডিফেন্স' বলা হয়। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আক্রমণ যেহেতু ডেলিভারট ছিল সেহেতু আর্টিলারী ফায়ার ছিল টাইম প্রোগ্রাম মোতাবেক কিন্তু আক্রমণকালে এ জিনিসটা প্রকট হয়ে উঠেছিল যে ইঙ্গিতে বা 'অন কল' রাখাই যেন ভাল ছিল তাতে করে মনে হয় মাঝ পথে আর্টিলারীর ক্রস ফায়ারে যে হতাহত হয়েছিল তা এড়ানো যেতো। এতদসত্ত্বেও কামালপুর আক্রমণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ অধ্যায়ের সূচনা করে। এই আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত রেইড ও এমবুস করা ছাড়া বাংকারে বসে থাকা শত্রুর বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে মুখোমুখি লড়াইতে আমরা অবতীর্ণ হইনি। কিন্তু এই আক্রমণেই প্রমাণিত হল, বাঙালীরা ব্রীজ উড়াতে কিংবা রাতের আঁধারে রেইড ও এমবুস করতে যেমন পারদর্শী তেমনি হাতাহাতি যুদ্ধেও সমপারদর্শী। ঐ সময় এমন একটি একশানের সবিশেষ দরকার ছিল – কারণ তখন পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমরা পিছু হঠতে হঠতে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হই। ফলে স্বভাবতই মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে পড়ে। তাই মনোবল চাঙ্গা করার জন্য বিশেষ করে আমাদের স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেদের মনে সাহস বাড়ানোর জন্য এবং এ বিশ্বাস জন্মাবার জন্য যে খানসেনাদেরকে বাংকার থেকে তাড়ানো তেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় যদি কেউ গুলিকে ভয় না করে, সালাউদ্দিন নিজের জান দিয়ে আমাদের মনে এ প্রতীতি জন্মিয়ে ছিলেন। নির্যাতিত অবহেলিত ও পদদলিত মানবতার প্রতীক স্পার্টাকাস হয়তবা নিজে মরে যায় কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে জন্ম নেয় নিস্পেষিত মানব আত্মার লেলিহান বহ্নিশিখায় ইতিহাসের অমর বীরেরা। তাই বুঝি সালাউদ্দিনের মৃত্যু বাংলাদেশের অগ্রগামীতার অভিযানের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়-আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। কর্নেল জিয়াউর রহমানের মুখে সালাউদ্দিনের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি চমকে উঠলাম – মুহূর্তে সালাউদ্দিনের মুখচ্ছবি ভেসে উঠলো, 'স্যার, চিন্তা করবেন না। বেটাদের সাহস নাই, ম্যাগাফোন নিয়ে যাচ্ছি ধরে নিয়ে আসবো।' সালাউদ্দিনের কথাগুলো কানে এসে বাজতে লাগলো – ভাবলাম এই আমাদের জীবন স্বাধীনতা দেখার সৌভাগ্য বুঝি আর হবে না; কাল হয়ত আমিও হারিয়ে যাব আক্রমণ করতে গিয়ে – তাই বুঝি চমকে উঠেছিলাম মৃত্যু সংবাদ শুনে।

অবশ্য ২রা আগস্ট তারিখ আক্রমণ রহিত করা হয়। তাড়াহুড়া করে বিশেষ করে বৃষ্টির দরুণ গাড়ীর রাস্তা থেকে পড়ে যাওয়াতে আমার ছেলেরা সময় মত এসেম্বলী এরিয়াতে পৌছতে পারেনি। রাত তখন একটা বাজে আক্রমণের সময় তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট (৩-৪৫) অথচ আমার ছেলেরা তখনও রাতের খাওয়া খেতে পারেনি। এমতাবস্থায় আমি আক্রমণ করতে অসম্মত হলাম। সামরিক বাহিনীতে সময় মত কাজ করার একটা বাতিক আছে কিন্তু শুধুমাত্র পাঙ্খুয়েলেটির নামে আমি সাড়ে তিনশত ছেলের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারিনি। হয়ত অনেকে মনে করেছিলেন আমি ভীরু, নিতান্ত কাপুরুষ। যদিও বা এক রাতে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হতাহতের সংখ্যা দেখে ভড়কে গিয়েছিলাম সত্যি, আর তার চেয়ে বড় কথা ঠিক আগের দিন (১লা আগস্ট ১৯৭১) আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিন (আমার নামে নাম) আমার দেশের বাড়ীতে (ফেনীর আনন্দপুর গ্রাম) আমার একশত বছরের বৃদ্ধ পিতামহ আলহাজ্ব হুসেন উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (যিনি আনন্দপুর ইউনিয়নের আবালবৃদ্ধ বণিতার কাছে প্রেসিডেন্ট দাদা বলে পরিচিত ছিলেন কারণ তিনি ১৯২৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ৩১ বছর ধরে আনন্দপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন) সহ অন্যান্য আটজন আত্মীয়স্বজনকে ১৬ই জুন হানাদার পাক সৈন্যরা যে গুলি করে হত্যা করেছিল সে সংবাদ আমায় দিয়েছিলেন। তাই মনে মনে আমি মৃত্যু ভয়ে কেঁপে উঠেছি বৈকি। আর মৃত্যু ভয়ে কে না ভীত সকলেই তবে তফাৎ এই যে সাহসী লোক সম্মানের সাথে মরতে চায় যদিও অন্তরের অন্তঃস্থলের বাসনা মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। ৩রা আগস্ট আমি ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রেভো ও ডেলটা এই দুই কোম্পানী যোদ্ধা নিয়ে আক্রমণ করলাম নক্সী বিওপি। এর আগে আমি তিনদিন পুরো বিওপি রেকী করেছি। নক্সী বিওপির পূর্বতন সুবেদার হাকিম ও তার সাথীরা আমায় এ বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। তার কারণ এই বিওপি তাদের নখদর্পণে ছিলো। প্রথম দিন আমি নিজে সুবেদার হাকিমসহ নক্সী বিওপির আশপাশ রেকী করে একটি উঁচু টিলা থেকে। বাইনোকুলারে সুবেদার হাকিম আমায় বলেছিল কোথায় শত্রুদের বাংকার, বারবেড অয়্যার, বাঁশের কঞ্চি, মাইন ফিল্ড, কুক হাউস, মসজিদ ও বিওপির প্রবেশ পথ, কোথায় কত শাস্ত্রী থাকতে পারে। তারপর গারো পাড়ায় গিয়ে চুপি চুপি দেখা করলাম শত্রু শিবিরে আমাদের প্রেরিত বাবুর্চির সঙ্গে। বাবুর্চি বললো সে ৪৫ জন আর্মির খাওয়া পাকিয়েছে এবং আরও ৬৫ জন আর্মির লোক আসছে এবং গোটা ৫০/৬০ জন রাজাকার ও বিভিন্ন ডিউটিতে আছে। দ্বিতীয় দিন প্লাটুন কমান্ডারকে নিয়ে আমি আবার স্বচক্ষে হালছটি গ্রাম, শালবন ও নালা পথ রেকী করে কোথায় কোন হাতিয়ার হবে এবং কোথায় এফইউপি (ফর্ম আপ প্লেস) হবে সকলকে পই পই দেখিয়ে দিলাম। পহেলা আগষ্ট আমি পুরো সেকশন কমান্ডারদেরকে নিয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গা আবার দেখিয়ে দিলাম যাতে করে রাতের

আঁধারে ভুল না করে। এদিকে সাপোর্টিং হাতিয়ার (সাহায্যকারী) মেশিনগান, ১০৬ মি.মি. ও ৭৫ মি.মি. আর আর এর জন্য বাংকার বানাবার জন্য ২৫টি আড়াইমনি চটের বস্তা নিয়ে এলাম। এত তৈরী হওয়া সম্ভব হয়েছিল শালবনের ঘন আড়ালের জন্যই। অবশ্য পাকিস্তানীরা উত্তর দিক বিওপির চতুপার্শ্বে প্রায় ৬০০ গজ এলাকায় সমস্ত গাছপালা, জঙ্গল পরিষ্কার করে কিলিং জোনের ফিল্ড অব ফায়ার একেবারে সাফ রেখেছিল। তৃতীয় দিনে রেকী করার কালে হালছটি গ্রামের নালার পাশে আমরা তখন একটি আমগাছের মাথায় লাল ফুলকে মানুষ মনে করে (স্নাইপার) থমকে দাঁড়ালাম। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এক গাল হাসি হাসতে যাব এমন সময় ঝুপ একটি শব্দ হলো, মনে হলো লোকটি নালার ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। আমার সেকশন কমান্ডাররা জড়সড় হয়ে একে অপরের মুখোমুখী হয়ে পজিশনে গেল। দেখে পিত্তি জ্বলে গেলো। আসলে তাদেরকে আরও ছড়িয়ে পড়ে একে অপরের বিপরীত দিকে মুখ করে (ডায়মন্ড ফর্মেশন) অলরাউন্ড ডিফেন্স নেওয়া উচিত ছিল। বুঝলাম আরও অনেক ট্রেনিং-এর দরকার। ভাগ্যিস এই ঝুপ আওয়াজ হয়েছিল নালাতে পড়ে ভেঙে ধ্বসে পড়া মাটি থেকে তা না হলে গোলে গালে বসে থাকা আমার দলটিকে নিমিষের মধ্যে শেষ করে দেয়া একজন শত্রু সৈন্যের পক্ষেই যথেষ্ট ছিল। ফেরত আসার সময় একটি গারো মেয়ে আমাকে দেখে ঝুপ করে পাহাড়ের গাছের সাথে মিশে রইলো। আমি ধারণাই করতে পারিনি যে অমন ফাঁকা জায়গায় কোন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। আমি মেয়েটিকে পাশ কেটে চলে যাবার পর যখন সুবেদার হাকিম ইশারায় আমায় দেখালো আমি তো থ।

২রা আগস্ট বিকালে কর্নেল জিয়াউর রহমান স্বচক্ষে আমার প্ল্যান মোতাবেক হাতিয়ারের অবস্থানগুলো দেখলেন। রাতে রাস্তা থেকে গাড়ী পড়ে যাওয়াতে যখন বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় তখন ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন মাহবুব যিনি পরে ৮ ডিসেম্বর ৭১ সনে সিলেট রণাঙ্গণে শহীদ হন আমাকে বললেন স্যার মনে কনফিউশন থাকলে এটাক করতে যাবেন না। আমি হেসে বললাম, বেওকুফের মত মরতে আমি রাজী নই। ৩রা আগস্ট রাত ১২টার দিকে এসেম্বলী এরিয়া হতে রওনা হব দেখি বাহাদুরাবাদ ঘাটে বিজয়ী বীর কর্নেল শাফায়াত জীপ নিয়ে হাজির, আই রিমেম্বার, ডোন্ট গো ফর ইমপসিবল টাস্ক অল বাই ইওরসেলফ অলদি বেষ্ট! বলা বাহুল্য, আর্মিতে ইংরেজীতে কথোপকথনটা একটু বেশী বৈকি যদিও মরার আগে আমরা সকলেই বারবার বাংলায় চিৎকার দিয়েছি। এসেম্বলী এরিয়া হতে অত্যন্ত সাবলীল গতিতে আমার সৈন্যরা এফইউপিতে পৌঁছায়। এমন কি মাঝ পথে নালা ক্রস করার সময় ও কোন শব্দ করেনি কারণ পূর্ববর্তী দুই রাত বিনা শব্দে পানির উপর চলার প্র্যাকটিসও করেছিলাম। অন্যদিকে একই সময় দুই

প্লাটুন রাঙ্গামাটিয়াতে যায় কাট আপ পার্টি হিসাবে যদিও ইপিআর এর গার্ড ছিল তথাপি মনে হয় এফইউপি মার্কিং করলে যে সামান্য বিশৃংখলাটুকু হয়েছিল তাও হত না। সৈন্যরা যখন এফইউপিতে যাচ্ছে আমি তখন ৮/১০জন এফএফ (ছালা) নিয়ে এমজি ও আরআরের এমুনেশান বাংকারে পৌছায়ে দেই। উদ্দেশ্য ওদের মনে সাহস যোগানো কারণ যুদ্ধের ফলাফল এদের উপরই অনেকখানি নির্ভর করছিল। বাংকারের পিছে অবস্থান করছিল সুবেদার হাকিম তখন রীতিমত ক্ষেপে গেছেন কারণ ইনি নিজে কোন খাবার পাননি নিজের ছেলেরা যারা সারারাত ঐ আড়ইমণি বস্তা বালি ভরে বাংকার বানিয়েছে ওরাও পায়নি। দেমাক ঠান্ডা রেখে বললাম সাবাস ভুলি নাই তবে আপনাদের রুটি পিছনে এসেম্বলী এরিয়াতে রয়ে গেছে কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে নিয়ে আসুন। এফইউপিতে আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিন আমাকে একাকী শত্রুভিমুখে ফেলে না দিয়ে আমার সাথে উনি নিজেও যেতে চাইলেন। আমি সেই দুঃসাহসিক বীরযোদ্ধাকে ইকনমীর কথাটা বুঝাতে চাইলাম নিছক আবেগে কাজ হবে না এক সঙ্গে দু'জন অফিসার হারানো মুক্তিবাহিনীর জন্য তখন নিছক বোকামী। রাত ৩.৩৫ মিনিট এফইউপিতে পজিশন নিলাম। আমার ডানে ১২নং প্লাটুন আর বামে ৫নং প্লাটুন। আর সেই ১২নং প্লাটুনে আমার এক ভাগ্নে আইএ ক্লাসের ছাত্র জহিরুল আনোয়ার ওরফে সানু সাধারণ সৈনিক হিসাবে আমার পাশেই ছিল। আশ্চর্য আজ আত্মীয়তার প্রশ্নটাই যদিও বা বড় হয়ে আবার দেখা দিচ্ছে (যেহেতু স্বজন প্রীতি আমাদের মজ্জাগত হয়ে আছে) সেদিন কিন্তু এ প্রশ্নটা তেমন করে দেখা দেয় নি সেদিন প্রীতি রন্ধ্রে" রন্ধ্রে ঝংকৃত হয়েছিল – ... ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার। তাই বুঝি ঘুণাক্ষরেও যুদ্ধের ময়দানে আমার ভাগ্নের উপস্থিতি আমি টের পাইনি। স্বাধীনতার পর জার্মান থেকে চিকিৎসা সেরে ফেরৎ আসার পর পরিচয় ঘটে ৮ম বেঙ্গলের সেই সৈনিকের সাথে চৌমুহনী পোস্ট অফিসে, যে পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার ওর পিতা জনাব এ কে এম শফিকুর রহমান।

এফইউপিতে পজিশনে গিয়ে ৩.৪৫ মিনিটে অয়্যারলেসে বললাম [...] মার সঙ্গে সঙ্গে আর্টিলারী গর্জে উঠলো। বুঝতে পারলাম আর্টিলারীর আওয়াজের ধমকে আমার স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা এফইউপিতে মাটির সাথে মিশে যেতে চাইছে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকাটা আরও প্রকট হয়ে উঠলো যখন নিজেদের এই এইচ আওয়ার আর্টিলারী গোলাবর্ষণ কালে দু'তিনটি রাউন্ড ভুলবশতঃ ঠিক আমাদের এফইউপিতে এসে পড়ে যদিও বা টারগেট থেকে এফইউপি ছিল প্রায় এক হাজার গজ দূর। মনে হয় এফইউপি শত্রু শিবিরও আমাদের আর্টিলারী পজিশন এক লাইনে ছিল বলে সহজে আর্টিলারীর গোলা এসে এফইউপিতে পড়েছিল। অবশ্য পূর্বাহ্নে আর্টিলারীর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান হলে কিংবা এত নিম্নমানের হতে

পারে এ ধারণা থাকলে আমি হয়ত ডাইনে হালছাটি গ্রামের শাল বনকে এফইউপি বানাতাম। হালছাটি গ্রামের শাল বনটি শত্রু শিবির হতে মাত্র তিনশত গজ দূরে ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের আক্রমণের বেশ কিছুদিন আগে ঐ শালবনকে এফইউপি বানিয়ে এফএফ কোম্পানী বিওপির উপর আক্রমণ করেছিল, তাই আমি ঐ শালবনটিকে এফইউপি বানাইনি অন্যদিকে পূর্বদিন (২রা আগস্ট) আমার পরিকল্পনা ছিল সামনের নালাকে এফইউপি বানিয়ে আর্টিলারীর ফায়ার অন কল রেখে (দরকার মত ব্যবহার করা) আক্রমণ করা। তাতে করে রাতের আঁধারে শত্রুর অজান্তে আমরা শত্রু শিবিরের ২/৩ শত গজ ভিতরে পৌছে যেতাম আর নিজস্ব আরআর ও মেশিনগান দিয়ে শত্রুকে আচম্বিতে ঘায়েল করে শত্রুর ব্যূহভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস। আর বিশেষ দরকার মত আর্টিলারী সাপোর্টটি তো ছিলই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পূর্ব পরিকল্পনা বদল করে প্রিএইচ আওয়ার (আক্রমণের পূর্বাহ্নে) গোলাবর্ষণের কার্যক্রম নিতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, যুদ্ধের আগেই এফইউপিতে নিজেদের আর্টিলারীর এই দুই তিনটি রাউন্ড এসে পড়াতে আমার ছয়টি ছেলে ঘটনাস্থলে গুরুতররূপে আহত হয়, ফলে পুরো প্লাটুন আহতদের শুশ্রূষার নামে এফইউপিতেই থেকে যায়। এতে যথেষ্ট শোরগোলও হয়। অপরদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে (আমাদের আর্টিলারী গর্জে উঠার মিনিট খানেকের ভিতর পাকিস্তানী আর্টিলারী গর্জে উঠে) একবার মাটিতে শুয়ে পড়ে তারপর আবার দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজ বৈকি বিশেষ করে আমার দুই কোম্পানীর জন্য। কারণ আমার দুই কোম্পানীতে (৮ম ইস্ট বেঙ্গল) দুইশত জনের মধ্যে তখন মাত্র ১০জন সামরিক বাহিনীর লোক গোটা আটেক ইপিআর এবং দুই তিনজন পুলিশের লোক ছাড়া বাকী সবাই সাতদিনের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাম বাংলার একান্ত সাধারণ মানুষ। প্রিএইচ আওয়ার গোলাবর্ষণের সাথে সাথে আমার ডাইনে অবস্থিত মেশিনগান ও আরআর প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে হালছাটি গ্রাম থেকে ইপিআর-এর প্লাটুনটিকে ভাওতা দেওয়ার জন্য আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে শত্রুদের ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দিল। এই কার্যক্রমগুলি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সাবলীল গতিতে হতে থাকে। ইপিআর-এর আক্রমণ চলাকালীনই আমরা চুপি চুপি এক্সটেন্ডেড লাইন (বিলম্বিত রেখার মত) ফরমেশন করে পায়ে পায়ে এগুতে থাকি। এ অবস্থায় সুবেদার জালাল যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করলেও পরবর্তীকালে তার আর সাক্ষাৎ পাইনি। এফইউপি ছাড়ার সাথে সাথে একটি ছেলে পাশ থেকে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে উঠলো 'স্যার বাঁ দিক থেকে গুলি আসছে যে' ভাবখানা এই গুলি তার পিছু ধাওয়া করছে, হাসি পেলেও চিৎকার করে উঠলাম 'বেটা গুলি আসবে না তো বৃষ্টিধারা আসবে?' ৫০০ গজ আগে নালার কাছে পৌছে শুধু ২ ইঞ্চি মর্টার ওয়ালাদেরকে নালীর পাড়কে আড়াল রেখে ৩৩০ গজ আগে শত্রু শিবিরের উপর

ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। এই নির্দেশ না দিলেই যেন ভাল হতো কারণ আমার এই নির্দেশের সুযোগে আমার স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা নালাতে আড়াল নিয়ে নেয় তাতে কমান্ড ও কন্ট্রোল একেবারে শিথিল হয়ে পড়ে। নায়েব সুবেদার কাদের ও বাচ্চুর অধীনে ৫ ও ৬নং প্লাটুন বিওপির গেটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার কথা ছিল কিন্তু তারাও নালার ভেতরে আড়াল নিয়ে মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করতে শুরু করে। সম্ভবত এই জন্যই এফইউপি ত্যাগ করার পর 'ফায়ার এন্ড মুভ পদ্ধতিতে আক্রমণ করা মিলিটারী একাডেমীতে (পাকিস্তান) বিতর্কের বস্তু ছিল এবং প্রায়ই বলা হতো এফইউপি ছাড়ার পর ডোন্ট গো টু দি গ্রাউন্ড এগেইন। নালাতে আমার সৈন্যদের এমন কান্ড দেখে শত্রু শিবিরে নিকটবর্তী এসেও আমি চিৎকার না করে পারিনি এমনকি কাউকে কাউকে লাথি পর্যন্ত মেরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে কলার চেপে ধরে ধরে আমি জোর করে আগে পাঠাতে শুরু করি। আমার বামে হাবিলদার নাসির তার সেকশান নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সাথে ক্ষিপ্র গতিতে এগুতে থাকে এবং আমি নিজে নায়েক সিরাজকে সাথে করে ডাইনে বাংকারের দিকে এগুতে থাকি। আমাদের এই মনোবল দেখে শত্রুরা তখন পলায়নরত – ইতিমধ্যে আমরা এ সল্ট লাইন ফর্ম করি এবং সঙ্গে সঙ্গে চার্জ বলে হুংকার দিই এবং পর মুহূর্তে ইয়া আলী বলে আমার সৈন্যরা সংগীন উঁচা করে বেয়োনেট চার্জ-এর জন্য রীতিমত দৌড়াতে শুরু করে। এদের উত্তেজনাকে বাড়াবার জন্য নায়েক সুবেদার মুসলিম 'নারায়ে তকবীর' ধ্বনি করলে সৈন্যরা ঘন ঘন আল্লাহ আকবর ধ্বনি করে সমস্ত যুদ্ধের ময়দানকে প্রকম্পিত করে তোলে। আনন্দে আতিশয্যে আমার সিগনাল ম্যান অয়ারলেস সেট আমার সামনে এনে ধরলে আমি ধমকে উঠলাম 'তুমি নিজেই যা পার বলে পাঠাও' পিছু পিছু সে অয়ারলেসে জোশের সঙ্গে বলে বেড়াচ্ছিল হয়ে গেছে আর একটু বাকি ... বাংকারে বাংকারে যুদ্ধ হয় হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক এমন সময় শত্রুদের আর্টিলারী শেলভো ফায়ার (এয়ার বৃষ্টি) এসে পড়লো আমাদের উপর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন ঢলে পড়লো যার ভিতর সম্ভবত হাবিলদার নাসিরও ছিল। আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আমার ডান পায়ে এসে একটা শেল লাগলো – আঘাতটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই জোশের সাথে এগিয়ে গেলাম আরও ৫০ গজ শত্রু বাংকার থেকে মাত্র পাঁচ গজ বাকি। আমাদের গুটিকতক ছেলে তখন পলায়নরত শত্রুদেরকে মারছে কেউ কেউ মাইনফিল্ডে ফেঁসে গিয়ে শত্রুর মাইনে উড়ে যাচ্ছে কেউবা শত্রুর গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় অনার্স স্টুডেন্ট শামসুল আলম মাইন কিংবা শত্রুর তোপের মুখে উড়ে গেল। ঐ বিশ পঁচিশটা ছেলের মন চাঙ্গা রাখার জন্য জোরে জোরে চিৎকার করে উঠলাম 'বিওপি' একেবারে তছনছ হয়ে গেছে, আগে বাড়ো যদিওবা বিওপির মাটির দেওয়াল আগের মত ঠিক খাড়া দিল। এমন সময় আমার বাম পায়ে বাঁশের কঞ্চি বিঁধলে আমি পড়ে গেলাম। সম্ভবত

পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আহত এক খানসেনা এলে সঙ্গীন নিয়ে বাচ্চা ছেলে সালাম (৮ম শ্রেণী ছাত্র এবং এক সুবেদার মেজরের ছেলে) আগেই খতম করে দিল খানসেনাকে। এদিকে যারা মাথা নিচু করে পিছনের নালা থেকে আন্দাজে ফায়ার করছিল তাদের ফায়ারে আমাদের দুটি ছেলে জখম হলো। করার কিছুই নেই তখন। এর আগে এফইউপি থেকে এডভান্স করাকালীন নালাতে অবস্থান করা কালে অমন মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করার জন্য আমি একটি ছেলের কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে পিছনে পাঠিয়ে দিই। মাটিতে পড়ে গিয়ে আমি দুইটি ধাবমান শত্রুকে গুলি করে ডান দিকের বাংকারে অবস্থানরত শত্রুসেনাকে গুলি করার জন্য বিহারী ছেলে হানিফকে ঘন ঘন নির্দেশ দিচ্ছিলাম, অবশ্য হানিফ তখন ভীষণভাবে অনুরোধ করছে, 'স্যার আব পিছে চলে যাঁয়ে, মাইকভারিং ফায়ার দে রাঁহাহু'। বলাবাহুল্য বিহারী ছেলে হানিফ ছিল আমার ব্যক্তিগত প্রহরী। বরিশালের এক বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছিল হানিফ – বেশ কয়েকটা অপারেশান করার পরেও সন্দেহভাজন হয়ে মুক্তিবাহিনী তাকে বন্দী করে। বন্দী শিবিরে স্পষ্ট বাংলায় সে আমাকে বললো, 'স্যার আমি বেঈমান না একটো চান্স দিন জান দিয়ে প্রমাণ করবো' পিঠ চাপড়িয়ে আমি বললাম, হানিফ তুমি আজ থেকে আমার পারসোনাল গার্ড'। পারবে? স্যার আমার জান থাকতে আপনার গায়ে গুলি লাগবে না প্রত্যয় ভরা মুখে উত্তর দিল হানিফ। সত্যই সে জীবিত থাকাকালীন আমার গায়ে গুলি লাগেনি (যদিও শেল লেগেছে)। হানিফকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেওয়ার আগেই হিস শব্দ হলো, হানিফ ঢলে পড়লো, মনে হয় ওর মাথায় গুলি লেগেছিল আর তার মাথায় স্টিল হেলমেট ছিল না। ক্রল করে ওর হেমার সেকে ধাক্কা দিয়ে ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠলাম 'হানিফ' কোন সাড়া আসলো না। প্রাণটা কেঁদে উঠলো – সাথে সাথে শত্রুর গুলিতে পাশের মাটি উড়ে গেলো, বুঝতে পারলাম শত্রু আমায় দেখে ফেলেছে। সাইডরোল করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করাকালীন বাম দিক থেকে একটা গুলি এসে আমার ডান হাতের কনুইতে লাগলো (ঝাঁ করে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। হাতের ড্রেসিংটা বের করবো, এক ঝাঁক গুলি এসে পাশের জমির আইলটা উড়িয়ে দিল। বুঝতে পারলাম শত্রুর ৫ গজের ভিতর আর থাকা সম্ভব না। আমার দু'ধার শুধু লাশ আর লাশ কারণ এর আগের মুহূর্তে শত্রুর এস ও এস (সেইভ আওয়ার সোল) এয়ার বৃষ্টি আর্টিলারী ফায়ারে আমাদের যে আট দশজন লোক শত্রুর বাংকারে ঢুকে পড়েছিল তারা ধরাশায়ী হল তার মধ্যে নায়েক সিরাজ এবং পুলিশের লেন্স নায়েক সুজামিয়াও ছিল। পাশে তাকিয়ে দেখি একটি কচি ছেলের লাশ। ছেলেটি কিছুক্ষণ আগে শত্রুর গুলিতে হতচকিত খেয়ে শত্রুর ডান বাংকার এড়িয়ে কোণাকোণী আরও ডানে অধিকতর নিরাপদ স্থান হালছাটি গ্রামের দিকে যেতে চেষ্টা করেছিল। ওর কলার চেপে ধরে বাংকারের মুখোমুখী করে অঙুলি দিয়ে টারগেট দেখিয়ে দিলাম। ঐ মুহূর্তে ভাববার অবকাশ পাইনি। কিন্তু

আজ ভাবছি। না। ভাবছি বললে ভুল বলা হলো। ভাবনা পেয়ে বসেছে। হোঁচট খাওয়া হৃদয় আর মোচড়ে উঠা মন নিয়ে ঝাপসা চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছি সন্তানহারা মায়ের মিছিল আর অহরহ শুনছি ধরণী বিদীর্ণ করা আর্তনাদ। কিন্তু আজ কেমন করে সে সব সন্তানহারা মা'দেরকে বলি যে আমরা তাদের সন্তানদের নাম পর্যন্ত জানি না – কেমন করে হিসাব দেব নিকাশ যদি চায়। কেমন করে বলি সে সব নাম না জানা মুক্তিযোদ্ধার দল ছিল ভোরের শিশির, সূর্য উঠার আগেই মিলিয়ে গেছে, কেমন করে আজ বলি ওরা এসেছিল আমাদের অশান্ত জীবনের এক ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে। এসেছিল ধূমকেতুর মত মিলিয়ে গেল উল্কার মত নীল আকাশের অথৈ সাগরে। আজ কেমন করে বলি কোল খালি হয়ে যাওয়া মাকে যে যুদ্ধের ময়দানে বন্ধুর লাশকে ডিঙ্গিয়ে আগে বাড়তে হয়, কেমন করে বুক চাপড়ানো মাকে সান্ত্বনা দেই যে প্রিয়তম বন্ধু মরে যায় – তার দেহকে স্যান্ডব্যাগের মতো আড়াল হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। আজ সন্তান হারা পাগলিনী মায়ের হাজার প্রশ্নে জর্জরিত। তাই চমকে উঠেছিলাম শহীদ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনের মায়ের প্রশ্নে 'আমার ছেলেকে পানি খাইয়েছিলে'? আমতা আমতা করে মিথ্যা বলেছিলাম – 'হ্যাঁ হ্যাঁ দু-তিনটে ছেলে খাইয়েছিল।' সেখানেই বুঝি শেষ নয়, বুক ফাটা মায়ের আর্তনাদকে স্তিমিত করার জন্য মিথ্যা বলে ফেললাম 'আমাদের সৈনিকরা মাটি খুঁড়ে সেই ধানক্ষেতের ভিতর সালাউদ্দিনকে কবর দিয়েছিল।' মিথ্যা বলছি বন্ধু, তবুও বলছি – 'হায় মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজমহল/বল তাতে কার ক্ষতি?' আজ তোমাদের নিয়ে কেউ ঘর সাজাবে না আলতা পরে ঘোমটা টেনে দুয়ারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত হবে না বাংলার কোন শাশ্বত বধু।

শত্রু শিবিরে পাঁচ গজের ভিতর থেকে বের হওয়ার জন্য ফিল্ড ড্রেসিং তার বের না করে সাইড রোল শুরু করলাম উদ্দেশ্য ডাইনের ঢালু জমি দিয়ে অধিকতর নিরাপদ রাস্তাতে পশ্চাদপসারণ করা। কিছুক্ষণ সাইড রোল করার পর তাকিয়ে দেখি আসলে ডাইনে না গিয়ে আমি কোণাকোণি শত্রু শিবিরে দিকেই যাচ্ছি। মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হবে – তাই একটু দম নিয়ে পিছনে তাকিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে নিলাম শরীর গরম থাকতে থাকতেই আমার হাজার গজ দূরে শালবন এলাকায় পৌছাতে হবে। ক্রল শুরু করব, এমন সময় দেখি বাচ্চা ছেলে সালাম যে পঞ্চাশ গজ ক্রল করে পিছে হটে গিয়েছিল হঠাৎ করে আবার দৌড়ে এসে পড়ে থাকা একটা এলএমজি নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে হুংকার দিয়ে শত্রু বেস্টনীর দিকে ধাবিত হলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া শত্রু তখন পুনরায় কাউন্টার এর্টাক করার জন্য মাটির দেয়ালের পিছে জমায়েত হচ্ছিল এবং ঘন ঘন 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি করছিল। ওরে তোরা আমার মা-বাপ সবাইকে মেরেছিস, আমি ছেড়ে দেব। বিড় বিড় করে

পাগলের মত সালাম শত্রু বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়ল অতি কষ্টে একবার ডাক দিলাম 'সালাম চলে এস'। কিছুক্ষণ আগে যে আমার জীবন রক্ষা করেছিল সেই সালামকে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি বলে আমি তাকে যুদ্ধে শামিল করিনি, কিন্তু সে পালিয়ে এসে এসেম্বলি এরিয়াতে আমাদের সাথে চুপি চুপি যোগ দেয়। বাংলার শ্যামল গালিচার দূর্বাদলের মাঝে এমনি করে লুকিয়ে আছে। হাজারো সালাম। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটা তখন মহাশ্মশান। মৃতদেহ ছাড়া আর কোন জ্যন্ত মানুষ নাই – বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ হচ্ছে দুদিক থেকে। শালবনে অবস্থানরত আমার মেশিনগান তখন ঘন ঘন গর্জে উঠছে সম্ভবতঃ আমার ক্ষতবিক্ষত পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদেরকে কভারিং ফায়ার দিচ্ছিল। তাই আমি নিজেদের ফায়ার থেকে বাঁচার জন্য ডাইনে অপেক্ষাকৃত নিচু ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে এগুতে শুরু করি, এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠলো 'এরে আঁই বাঁচতে চাই – তোরা কেউকি আঁর কথা শুনতাছ না – এর আঁরে লই যায়' প্রাণটা কেঁদে উঠলো যদিও করার কিছুই ছিল না তবুও দাঁত খিচিয়ে বললাম বেটা চিৎকার করিস না, তবে তার কাছে যাওয়ার কথা চিন্তা করার আগেই ঐ এলাকা বরাবর একটি আর্টিলারী শেল এসে পড়লো মাথাটা নিচু করে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকাকালে আঁচ করলাম স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে আমার পাশের মাটি উড়ে গেল আমি তাড়াতাড়ি বা'হাত ঠেলে ঠেলে (কারণ এক হাতে ও এক পায়ে ক্রল করা সম্ভব হচ্ছিল না) নিজের আহত শরীরটাকে নালার দিকে নিয়ে গেলাম ইতিমধ্যে আর কোন চিৎকার শুনিনি। নালার কাছে পৌঁছে সব শক্তি নিয়োগ করে খাড়া হয়ে টলতে টলতে কেমন করে জানি নালাটা পার হয়ে গেলাম – আজ বলতে পারব না – মনে হচ্ছে বাঁচতে হবে এই জোরেই বুঝি নালাটা পার হয়েছিলাম আর পাড়ে ওঠার সাথে সাথেই ধপ করে পড়ে গেলাম। তবু স্বস্তিবোধ করলাম এই মনে করে যে শত্রু থেকে অনেক দূরে এসে গেছি এবং অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গায় এসেছি তাতে শত্রুর স্মল আর্ম ফায়ার থেকে প্রায় বেঁচে গেলাম। শরীরটা ক্রমশই ঠান্ডা হয়ে আসছিল তাই বুঝি সমস্ত জোর দিয়ে খাড়া হয়ে দৌড় দিতে চেষ্টা করলাম। দুই এক কদম যাওয়ার আগেই এক ঝাঁক গুলি আমার পাশের মাটি উড়িয়ে দিল, আস্তে আস্তে ধপ করে মাটির উপর গিয়ে পড়লাম আবার। শত্রুর আর গুলি আসছে না দেখে আবার একটু স্বস্তিবোধ করলাম। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার আগেই টের পেলাম ১০/১২ জন শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পিছে নালার ওপারে আমার এক হতভাগ্য আহত জোয়ানকে পেয়ে এক গাল হাসি হেসে ওরা গুলি করল। তারপর কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। মাঝে মাঝে এগুলোর আওয়াজ পাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ করে শত্রুর দল থেকে এক বাঙালী আর এক বাঙালী বলছে 'মকবুল এদিকে আয় পাওয়া গেছে' বোধহয় ঠেলে ঠেলে আসার ফলে কর্দমাক্ত মাটিতে রাস্তা হয়ে গিয়েছিল আমার পালাবার পথ। সাথে হাতের ও পায়ের রক্ত আর বেশি করে

চিহ্নিত করেছিল সেই পথকে। সেই থেকে শত্রুর সাথে শুরু হল আমার লুকোচুরি ধান ক্ষেতের আড়ালে আড়ালে। প্রায় ৩০০ গজ আসার পর ধানক্ষেত শেষ হয়ে গেল। এরপরের ২০০ গজ সম্পূর্ণ খোলা ময়দান। ঐদিকে কর্দমাক্ত মাটিতে কোমর পর্যন্ত সারা পানিতে থাকার ফলে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। ভীষণ শীত করছিল ভাবলাম আর বোধহয় বাঁচা সম্ভব নয়। আমাদের তরফ থেকে কোন জনপ্রাণীরই চিহ্ন নাই। যে মেশিনগান এতক্ষণ ধরে প্রচণ্ড বেগে ফায়ার করছিল সেও চুপ হয়ে গেছে। এফইউপি তত্ত্বাবধানে যারা ছিল তারাও চলে গেছে। আমার নিজস্ব কোন ঘড়ি ছিল না। আক্রমণের আগে আমার রকেট লাঞ্চারওয়ালা তার নিজের ঘড়িটা আমায় দিয়েছিল। সেই ঘড়িটার দিকে একবার তাকালাম। কর্দমাক্ত ঘড়ি, এমনকি কাঁচের ভিতরও পানি ঢুকেছে। বেলা তখন ৮.১০মি.। রোদটা পিঠে লাগছিল। তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়ে পড়েছি। মনে পড়েনি কোন প্রিয়জনের কথা, কিংবা কোন চেনামুখ (সম্ভবত কোন চেনামুখ মনে দাগ কাটতে পারেনি বলেই) অথবা কোন চিঠির অংশ বিশেষ গুঞ্জরিত হয়নি কোন মিহি সুরের ঝংকার এক পলক মিষ্টি হাসির মধুর মুর্ছনা। দেবদাস মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আর পার্বতী ছুটে আসছে পাগলীনির মত – এমনটির ভাববারও অবকাশ পাইনি কিংবা দুঃসাহস হয়নি। কারণ জীবনমরণ 'টাগওয়ারের' শেষ মুহূর্তে এসে হেরে যাওয়ার দুঃসহ জ্বালায় আমি তখন বিহ্বল, বড় অসহায়। জীবন রস ঘর্মাক্ত কলেবরে নির্গত হচ্ছিল। তাই বুঝি কেবলই মনে হচ্ছিল আমার একটা জওয়ান যদি একটা কভারিং ফায়ার দেয় তবেই আমি রক্ষা পাই শত্রু তখন পঞ্চাশ গজ দূরে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্রমেই আমি তলিয়ে যাচ্ছি। নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। শেষবারের মত টেনে হেঁচড়ে নিজ বিক্ষত দেহটাকে আর্টিলারী শেলে সৃষ্ট একটি কালো মাটির গর্তে নিয়ে গেলাম। শত্রু যাতে সহজে দেখতে না পায় গলা পর্যন্ত ধীরে ধীরে বা হাতের কর্দমাক্ত কালো মাটি দিয়ে লেপে দিয়ে স্টীল হেলমেট মাথার নীচেদিয়ে শুয়ে রইলাম। অপেক্ষায় রইলাম চরম মুহূর্তের। চোখটা আপনা থেকেই বুজে আসছে। ভেসে উঠলো মায়ের মুখছবি। এলোমেলো চিন্তা স্রোত-দুটি অসহায় যুবতী বোনের সজল চাহনি একটি আফসোস দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। যুদ্ধে যোগ দেয়ার আগে মাকে দেখে আসা একান্ত উচিৎ ছিল। আজ মা বাপ ভাইবোন কে কোথায় কেমন করে আছে জানি না। তারাও জানলো না আমি কেমন করে মরতে যাচ্ছি। ভাবনার কূপমণ্ডকতা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে জোর করে চোখ খুলে চাইলাম। স্টেনটা বা হাতে ধরা। বন্দী হবো না কোনক্রমেই বরং মেরে মরব। তবুও মনে প্রাণে মরার কথাটা চিন্তা করতে পারিনি। কেন জানি মনে হচ্ছিল এত অল্প বয়সে মরে যাব। নিশ্চয়ই বেঁচে যাব। আশ্চর্য এত বিহ্বলতার মাঝেও একটা কথা বারবার মনে পড়ছিল আহা কেউ যদি আমার হারিয়ে যাওয়া ডায়েরীটা পেত (বিশেষতঃ ২রা মার্চ ৭১ থেকে ১০ই জুলাই ৭১ সন) কিংবা এখানে ওখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

আমার লেখাগুলো। চোখ দুইটাকে আর খুলে রাখতে পারছিলাম না। ঠিক এমন সময় আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো শালবন থেকে 'আমিন আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা করে' আহত হওয়ার তিন ঘন্টা পর এই প্রথমবারের মত সক্রিয় সাহায্য পেলাম। বস্তুতঃ আমার নিহত বা নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ কর্নেল জিয়াউর রহমানের নির্দেশে মেজর আমিন তখন কমান্ডো প্লাটুন নিয়ে আমার মৃতদেহ খুঁজতে বের হয়েছিলেন। আমার কাছে ক্রল করে আসতে ইতস্ততঃ করছিল দেখে মেজর আমিন নিজেই খালি হাতে ক্রল শুরু করলেন সাথে সাথে হাবিলদার তাহের (বর্তমানে নায়েব সুবেদার) মেজর আমিনের পিছু নিল। আমার কাছে এসে উভয় পর্যায়ক্রমে আমার পা ধরে মৃতদেহের মত টানতে শুরু করলো। পিঠের চামড়া উঠে যাচ্ছে বিক্ষত ডান পায়ের ব্যাথায় ঢুকরে উঠলেও দাঁত কামড়ে রইলাম। সম্ভবত আনন্দের আতিশয্যে ব্যথা ভুলে গেলাম। লেফটেন্যান্ট মোদাসের তখন চিৎকার করছে শালবন থেকে তাড়াতাড়ি করেন স্যার। তার দুই এলএমজিওয়ালা তখন দুই গাছের উপর উঠছে। শত্রুরা তখন আমাদের ২০/২৫ গজ পিছনে একজন আহত জওয়ানকে হত্যা করে পায়ে পায়ে এগুচ্ছে। আমাদের দুই এলএমজিওয়ালা কেঁদে কেঁদে বলছে 'আপনাদের ধরে ফেললো যে স্যার দাঁত খিঁচিয়ে আমরা বললাম বেটা ফায়ার কর। আমাদের উপর দিয়ে ফায়ার করতে হবে তাই আমাদের জওয়ানরা ইতস্ততঃ করছিল। শত্রু তখন আমাদের উপর চার্জ করে আর কি। সঙ্গে সঙ্গে এলএমজি গর্জে উঠলো। ছয় সাতটি খানসেনা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়লো। মকবুল আর তার সাথী দালালকে আমরা হাতে নাতে ধরে ফেললাম। দুইটি খানসেনা পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর আর্টিলারী ফায়ার এসে পড়তে লাগলো। বৃষ্টির মত আর্টিলারী ফায়ারের মাঝে মেজর আমিন আমাকে কাঁধে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পরিশ্রান্ত মেজর আমিন নিজেই আমাকে নিয়ে নালাতে পড়ে গেলেন, 'স্যার প্লীজ আপনি চলে যান, আবার বললাম। আর বৃষ্টির মত আর্টিলারী ফায়ারের মধ্যে হাবিলদার তাহের আমাকে কাঁধে নিয়ে দিল এক ভোঁ দৌড়। ভীষণভাবে হাপাচ্ছিল তাহের – হাপাতে হাপাতে বলছে 'স্যার চিন্তা করবেন না মরলে দুজন একসাথে মরব'। প্রেমিক শাহজাহান স্মৃতির মর্মর প্রস্তরে রেখে গেলেন তার প্রেমকাহিনী। আমি সম্রাট নই, নেই কোন সাম্রাজ্য যে তাজমহল গড়ব তবুও বলব পৃথিবীতে কোথাও যদি স্বর্গ থাকে, তা এখানে, তা এখানে এবং তা এখানেই।

নকশা বিওপি আক্রমণকালে যারা শহীদ বা নিখোঁজ হয়েছেন।

১।	১২৪০১৬০	হাবিলদার	নাসিরউদ্দিন
২।	৩৯৪৭৭৫৮	সিপাই	মোহাম্মদ আলী
৩।	৩৯৩৫৭৪১	ঐ	সিরাজুল হক

৪।	১৪৩৮২	লেফটেন্যান্ট না:	আবুল কালাম
৫।	১৪৩৮৪	ঐ	মো: ইউসুফ মিয়া
৬।	৩৯৪১৯৩৩	সিপাই	হুমায়ুন কবির
৭।	–	ঐ	মো: সুজা মিয়া
৮।	–	ঐ	শাহসুজ্জামান
৯।	–	ঐ	আবদুস সাত্তার
১০।	–	ঐ	ফয়েজ আহম্মদ
১১।	–	ঐ	আবদুস সালাম
১২।	–	ঐ	মো: হানিফ (এক্স ই পি আর)

৩১শে জুলাই ৭১ কামালপুর যুদ্ধে নিহত কিংবা নিখোঁজ তালিকা

ক্র:নং	আরবীনং	পদ	নাম	তারিখ	স্থান
১।		ক্যাপ্টেন	সালাউদ্দীন মমতাজ	৩১-৭-৭১	ময়মনসিংহ-কমলাপুর
২।	৩৯৪৭৫৮	সিপাই	মোহাম্মদ আলী	ঐ	ঐ
৩।	৩৯৩০০৬৮	লেন্স নায়েক	গোলাম মোস্তফা	ঐ	ঐ
৪।	এফএফ	সিপাই	মতিউর রহমান	ঐ	ঐ
৫।	এফএফ	সিপাই	রহিতুল্লাহ	ঐ	ঐ
৬।	এফএফ	সিপাই	আমিনুল ইসলাম	ঐ	ঐ
৭।	এফএফ	সিপাই	আবদুল লতিফ	ঐ	ঐ
৮।	এফএফ	সিপাই	রবিউল ইসলাম	ঐ	ঐ
৯।	এফএফ	সিপাই	রফিকুল ইসলাম	ঐ	ঐ
১০।	এফএফ	সিপাই	আবদুল ওয়াহাব	ঐ	ঐ
১১।	এফএফ	সিপাই	সদর উদ্দিন	ঐ	ঐ
১২।	৩৯৩৯০৬	ল্যান্স নায়েক	সিরাজুল ইসলাম	ঐ	ঐ
১৩।	এফএফ	সিপাই	আবদুস সালাম	ঐ	ঐ
১৪।	এফএফ	সিপাই	শদর উদ্দিন	ঐ	ঐ
১৫।	৩৯৩৯৪৭	সিপাই	ফজলুল হক	ঐ	ঐ
১৬।	এফএফ	সিপাই	আবদুস সামাদ	ঐ	ঐ

ক্র:নং	আরবীনং	পদ	নাম	তারিখ	স্থান
১৭।	এফএফ	সিপাই	জামাল হোসেন	ঐ	ঐ
১৮।	এফএফ	সিপাই	আবু ইসমাইল	ঐ	ঐ
১৯।	এফএফ	সিপাই	আব্দুস সালাম	ঐ	ঐ
২০।	৩৯৩২৫৫৭	সিপাই	সৈয়দ ফুল মিয়া	ঐ	ঐ
২১।	এফএফ	সিপাই	সতর উদ্দিন	ঐ	ঐ
২২।	৩৯৩৮৫২৯	সিপাই	হায়েত আলী	ঐ	ঐ
২৩।	৩৯৩৬২৪৬	সিপাই	আবদুস কুদ্দুস	ঐ	ঐ
২৪।	এফএফ	সিপাই	রবিউল আলম	ঐ	ঐ
২৫।	এফএফ	সিপাই	শাহজাহান আলী	ঐ	ঐ
২৬।	১৯৩০৬	সিপাই	মনসুর আলী	ঐ	ঐ
২৭।	১৫৭৩৯	সিপাই	মোস্তফা কামাল	ঐ	ঐ
২৮।	এফএফ	সিপাই	আনোয়ার হোসেন	ঐ	ঐ
২৯।	এফএফ	সিপাই	আবদুস ছোবহান	ঐ	ঐ

আমি কাদের সিদ্দিকী বলছি

'বিচিত্রা' কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুরুদ্ধ হয়েছি পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের মুহূর্তে আমার কি মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল সে বিষয়ে কিছু বলার জন্য। ষোলোই ডিসেম্বর যখন হানাদার বাহিনীর সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন ঠিক সেই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে অন্ততঃপক্ষে আট-ন'দিন পিছিয়ে যেতে হবে। সে কারণেই আমি ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ৭ই তারিখ থেকে শুরু করছি।

৬ই ডিসেম্বর যখন বেতার মারফত শুনতে পেলাম আমাদের মিত্রদেশ ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই মুহূর্ত থেকেই আমার মনের ভেতর যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের পরিকল্পনা চলতে থাকে। ৭ই ডিসেম্বর আমার বাহিনী কর্তৃক মুক্ত নিকরাইলে আমি একটি জনসভা করি। এই জনসভার পরই আমি ঠিক করে ফেলি, কি করে আমার পরবর্তী কার্যক্রম চালিয়ে যাব। আমি স্থির করে নিই, আমার ১৭ হাজার জোয়ানের মধ্যে ১২ হাজারকে ডিফেন্সে রেখে বাকী ৫ হাজার নিয়ে আমার অপারেশন চালিয়ে যাবো। সেইমত ১২ হাজার জোয়ানের কোম্পানী কমান্ডারদের ডেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিয়ে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান নিয়ে নিতে বলি।

ঐদিন রাতেই ওয়্যারলেসে মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সানত সিং (বাবাজী)-এর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আমাকে জানান যে, কামালপুরের (পাক বিওপি) ডিফেন্স উঠিয়ে পাকবাহিনী জামালপুরে দ্বিতীয় ডিফেন্স লাইন সৃষ্টি করে আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করছে। আমরা জামালপুর পর্যন্ত এসে গেছি কিন্তু ব্রহ্মপুত্র পার হতে পারছি না।

আপনি জামালপুরের দক্ষিণ দিক থেকে ওদের ওপর হামলা করুন; আমরা উত্তর দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করছি। – এই ম্যাসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পাঁচ হাজার জোয়ান নিয়ে জামালপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি এবং ধনবাড়ী পর্যন্ত অগ্রসরও হই। কিন্তু আমার পথচলার মধ্যেই আমার মনে অন্য এক পরিকল্পনা সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করতে থাকি। পরিশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ঢাকা থেকে জামালপুরে যাতে কোনো রিইনফোর্সমেন্ট না হতে পারে সেটা দেখাই সর্বাগ্রে জরুরী এবং এজন্যে আমার টাঙ্গাইল-জামালপুর, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ রোডে শারীরিক উপস্থিতি প্রয়োজন। তাছাড়া একটি ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে মিত্রবাহিনী যখন ফার্স্ট ডিফেন্স লাইন ব্রেক থ্রো করে সেকেন্ড ডিফেন্স লাইনে যুদ্ধ করছে তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা এটা ধরে নিতে পারি। মিত্রবাহিনীর মনোবল বিজয়ীর মানসিকতা সম্পন্ন এবং দুশমন বাহিনী পলায়নের পথ খোঁজার দিকেই বেশী তৎপর হবে। আমার অনুমান দুইদিনের মধ্যে বাস্তবে রূপ লাভ করল। জামালপুর পতনের জন্য সত্যি সত্যি আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজনও হয়নি। জামালপুরে দুশমনদের পাক্কা বাংকারের ওপর এক হাজার পাউন্ড ওজনের বোমা বর্ষণের ফলে উক্ত বাংকারগুলোর ৩৮টি বাংকারের জায়গা জুড়ে বিরাট পুকুরের সৃষ্টি হয়ে গেল। স্বভাবতই ভীত-সন্ত্রস্ত দুশমন ঢাকার দিকে পলায়নের চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠল। ব্যাপারটি আমি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম এবং আমি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্যই জামালপুরের দিকে অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেও দিক পরিবর্তন করি এবং ৯ তারিখে ব্রিগেডিয়ার সানত সিংকে আমার উপরোক্ত ডিসিশন জানিয়ে দেই তাঁকে আরো জানাই যে গোপালপুর থানা আমি দখল করতে যাচ্ছি; সেখানে আমাদের ১০/১১ তারিখে এয়ারকভার দরকার। ইতিমধ্যে আমি ঘাটাইল দখল করে ফেলতে পারব এবং গোপালপুরের দিকে মনোযোগ দিতে পারব। পরিকল্পনা মত আমরা ঘাটাইল থানার ঘাঁটির ওপর ১০ তারিখ বিকেলে হামলা করলাম এবং সেদিনটি ঘাটাইল থানা দখল করে নিই। এদিকে রাত ৩টার সময় পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার কাদের খানের রিট্রেটিং আর্মি কনভয়ের ওপর রাস্তার দুপাশ থেকে চড়াও হই; ঘাটাইলে বানিয়াপাড়া ব্রিজের ওপরে বেলেন্ডি সাইড দিয়ে শত্রুর ৭টি গাড়ী ফেলে দেই। বলাবাহুল্য, ইতিপূর্বে মধুপুর থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত পুরোপুরি রাস্তা আমাদের দখলে এসে গেছে। কথা ছিল ঐদিন সকাল ১০/১১টায় গোপালপুরে এয়ারকভার দেয়া হবে; আমার বাহিনীর যোদ্ধারা আমার কাছ থেকে সিগনাল পেয়ে উক্ত থানাটি ঘিরে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা, অপেক্ষা শুধু অপেক্ষা – আমার ছেলেদের হাত নিসপিস করছে। ট্রিগারে হাত রেখে ফায়ার না করে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়? ছেলেদের বার বার অনুরোধের মুখে আমি থানা আক্রমণ করার জন্যে সিগন্যাল পাঠিয়ে দেই। সোয়া ৩টা সাড়ে ৩টার দিকে গোপালপুরে শত্রু ঘাঁটির

ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে থানাটি মুক্ত করা হল। ঠিক ৪টার সময় ওয়্যারলেসে আমাকে জানানো হলো আপনার ওখানে প্যারাট্রুপারস নামবে এবং বিমান হামলাও করা হবে, আপনি একটু লক্ষ্য রাখবেন।

কিন্তু যে কারণেই হোক সেদিন আর মিত্রবাহিনীর প্যারাট্রুপারস নামেনি। ফলে, আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। কিন্তু তা খুবই সাময়িক। মিনিটকাল মধ্যেই আমি সিদ্ধান্ত নিই, যে করেই হোক ১১ই ডিসেম্বর আমি টাঙ্গাইলে উঠব। এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। পথিমধ্যে বহু জায়গায় আমার সঙ্গে পলায়নপর দুশমনের মোকাবিলা হয়। এদিকে আমি সবুরকে (কোম্পানী কমান্ডার) পূর্বাহ্নেই রেকী করার জন্যে পাঠিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমি অগ্রসরমান সবুরকে ধরতে পারব। পলায়নপর দুশমনকে ধাওয়া করতে করতে আমি অগ্রসর হচ্ছি। ইতিমধ্যে আমার কয়েক মাইল সামনে দুশমনদের কনভয়ের ওপর মিত্রবাহিনীর বিমান এয়ার স্টাটিং করে গেল। আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম এই কারণে যে সবুর, হাকিম, মোস্তফা, হাবীবের কোম্পানী সামনে আছে; ভুলক্রমে ওদের ওপর তো বিমান আক্রমণ হল না। আমার চিন্তার অবসান হল তখন যখন সিগন্যাল এলো, না ওদের ওপর হয়নি, বরং ওরা এলেঙ্গায় দুশমনের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালানোর ফলে দুশমনরা অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়ী ফেলে গ্রামের দিকে পালিয়ে গেছে। সবুররা ওদের পশ্চাৎধাবন করছে। ওদের আক্রমণের ফলে দুশমনদের ৪৮টি মত গাড়ী এবং প্রভূত পরিমাণ গোলাবারুদ, রেশন ও কাপড় আমাদের হস্তগত হয়। আমি পৌলি ব্রিজের ওপর পৌছার পরই খবর পেলাম বাংড়া কম্যুনিটি সেন্টারে মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার স্কের আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি কোম্পানী কমান্ডার খোকাকে নিশ্চিত হবার জন্যে পাঠিয়ে দেই। খোকা ফিরে আসে মিত্রবাহিনীর প্যারাট্রুপসের একজন অফিসারকে নিয়ে। অতঃপর পিছিয়ে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার স্কের সঙ্গে বাংড়ায় মিলিত হই। এবং তাঁকে ঐ জায়গায়ই অপেক্ষা করতে বলে একটি আর্মি জীপে করে টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হতে থাকি।

১২ তারিখ সারাদিন যুদ্ধের পর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়া দুশনদের বন্দী করে সন্ধ্যা ৬টায় টাঙ্গাইল নতুন জেলা শহরে উঠেই জানতে পারি ৩৫০ জন শত্রু সৈন্য আমার কাছে আত্মসমর্পণের অপেক্ষায় অবস্থান করছে। তারা জানিয়েছে আমার কাছে কিংবা মিত্রবাহিনীর কাছেই তারা আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক। ৬.৩০ টার দিকে সমগ্র টাঙ্গাইল জেলাব্যাপী ছড়ানো আমার বাহিনীর কোম্পানীগুলো থেকে অল ক্লিয়ার সিগন্যাল এসে পৌছায়। সন্ধ্যা ৭টায় বর্তমান আওয়ামী লীগ অফিসের বারান্দা থেকে শহরবাসীর করণীয় সম্পর্কে বক্তৃতা দিই। এদিকে, আগে থেকেই নিযুক্ত আমার ৫টি কোম্পানী ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডের কালিয়াকৈর পর্যন্ত ডিফেন্স

রোডে ইতিপূর্বে (১৯শে নভেম্বর) আমার বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত ১৭টি ব্রিজের ডাইভার্সনে এন্টি ট্যাংক মাইন ও এন্টিপার্সোন মাইন পোতা হয়েছিল। যার আঘাতে বহু শত্রুগাড়ী এবং সৈন্য ধ্বংস হয়েছে।

পরদিন (১৩ই ডিসেম্বর) সকাল সাতটায় ব্রিগেডিয়ার স্কেরকে ওয়াপদা ডাকবাংলোয় থাকতে জায়গা করে দিই। ইতিমধ্যে, আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই মিত্রবাহিনী আভাগার্দ গোড়াই পর্যন্ত পৌছে এবং আমার বাহিনীর একটা অংশ কালিয়াকৈর পর্যন্ত।

১৩ তারিখ বিকাল ৪টায় ফিল্ড-কমান্ডার মেজর জেনারেল নাগরা ওয়াপদা ডাকবাংলোতে এসে পৌছলেন। রাতে আমরা ৩জন বসে আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করে ফেলি। ১৪ তারিখ সকালে মৌচাকে সম্মিলিত বাহিনী জিএইচকিউ স্থাপন করা হয়। সকাল ৯.৩০টায় জীপে করে আমি মৌচাকে পৌছি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জেনারেল নাগরা ও ব্রিগেডিয়ার স্কের এক জীপে এবং আমি ও আমার ক'জন সঙ্গী অন্য জীপে একই সময় মৌচাকের দিকে রওয়ানা দিই। কিন্তু পথিমধ্যে মীর্জাপুরে অবস্থানরত আমার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে মিনিট পাঁচেক দেরী হয়, যার ফলে ওঁরা আগেই পৌছে যান। আমার গাড়ী পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল নাগরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমার গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ান। স্থানীয় লোকজন মিত্রবাহিনীর অধিনায়কদের এই বিনীত ব্যবহার দেখে আমাকে তাদের থেকে বড় অফিসার বলে ধরে নেয় এবং আমার কাছে এসে কাছেই গ্রামের ভেতর কিছু পলায়নপর দুশমনের সন্ধান দেয়। আমি উল্টো তখন তাদের বোঝাই যে ভারতীয় অফিসাররা পদের দিক থেকে অনেক বড় হলেও ব্যবহারে তা বুঝতে দেয় না। জেনারেল নাগরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, আমি পুরো ঘটনা তাঁকে বলি এবং আমার বাহিনীর কয়েকজনকে নিয়ে আমি সেদিকে যাই। কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর দুশমনরা আত্মসমর্পণ করে। এই দুশমন আর কেউ নয় স্বয়ং ব্রিগেডিয়ার কাদের খাঁ আর তার সঙ্গে বিভিন্ন র‍্যাংকের ১১ জন অফিসারসহ ২৭ জন সৈনিক। ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ শত্রুমুক্ত করে ব্রিগেডিয়ার সানত সিং আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। এবং মৌচাকেই ডেরা স্থাপন করেন। উল্লেখযোগ্য যে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যে ম্যাপটি ছিল তা ১৯৩৯ সালের তৈরি। সুতরাং ঐ ম্যাপে স্বাভাবিক কারণেই সাভারের রাস্তা দেখানো হয়নি। আমি ঐ রাস্তাটি সম্বন্ধে সানত সিংকে অবহিত করাতে তিনি তাঁর ব্রিগেড মৌচাক থেকে উইথড্র করে নবীনগরে নিয়ে আসেন।

১৪ তারিখ বিকেলে আমি জেনারেল নাগরা ও ব্রিগেডিয়ার স্কের উপস্থিতিতে টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী স্কুল প্রাঙ্গণে এক জনসভায় ভাষণ দিই।

১৫ তারিখে পলায়নপর পাকবাহিনী কড্ডা ব্রিজ ভেঙে দিয়ে ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। সিক্সথ বিহার রেজিমেন্ট ও আমার বাহিনী সম্মিলিতভাবে চৌরাস্তায় খানাপিনারত পাকবাহিনীকে ঘিরে ফেলে এবং এক স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের পর সবাইকে ধরে ফেলে। ঐদিন সন্ধ্যায় মিত্রবাহিনীর অসাধারণ বীরপুরুষ ব্রিগেডিয়ার সানত সিং সাভারে রক্ষী ক্যাম্পের কাছে এক প্রচন্ড যুদ্ধে অপূর্ব রণনৈপূণ্যের স্বাক্ষর রাখেন।

১৬ ডিসেম্বর। বাঙালী জাতির এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার দিন। এই দিনে কেউ মুক্তির আনন্দে আত্মহারা, আবার কেউবা আত্মীয় বিয়োগের খতিয়ান করতে গিয়ে শোকে মূহ্যমান। শোকসন্তপ্ত লোকের মনেও মুক্তির যে অবিনশ্বর আনন্দ সে আনন্দের ক্ষণিক প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে তার শোকের উপশম ঘটায়, আবার মুক্তিপাগল মানুষেরও মনে লাখো শহীদের জন্যে মনে একটা বেদনার ছায়াপাত হয়। কাজেই বলছিলাম, এই দিনটি বাঙালী জাতির কাছে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার দিন।

এইদিন সকাল ৮.৩০ মিনিটে জেনারেল নাগরাসহ হেলিকপ্টারে মৌচাকে সম্মিলিত বাহিনীর জিএইচকিউতে পৌছে সেখানে অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার ক্লেরকে নিয়ে মীরপুর ব্রীজের অনতিদূরে অবতরণ করি। এদিকে মীরপুর পর্যন্ত সম্মিলিত বাহিনী (স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত আমার আড়াই হাজার যোদ্ধাসহ) পূর্বাহ্নেই অবস্থান নিয়েছিল। মীরপুর পর্যন্ত পৌছানোর সংবাদ জেনারেল নাগরা স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে দিয়ে মুক্তিবাহিনীর বাবুলসহ মিত্রবাহিনীর একজন মেজরসহ কয়েকজনকে নিয়াজীর কাছে পাঠানো হল। কিছুক্ষণ পরেই বাবুল এই সংবাদ নিয়ে ফিরে এল যে মীরপুর ব্রিজের ওপারে পাকবাহিনীর মেজর জেনারেল জামশেদ কয়েকজন অফিসারসহ আমাদের গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছেন। সামান্য দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর আমার আগ্রহ দেখে জেনারেল নাগরা ও ব্রিগেডিয়ার ক্লের অগ্রসর হলেন। আমরা জামশেদের কাছাকাছি পৌছার অল্পক্ষণের মধ্যেই জেনারেল জামশেদ তার রিভলভারটি খুলে নত হয়ে জেনারেল নাগরার হাতে তুলে দেন এবং তার টুপিটি আমার হাতে তুলে দেন। আনুষ্ঠানিক না হলেও সকাল ১০টায় এই প্রথম পাকবাহিনীর টোকেন আত্মসমর্পণ পর্ব সংঘটিত হল এ আত্মসমর্পণের প্রতিটি অর্থের দিকে তাকিয়ে আমি সমগ্র মুক্তিবাহিনীর ও মিত্রবাহিনীর কৃতিত্বের জন্যেও গর্বিতবোধ করছিলাম এই জন্য যে আত্মসমর্পিত বাহিনীর শক্তি ভারতীয় বাহিনীর কাছে সমর্পিত এবং সম্মান মুক্তিবাহিনীর কাছে সমর্পিত। এবং আমরা জেনারেল জামশেদের সঙ্গে যখন জেনারেল নিয়াজীর অফিসের দিকে যাই তখনই পথিমধ্যে জেনারেল নাগরা এই ব্যাপারে আমার প্রতিক্রিয়া বার বার জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি তখন অনেকক্ষণের জন্য মূক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনের ভেতর নানা কথার ছোট-বড় ঢেউ ওঠাপড়া করছিল। আমি সেই মুহূর্ত থেকে অনেকক্ষণের

জন্যে ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তার খতিয়ান করছিলাম। এক এক মুহূর্তে আমার প্রতিটি লোমকূপে বিজয়ের আনন্দের শিহরণ জাগছিল, কখনো বা হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেদনার অনুভূতি আমাকে আপ্লুত করছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার দু'চোখ ফেটে প্রতিহিংসার আগুনে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিলো। আমার মনে হচ্ছিলো আত্মসমর্পণকারী এই যুদ্ধ অপরাধীদের ধূলোয় মিশিয়ে দিই। ১০টা থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত এই আধ ঘন্টার প্রতিটি অণুমুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দ্বারা গভীরভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই সময়টায় আমার কোনো বাহ্যজ্ঞান ছিল না বললেই চলে।

১০.৩০টা নাগাদ আমরা নিয়াজীর অফিস কামরায় পৌঁছি। নিয়াজীর চেয়ারের মুখোমুখি টেবিলের অপর পাশে তিনটি চেয়ার, ডাইনে এবং বায়ে দুটি চেয়ার রাখা ছিল। রুমে ঢুকেই সামনের তিনটি চেয়ার যথাক্রমে জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার ক্লের, বিগ্রেডিয়ার সানত সিং নিয়াজীর শূন্য চেয়ারের মুখোমুখি উপবেশন করলেন। আমি তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়াতেই ব্রিগেডিয়ার ক্লের তাড়াতাড়ি একটি চেয়ার টেনে আমাকে তাঁদের পাশাপাশি বসতে দেন। মিনিট দশেক পর জেনারেল নিয়াজী পরাস্ত এবং বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে এসে তাঁর আসন গ্রহণ করে। জেনারেল নাগরা নিয়াজীকে আমার নাম বলাতে সে বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত দাঁড়িয়ে সামান্য পিছিয়ে স্যালুট করে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। এই মুহূর্তে আমার মধ্যে এক সাংঘাতিক মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটে যেতে থাকে। যে হাত লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত, সেই অপবিত্র, ঘৃণ্য অপরাধীর সঙ্গে হাত মিলাতে আমার প্রবৃত্ত হচ্ছিল না। এদিকে নিয়াজী হাত বাড়িয়েই আছে। জেনারেল নাগরা বলছে, হাথ মেলাও, আভিতো ও দুশমন নেহি হায়, এক ইনসান কো সাথ হাথ মেলাও। – অগত্যা হাত মেলাতেই হলো।

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নিয়াজীর কামরা থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। আমি ঢাকা আগত আমার বাহিনীকে কিছু নির্দেশ দেয়ার জন্য জেনারেল নাগরাদের কাছ থেকে কয়েক ঘন্টার জন্য বিচ্ছিন্ন হলাম। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা বিকেল ৪.৩০টার দিকে ঢাকা এয়ারপোর্ট এসে পৌঁছবেন। সুতরাং তাঁকে রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে গেলাম। ৪.৪০ মিনিটের দিকে জেনারেল অরোরা সস্ত্রীক এসে পৌঁছলেন। জেনারেল অরোরার সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় আমার আরো দু'বার দেখা হয়েছে। ভিড় পেরুনোর পর আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি অত্যন্ত খুশী মেজাজে আমাকে বললেন, 'সিদ্দিকী তোম আগিয়া'।

রেসকোর্স ময়দান। বিকেল ৫টা। এই সেই ঐতিহাসিক ময়দান যেখান থেকে গত ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু উদাত্ত কণ্ঠে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে বলেছিলেন, 'এবারের

সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' – আর সেই আহ্বানে আমি ও প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালীর মতো সাড়া দিয়েছিলাম; তাঁর অনুপস্থিতেও তাঁর কণ্ঠ আমাকে নেতৃত্ব দিয়েছিল – সেই ময়দানেই বাঙালী জাতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। মিরপুরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামশেদ থেকে শুরু করে নিয়াজীর অফিস কামরা পর্যন্ত যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমার মনের ভেতরে ঘটে যাচ্ছিল সেই প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা এখন অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। যদিও বেদনার রেশ এখনো মনের নিভৃত কোণে রয়ে গেছে তবুও বিজয়ের আনন্দ আমাকে আপ্লুত করে তুলছে। যথা সময়ে ৫টা ৫মিনিটে আত্মসমর্পণ সম্পর্কিত দলিলে কম্পিত হস্তে নিয়াজী স্বাক্ষর করলেন এবং এই ঐতিহাসিক দলিলের সাক্ষ্যপত্রে প্রথম সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দান করার সময় বার বার আমি সেইসব শহীদদের সালাম জানাচ্ছিলাম, যাঁদের বুকের রক্তের বিনিময়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো।

সংগ্রামের এক প্রান্তর

মেজর জাফর ইমাম

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকের কথা। আমার কমান্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফের অধীনে সামান্য সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে ছাগলনাইয়া সেক্টরে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম। এ যুদ্ধ-বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি। সামান্য শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করেও আমরা শত্রুদের বড় রকমের তিনটি আক্রমণ প্রতিহত করি এবং বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে শত্রুরা হটে যেতে বাধ্য হলো। ছাগলনাইয়া সেক্টরের পতনের পর খালেদ মোশাররফ আমাকে হেড কোয়ার্টারে ডেকে পাঠান। তখন বিলোনীয়া সেক্টর রক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী দলের প্রয়োজন ছিল। তিনি আমাকে বিলোনীয়া সাব সেক্টরের ভার নিতে বলেন। এবং এজন্য তিনি আরও কিছু সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্র নেবার জন্য আমাকে আদেশ দেন।

৯ই মে আমি বিলোনীয়া সেক্টরের ভার নিলাম। ফেনী শহর তখন শত্রুদের কবলে এবং ওরা ফেনীতে ওদের ঘাঁটি বেশ মজবুত করেই গড়ে তুললো। কিন্তু তবুও ওরা প্রায় ১৭ মাইল দীর্ঘ বিলোনীয়ার পকেটে প্রবেশ করতে পারেনি। আমি প্রথম থেকেই ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। আমি মুন্সির হাটে আমাদের প্রধান ঘাঁটি গড়ে তুললাম। এই ডিফেন্স শহর থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরে ছিল। এবং এই সেক্টরের সম্মুখে যুদ্ধে পাক সেনাদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল। তাদের কাছে প্রথম থেকেই বিলোনীরা সেক্টর একটা ভয়ংকর জায়গা বলে পরিগণিত হলো। কিন্তু সবচেয়ে বেশী কষ্ট করতে হয়েছিল এলাকার গ্রামবাসীদের। তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বর্ণনা করা যায় না। নিরীহ আর অসহায় মানুষের ক্রন্দনে সে সময়কার পরিবেশকে করুণ আর বিষণ্ন করে তুলতো।

বিলোনীয়া সেক্টর পাকবাহিনীর অপারেশনাল ম্যাপে একটা ভয়ংকর রূপ নিয়ে দেখা দিল। কারণ প্রথম থেকেই ওরা যে ক্ষতি ও আঘাতের সাক্ষাৎ পেয়েছে তাতে এ সেক্টরকে ভয়ংকররূপে ভাবা বিচিত্র ছিল না। সৈন্য বদলের সময় সে সব সৈন্যরা এ সেক্টরের কাজে বদলী হয়ে আসার আগে দু'বার ভেবে দেখতো কারণ বিলোনীয়া সেক্টরের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তা ওদের অজানা ছিল না। এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরের সাথে তুলনা করে দেখা গিয়েছিল যে এ সেক্টরে ওরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এবং তারই জন্য এর গুরুত্ব ছিল তাদের কাছে অপরিসীম। অবশ্য এসব স্বীকারোক্তি ওদের অফিসার ও জোয়ানদের মুখেই শোনা। চিটাগাং এ যখন শত্রুরা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তখন তারাই এসব স্বীকার করেছিল।

১৭ই মে আমি মুন্সির হাটে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আমাদের প্রধান ডিফেন্স নিয়ে বসলাম। এমনকি কতকগুলো প্রাকৃতিক বাধা বলেই এ জায়গায় ডিফেন্স হিসাবে বেছে নিলাম। জায়গাটার সামনে এমন কতকগুলো প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি ছিল যাতে শত্রুদের এগিয়ে আসার কোন সুযোগ পাওয়ার পথ রইল না এবং শত্রুদের আরও ভালভাবে নাজেহাল করার জন্য আমরা বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই এবাধাগুলোকে আরও শক্তিশালী করে তুললাম। আমাদের বাংকারগুলো এমন মজবুত করে তৈরী করা হলো যাতে সেলিং এ কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমাদের এই ডিফেন্সটি মুহুরী নদীর পাশ ঘেঁষে পশ্চিম দিক থেকে ছিলনীয়া নদী ছাড়িয়ে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে এবং কমপক্ষে এটা প্রায় চার মাইলের মত লম্বা ছিল। আমাদের অধীনের মুক্তিফৌজ দলটি ৪ জন কমিশন অফিসার এবং ১২শ ফৌজ নিয়ে গঠিত। ৮শ ছিল নিয়মিত বাহিনীর আর ৪শ ছিল ফরোয়ার্ড মুক্তিযোদ্ধা। এছাড়া অসংখ্য সহযোগী বাহিনী।

আমাদের তুলনায় অনেক শক্তিশালী অস্ত্র ও গোলাবারুদ এমনকি তারা স্পীড বোট ও বিমানের সাহায্য নিয়েও দুর্ভাগ্যবশত বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সংখ্যার দিক দিয়েও তারা ছিল প্রায় আমাদের ৫ গুণ। বিলোনীয়া সেক্টরটির সে সময়কার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং উল্লেখযোগ্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। বহু রিপোর্টার এই সেক্টরের ছবি তোলার জন্য বেশ আগ্রহ নিয়ে থাকতো। তাদের তোলা যুদ্ধের অনেক ছবি বিদেশী টেলিভিশনে দেখানো হয়েছিল এবং এগুলো বিদেশী মহলে বেশ সমাদর পেয়েছিল।

আমাদের অবস্থিতি সম্পর্কে শত্রুদের ধোঁকা দেয়ার জন্য আমরা আমাদের প্রধান ঘাঁটির ঠিক সম্মুখে বন্ধুরা রেলস্টেশনের কাছে ছিলনীয়া নদীর পাশের আরেকটি ঘাঁটি বসালাম। সামরিক ভাষায় এটাকে ডিলেইং পজিশন বলা হয়। আসলে আমরা

ঠিক কোথায় আছি তা যাতে শত্রুরা নিশ্চিত হতে না পারে সেই জন্যই এই ডিলেইং পজিশন এর মাধ্যমে তাদের ধোঁকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। এই পজিশন-এ যারা ছিল তারা তাদের সম্মুখের রেল, সেতু প্রভৃতি নষ্ট করে দিয়ে শত্রুদের আসার পথকে আরও কষ্টকর করে তুলেছিল।

৭ই জুন সকাল। শত্রুরা প্রথমবারের মত আমাদের ডিলেইং পজিশনের উপর এসএ ৮১এমএম চালালো। অনবরত বৃষ্টির মত শেলিং হতে লাগলো। সারাদিন চলে গেল। রাত গেল। পরদিন সকালে ওরা আক্রমণ আরও জোরদার করলো এই পজিশন আমাদের প্রধান ডিফেন্স থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে ছিল। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে ওদের সাথেই শত্রুরা মোকাবেলা করলো।

ডিলেইং পজিশন-এর উপর যখন আক্রমণের মাত্রা বাড়াতে লাগলো তখন তারা পিছু হটে আমাদের প্রধান ডিফেন্স-এ আশ্রয় নিল। কিন্তু তারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুতি নিতে প্রচুর সময় দিয়েছিল। ৮ই জুনের সকাল ৮টা ৩০মিনিটে শত্রুরা ছিলনীয়া নদী পার হবার জন্য প্রস্তুত হলো। ওদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের প্রধান ডিফেন্স-এর সাথে মোকাবেলা করা। আমরা আগে থেকেই সব টের পেয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। যখন ওরা ছিলনীয়া নদী পার হচ্ছিল আমরা ঠিক তখনই ওদের ওপর ৮১এমএম এবং ২"X৩" মর্টার দিয়ে আক্রমণ চালালাম। ওদের দলের বিপুল সংখ্যক সৈন্য এ আক্রমণে মারা পড়তে লাগলো। কিন্তু তবুও এসব বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে ওরা অগ্রগতি অব্যাহত রাখলো।

ঠিক ৯.৩০ মিনিটে শত্রুরা আমাদের প্রধান ঘাঁটি থেকে ৮০০ গজ দূরে আনন্দপুর গ্রামের পশ্চিমে এসে হাজির হলো। তখনি আমাদের উপর আর্টিলারী ফায়ার শুরু হলো। বৃষ্টির মত শেলিং হতে লাগলো। মাথা উঁচু করে তাকাবার সুযোগ হচ্ছিল না আমাদের। এ আকস্মিক আক্রমণ চালানোর আমরা যাতে ওদের উপর ঠিকভাবে ফায়ার করতে না পারি এবং এ অবসরে ওরা এগিয়ে আসবে। ওরা এ আক্রমণ দ্বারা আমাদের ঘাঁটির বেশ ক্ষতি করতে সক্ষম হলো। আসলে চেয়েছিল আমরা যাতে মানসিক দিক দিয়েও দুর্বল হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের জোয়ানদের মনোবল ছিল প্রচুর। ওরা এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না।

যাহোক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমি আমার জুনিয়র অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করলাম। ওদের সকল দিক থেকে প্রস্তুত থাকার জন্য আমি নির্দেশ দিলাম। বেলা ১১টায় এই আর্টিলারী ফায়ার বন্ধ হলো। এবং ওদের এগিয়ে আসার সাহায্যে ওদের স্থায়ী ঘাঁটি ফেনী থেকে যে আর্টিলারী ফায়ার ৯.৩০ মিনিটে শুরু হয়েছিল তা বিফল গেল না। ফায়ার থামার পর দেখা গেল ওরা আমাদের ঘাঁটি থেকে ৫০০ গজ দূরে এসে গেছে। আমরা স্পষ্টই ওদের দেখতে পাচ্ছিলাম। যুদ্ধের সে

সময়ের পরিবেশ সাধারণ মানুষের বুঝবার বাইরে ছিল। আমি আমার জোয়ানদের মনোবল না হারিয়ে প্রস্তুত হতে আদেশ দিলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে হয়তো অতি অল্প সময়ের মধ্যে ওদের সাথে আমাদের একটা ভয়ংকর খেলা খেলতে হবে। বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে ওরা এগিয়ে আসছে আমি আমাদের জোয়ানদের নির্দেশ দিলাম যেন ওরা যতক্ষণ ২০০ গজের মধ্যে না আসে ততোক্ষণ যেন কোন ফায়ার না করা হয়।

ওরা আস্তে আস্তে সতর্কভাবে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমরা প্রহর গুনছি। আমরা চাইলাম ওরা আরো এগিয়ে আসুক তারপর আমাদের এ্যাকশন শুরু হবে। আমরা চুপচাপ চেয়ে আছি। ওরা আমাদের চুপচাপ দেখে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলো। যেন আমাদের অবস্থান সম্পর্কে ওরা সন্দিহান হয়ে পড়লো। হয়তো বা ভাবলো আমরা পিছু হটে যাচ্ছি। তবু ওরা এগিয়ে আসতেই লাগলো। সহসা আমি দেখতে পেলাম একটা রকেট লাঞ্চার দল একটা গাছকে আড়াল করে এগিয়ে এসে আমার বাংকার লক্ষ্য করে ফায়ার করলো। রকেট বোমাটা আমার বাংকারের মাত্র (৮"X১") উপর দিয়ে ছুটে গেল। বাংকারের কোন ক্ষতি হলো না। কিন্তু বোমাটা বাংকারের ৫০ গজ দূরে পুকুরের পিছনের টিনের ঘরটায় যেয়ে পড়লো। দূর্ভাগ্যবশত সে ঘরেই আমাদের পুরানো হাবিলদার নূরুল ইসলাম রাত্রের পেট্রোলিং সেরে তার সঙ্গীদের নিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। ব্যাপারটা আমার অজ্ঞাত ছিল। নূরুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই মারা যায়। তাঁর সঙ্গীরা সবাই কমবেশী আহত হয়েছিল। তাদের চিকিৎসার জন্য আরএপি-তে পাঠানো হলো। ইসলামের মত সাহসী লোকের মৃত্যু সে সময় পুরো সেন্টারের জন্যে অপূরণীয় ক্ষতি বলে ধরা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি আরো দ্রুততর হলো। শত্রুরা আমাদের সামনের ২০০ গজ লম্বা মাইন ফিল্ডের ঠিক মুখে এসে পড়লো। তারা বেশ দক্ষতার সাথে মাইনের তার বাঁচিয়ে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ভাগ্য ওদের সত্যিই খারাপ ছিল। ঠিক সেই সময়ই অধিকাংশ মাইন ফাটতে লাগলো, ওদের কেউ কেউ মাইনের আঘাতে আমাদের চোখের সামনে তুলোর মত উড়ে গেল আমরাও ঠিক সে সময় ফায়ার আরম্ভ করলাম।

বৃষ্টির মত ফায়ার ও মাইনের ওপর দিয়েই কেউ কেউ এগিয়ে আসতে লাগলো। কয়েকজন শত্রু আমাদের বাংকারের মুখে এসে হাজির হলো। আমরা গ্রেনেড ব্যবহার করলাম। অনবরত ফায়ারের মুখে ওরা আর টিকতে পারছিল না। শত্রুরা আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগলো। এবার সরাসরি ওদের পলায়মান দলের ওপর মর্টার আক্রমণ শুরু করলাম। তখন আমাদের থেকে মাত্র ৩০০-৪০০ গজ দূরে

ছিল শত্রু অবস্থান। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে দেখে আমাদের জোয়ানরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো। তখন আশেপাশের গায়ের মানুষ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। মুখোমুখী যুদ্ধে ওরা কোন পক্ষেরই প্রকৃত অবস্থান বুঝতে পারছিল না। শুধু ফায়ারের শব্দে ওরা ভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে যাচ্ছিল।

শত্রু ঘাঁটি আরো পিছু হটলো। এবং তখনি ওদের প্রধান ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর আর্টিলারী ফায়ার শুরু হলো। এ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিভ্রান্ত করা যাতে আমরা ওদের পলায়মান দলের উপর সরাসরি ফায়ার না করতে পারি এবং এ অবসরে ওরা নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে।

যাহোক বেলা দেড়টা ওরা ওদের নির্ধারিত জায়গা আনন্দপুরের পূর্ব-পশ্চিমে যেয়ে হাজির হলো। ইতিমধ্যে আর্টিলারী ফায়ারও বন্ধ হলো। আমরা ভেবেছিলেন ওরা দ্বিতীয় দফা আক্রমণ করতে আসবেই এবং সে অনুযায়ী আমরা প্রস্তুত হতে লাগলাম। এবং সর্বদা সজাগ ছিলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম প্রথম বারের আক্রমণে ওরা সুবিধা করতে না পেরে এবারে আক্রমণ আরও জোরদার করবে। খবর পেলাম ওরা আরও সৈন্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ আনছে এমন কি ট্যাংকও।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়তে লাগলো কিন্তু ওদের তরফ থেকে দ্বিতীয় বার কোন আক্রমণ হলো না। একটু পরে আমার কমান্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে জানালেন যে আজ রাতেই শত্রুরা আক্রমণ চালাতে পারে। আমরা তার জন্য যেন প্রস্তুত থাকি। আমরা পূর্ব থেকেই আরও সতর্ক রইলাম। সারারাত জেগে কাটালাম কিন্তু রাত্রির মত হামলা আর হলো না।

৭ই জুনের সকাল। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে ওরা আনন্দপুরে স্থায়ী ঘাঁটি করার জন্য বাংকার খোঁড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এবং অনবরত ওরা আমাদের ওপর মর্টার এবং এসএমজি-এর ফায়ার করতে লাগলো। এতে আমাদের চলাফেরার খুবই অসুবিধা হয়ে দাঁড়ালো। সেদিনের পরদিন আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য রসদ সবই ফুরিয়ে যেতে লাগলো। এ সময় শত্রু ও আমাদের ডিফেন্স-এর ব্যবধান মাত্র ৩০০ গজ। দুই ঘাঁটির মধ্যে প্রতিদিন চলছে গোলাগুলি। একে অপরের চলাফেরায় খুব লক্ষ্য রাখতো। তাই যখন কেউ বিপরীত দলের কাউকে দেখতো ফায়ার করতে বিলম্ব করতো না। দু'পক্ষে ফায়ার চলাকালীন ওদের দুটি বাংকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল এবং আমাদের ১০৬ আরআর-এর সরাসরি আঘাতে ওদের সে দুটো বাংকার ধ্বংস হয়েছিল।

আসলে সেদিন থেকেই সে এলাকাটা প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। আমরা তখন বিলোনীয়ার দিকে গতিয়া নালার উত্তর পাশে এবং শত্রুরা আমাদের মাত্র ৮০০ গজ দূরে ফেনীর দিকে নালার দক্ষিণে। শত্রুরা প্রায় প্রতিদিনই আমাদের

উপর আর্টিলারী ফায়ার চালাতো। কিন্তু আমাদের বীর বঙ্গশার্দুলরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা এ গোলাগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রেও বাজনার মতই মনে করতো।

১৭ই জুলাই পর্যন্ত এভাবেই চললো। এদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং রকম-সকম দেখে সে এলাকার জনমনে নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার হলো। ওরা বুঝতে পারলো যে যেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে তাতে হয়তো তাদের বাড়িঘরের চিহ্নও থাকবে না। প্রথম বারের আক্রমণে যদিও তেমন ক্ষতি হয়নি তবুও প্রত্যক্ষ দেখা সে যুদ্ধের বিভীষিকা ওদের মন থেকে মুছে যায়নি। তাছাড়া তখন পালিয়ে যাওয়াটাও তেমন নিরাপদ ছিল না। কারণ একে তো ভরা বর্ষাকাল তখন, খাল-বিল, নদী-নালা সব পানিতে ভরপুর। পানি ভেঙে ছেলেমেয়ে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়া অনেকেরই ভাগ্যে কুলালো না। তাছাড়া শত্রুদের আচমকা আর্টিলারী ফায়ারের ভয়ও ছিল তারচেয়ে বেশী। তাই ওরা মনের দিক দিয়ে সত্যিই ভেঙে পড়লো। আমরাও বুঝেছিলাম যুদ্ধের মোকাবিলা শুরু হলে জনসাধারণ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা ওদের নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। তবুও কেউ কেউ স্বইচ্ছায়, কেউ বা নিরুপায় হয়ে বিপদের মাঝেই রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শত্রুরা নিজেদের আরো শক্তিশালী করে তুলতে লাগলো। শত্রুরা যাতে সামনের দিক থেকে সরাসরি আমাদের অবস্থানের দিকে আসতে না পারে, তার জন্য আমরা সম্ভাব্য সকল পথেই মাইন বসালাম।
১৭ই জুলাই। রাত ৮টা। আমাদের উপর শত্রুরা আবার আক্রমণ চালালো প্রায় আটঘন্টা পর আমরা গুলি চালালাম। তিনটা হেলিকপ্টার আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল পিছনের দিকে। আমরা ভাবলাম আমাদের নার্ভাস করার জন্য হয়তো ভয় দেখাচ্ছে। আঁধার রাত। চারদিক অন্ধকার হয়ে আছে। একটু একটু বৃষ্টি ঝরছে। নিকষকালো আকাশে ওদের হেলিকপ্টারগুলো যেন দৈত্যের মত দেখাতে লাগলো।

ওরা হেলিকপ্টার দিয়ে আমাদের ঘাঁটির পেছনেই ছত্রীবাহিনী নামালো। আমরা শত্রুদের গতিবিধি জানার জন্য যে দলটিকে খবরের জন্য পাঠিয়েছিলাম তারা জানালো শত্রুরা মুহুরী ও ছিলনীয়া নদী দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের সামনে আনন্দপুরে ওদের যে ঘাঁটি ছিল তারাও ট্যাংক নিয়ে তৈরী হয়ে রইলো। আর পিছনে ছত্রীবাহিনী ওঁত পেতে আছে। শুধু সময়ের অপেক্ষায় আছে। অপরপক্ষে তাদের তুলনায় আমরা সামান্য সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে মোকাবিলায় প্রস্তুত। সামনে পিছনে এবং পাশে শত্রুরা এগিয়ে আসছে আমাদের ঘিরে ফেলতে। আমাদের এত

সামান্য শক্তি নিয়েও আমরা মনোবল অটুট রাখলাম ওদের সাথে লড়বার। এটা ছিল আমাদের জন্যে একটা চরম ক্ষণ।

এগিয়ে ওরা আসছে আমাদের ঘিরে ফেলতে। তদুপরি ওদের বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদের সাথে মোকাবিলা করার মত অস্ত্রও আমাদের নেই। আর অন্যদিকে এলাকার অসহায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশা। সব মিলে আমার তখন কি করা উচিত তা ধীর স্থির হয়ে ভাবার সময়ও কম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের জন্য চরম সময় আছে। আমি আমার অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করলাম তাঁরা জানালেন, সবাই প্রস্তুত।

রাত ৯.৩০ মিনিট। টিপটিপ বৃষ্টি নামলো। অন্ধকার রাত। দূরে কোথাও যেন কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল। সেটা ডাক না কান্না কিছুই বুঝতে পারছিলাম না সব মিলে সেটা ছিল একটা বিভীষিকাময় রাত। অসহায় মানুষের ক্রন্দন আর চিৎকারে সে রাত আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পারলাম ভোর হবার আগেই ওরা আমাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করাতে চেষ্টা চালাবে। কারণ ওরা যেভাবে আমাদের ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে তাতে এছাড়া ওদের কোন সহজ পথ আর নেই। আর আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারবো না সেটাতো ঠিক করাই ছিল। আমাদের সামনে একটা পথ সেটা হচ্ছে মৃত্যু। এ সামান্য অস্ত্র নিয়ে ওদের সাথে মোকাবিলা করা বোকামিই। আমার পিছনের ডিফেন্স-এ ছিল ক্যাপ্টেন গাফফার (এখন মেজর)। সে আমাকে জানালো শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আমিও তখন ট্যাংকের শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম ফেনী থেকে আরো ট্যাংক আসছে। ঠিক রাত এগারটার সময় আমার বামপাশের ডিফেন্স থেকে লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান জানালো শত্রুরা তার খুব কাছে এসে গেছে এবং অল্প কিছুক্ষণ পরে তার বের হবার পথও আর থাকবে না। আমি টেলিফোনে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফকে গোটা পরিস্থিতি জানালাম। তিনি আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে শত্রু ছত্রীবাহিনী আমাদের পিছনে মর্টার পজিশন-এর উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে। চারিদিক থেকে একটা প্রবল ভয়ঙ্কর চাপ অনুভব করছিলাম। ভীষণ গোলাগুলির আওয়াজ চারিদিকে। আমি আবার যুদ্ধের পরিস্থিতি কর্নেল খালেদকে জানালাম উনি আমাকে চিতলীয়াতে পরবর্তী ঘাঁটি করার নির্দেশ দেন। চিতলীয়া আমাদের বর্তমান পজিশন থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার পিছনে ছিল।

অন্যান্য জুনিয়র অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করার পর সবাই জানালো যে এখনও যে সব গোপন পথ আছে তাতে আমরা পরবর্তী ঘাঁটি চিতলীয়ায় পৌছে যেতে পারবো। তারা সবাই আমার সিদ্ধান্ত জানার জন্য অধৈর্য্য হয়ে পড়লো।

কারণ এত অল্প শক্তি নিয়ে ওদের ট্যাংক আর বিপুল বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করা তখন বোকামির সামিল হতো। পরবর্তী ঘাঁটি চিতলীয়া যাওয়ার নির্দেশ টেলিফোনে সবাইকে জানিয়ে দিলাম। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ যোগাযোগের অভাবে আমার একজন অফিসারকে তা জানানো সম্ভব হলো না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সে শত্রুদের সাথে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে আমাদের পরবর্তী ঘাঁটিতে পৌঁছতে পেরেছে। রাত ১টা। অন্ধকার রাত। চারিদিক শুধু পানি আর পানি। তার মাঝ দিয়ে ঝোঁপঝাড় আর কাদা ভেঙ্গে আমরা চিতলীয়ায় আমাদের পরবর্তী ঘাঁটি পথে পৌঁছলাম।

আমাদের যুদ্ধের তখন ছিল প্রাথমিক অবস্থা। সৈন্য, অস্ত্র, গোলা-বারুদ কোন কিছুই আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিলনা। আমাদের তখনকার যুদ্ধের নীতি ছিল শত্রুদের ব্যতিব্যস্ত রেখে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হওয়া এবং নিজেদেরকে আরও সংগঠিত করে তোলা। অঙ্কুরেই ধ্বংস হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে ওদের ছিল অগণিত সৈন্য, অস্ত্র, আর গোলাবারুদ। আমাদের নিয়মিত বাহিনীর সৈনিক এবং সদ্য ও স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত জোয়ানেরা নিজেও তাদের ৫ ভাগের ১ ভাগও আমরা হতে পারিনি। আমাদের একজন সৈনিকের জীবনের মূল্য ছিল সেদিন অপরিসীম। আমাদের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১২ই নভেম্বর শত্রুদের বিলোনীয়া পকেট থেকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করি। পরবর্তী পর্যায়ে সে কাহিনী লিখবো।

৬ই ডিসেম্বর। কে-ফোর্সের ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট মিত্রবাহিনীর ৮৩ ব্রিগেডের সঙ্গে ফেনী শহর মুক্ত করে। ৭ তারিখে এই ১০ম বেঙ্গল ও মিত্রবাহিনী পুরোপুরি নোয়াখালী মুক্ত করতে সক্ষম হয়। ৮ই ডিসেম্বর কে-ফোর্সের ১৯ম বেঙ্গল ও ৪র্থ বেঙ্গল এবং মিত্রবাহিনী সম্মিলিতভাবে চিটাগাং অভিমুখে অগ্রসর হয়। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ১০ম বেঙ্গল ও ৩১ জাট রেজিমেন্ট চিটাগাং-এর অনতিদূরে কুমিরা এসে হাজির হলে শত্রুদের সাথে মোকাবিলার অবতীর্ণ হয়। ১৫ই ডিসেম্বর কে-ফোর্সের সাহসী ও বীর জোয়ানেরা মিত্রবাহিনীর সঙ্গে শহরে প্রবেশ করে।

মহানাটকের শেষ অঙ্ক

আবদুল হক

দোদুল্যমান অনিশ্চয়তার মধ্যে ষোলই ডিসেম্বরের ভোর হলো। ঢাকার সরকারী বেসরকারী সকল ভবন থেকে পাকিস্তানী পতাকা উধাও। হিংস্র দাপাদাপির পর এতদিনে দানবটি নিস্তেজ হয়ে আসছে। সে অবরুদ্ধ, আহত, রক্তাপ্লুত। সে কাঁপছে, সে ভূলুণ্ঠিত হবে। চারদিকে তার অভ্রান্ত লক্ষণ। কিন্তু একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে হিংস্র সাইক্লোনের পূর্বাভাসের মতো একখন্ড কালো মেঘ দ্রুত ঘনীভূত হয়ে চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিল। এহিয়ার তাসের ঘর বিধ্বস্ত। দু'দিন আগে নিপুণ ভারতীয় বোমারু লাটভবনের ছাদ উড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের দৃঢ় ধারণা ঐ বোমারু বিমানের পাইলট ছিলেন বাঙালী, নইলে ভারতীয় পাইলটের পক্ষে এরূপ নির্ভুল লক্ষ্যভেদ সম্ভব নয়। ডাক্তার মালিক বাঙ্কারে বসে থেকেই কাঁপতে কাঁপতে ইস্তফাপত্র লিখে দিয়েছেন। এখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্ট্যালে আশ্রিত। তাঁর মন্ত্রিসভা, চীফ সেক্রেটারী, আইজি এবং বহু উচ্চপদস্থ অফিসার স্ব স্ব পদে ইস্তফা দিয়ে একই তীর্থে সমবেত। বাংলাদেশে এখন কোনো সরকার কোনো প্রশাসন নেই। ঘটনা আরও গড়িয়েছে। বাঙালী দমনেই যাদের আনন্দ, সেই পরাক্রান্ত পাকিস্তান বাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার, একজন কর্নেল এবং বহু অফিসার নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঐ হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে।

সাতই ডিসেম্বর থেকে আকাশবাণী পাকিস্তানী সেনাদের প্রতি জেনারেল মানেকশ'র আহ্বান প্রচার করছেঃ অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করো। সুন্দরবনের দিকে গিয়ে লাভ নেই – তোমরা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। পাকিস্তান থেকে তোমাদের সাহায্য আসার কোন পথ নেই। মুক্তিবাহিনী তোমাদের ঘিরে আছে; তারা তোমাদের হত্যা করার জন্য

তৈরী। নিজেদের পরিবারের কাছে কি ফিরে যেতে চাও? তাহলে অস্ত্র ফেলে দাও। ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করো।

বারোই ডিসেম্বরের দিকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফরমান আলী জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জানিয়েছিল, যদি পাকিস্তানী সৈন্যদের নিরাপদে অপসারণের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। কিন্তু এহিয়া তার এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। জেনারেল নিয়াজী সদম্ভে জানিয়েছিল, পাকিস্তান বাহিনী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে প্রাণ দেবে তবু আত্মসমর্পণ করবে না। কিন্তু একই সঙ্গে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে তাদের এই ইচ্ছাও ব্যক্ত হয়েছিল – যুদ্ধ করে তারা বন্দী হতে রাজী, তবে ভারতীয় সেনাদের কাছে। চিরশত্রু ভারতীয় সেনা – যাদের বিরুদ্ধে এই সেদিন তারা যুদ্ধ ঘোষণা করলো তাদের কাছে বরং তারা বন্দী হতে রাজী, তবু মুক্তিবাহিনীর কাছে নয়। এই ক'মাসে মুক্তিবাহিনীকে এতই তাদের ভয়।

পঁচিশে মার্চ রাত্রে গণহত্যা আরম্ভ হওয়ার পর ঢাকার খবরের কাগজে নিয়াজীর নামের সঙ্গে 'টাইগার' বিশেষণটি ব্যবহার করা হতো। সেই টাইগার নিয়াজী গতকাল আমেরিকান দূতাবাসের মারফত জেনারেল মানেকশ'র কাছে সময় চেয়েছে, আবেদন জানিয়েছে যুদ্ধ বিরতি জন্য। মানেকশ' ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থেকে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নটা পর্যন্ত ঢাকায় বিমান আক্রমণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন – এর মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অন্যথায় নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হলেই ভারতীয় বিমানবাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে আবার আক্রমণ শুরু করবে। সাড়ে নটার খবরে জানা গেল, সোয়া নটা পর্যন্ত আত্মসমর্পণের কোনো বার্তা আকাশবাণীর কাছে পৌছেনি।

পাকিস্তান বাহিনী কি তাহলে আত্মসমর্পণ করবে না? আবার আত্মসম্মানে লাগলো? তারা কি তাহলে সত্যি 'শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ' করতে তৈরী?

আত্মসমর্পণ না করলে সাড়ে নটার পরে আবার ভারতীয় বিমান আক্রমণ হওয়ার কথা। সেই সঙ্গে স্থলবাহিনীর আক্রমণ। মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী এখন ঢাকার উপকণ্ঠে। যে কোনো সময় পাকিস্তানীদের প্রধানতম ঘাঁটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকা আক্রমণ করতে পারে। প্রথম থেকেই প্রধানতঃ ও দিকেই ভারতীয় বিমান আক্রমণ চলেছে। ঢাকা বিমানবন্দর বিধ্বস্ত। ঐ এলাকায় টিকতে না পেরে অনেক পাকিস্তানী সৈন্য লালবাগের দিকে অসামরিক এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে – সেখানেও ভারতীয় বিমান আক্রমণ চালিয়েছে। বিমান আক্রমণের সময় ছেলেরা আশ্রয়ের দিকে না ছুটে ছাদে গিয়ে তামাসা দেখেছে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হবে না। দু'দিন থেকে ঢাকার চারপাশে কামানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে – যুদ্ধ বিরতির

সময় উত্তীর্ণ হলেই চারদিক থেকে মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী ঢাকা আক্রমণ করবে, পথে পথে অলিতে গলিতে বাড়ীতে বাড়ীতে যুদ্ধ চলবে। ঢাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত – মানেকশ' যে সময় দিয়েছিলেন তা উত্তীর্ণ, কিন্তু এগারোটা বাজলো বারোটা বাজলো সে রকম কিছুই ঘটলো না। কে যেন বললো টিকাটুলির দিক দিয়ে মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী বিনা বাধায় শহরে প্রবেশ করছে – কিন্তু যুদ্ধের সময় অমন কতো রকম খবরই তো রটে।

ঢাকার মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়ছিল – পাকিস্তান বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করতে যাচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কখন, কীভাবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক কী ঘটবে, বোঝা যাচ্ছিল না। এই উৎকণ্ঠাকে দ্রুত চরমে দিকে নিয়ে যাচ্ছিল আরেকটি ঘঠনা – খবর পাওয়া গেল মার্কিন ৭ম নৌবহরের আণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ' খুব উদ্যম দেখিয়ে সঙ্গে যুদ্ধ জাহাজ এবং এক স্কোয়াড্রন বিমান নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে চট্টগ্রামের দিকে আসছে। ভারত সতর্ক করে দিয়েছে, কিন্তু তাকে কর্ণপাত করেনি। কয়েকজন আমেরিকান সিনেটর এবং আমেরিকান ও অন্যান্য দেশীয় সংবাদপত্র সমালোচনা করেছে, কিন্তু নৌবহর অর্থাৎ আমেরিকান সরকার সেকথা শুনবেন কেন? একজন দু'জন না, ঢাকায় চল্লিশ পঞ্চাশজন আমেরিকান আছেন, ঢাকায় হাতাহাতি যুদ্ধ হলে এঁরা মারা পড়বেন না? লাখ লাখ বাঙালী মরেছে তা বলে এঁদেরও মরতে হবে? চারদিন আগে ঢাকায় বিমান যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে বৃটিশ রাজকীয় বিমানে করে কয়েক শো বিদেশী নাগরিক অপসারণ করা হয়েছিল, কিন্তু তখন আমেরিকানরা যেতে চায়নি। দু'দিন পরে নিজেদেরই নৌবহর আসছে হয়তো টের পেয়েছিল তখনই।

অনুমান করা হচ্ছিল, চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকূলে কোথাযও খানিকটা জায়গা দখল করে নৌবহর অপেক্ষা করবে, নৌবহরে অনেক হেলিকপ্টার আছে, সেইসব হেলিকপ্টার ঢাকায় এসে আমেরিকানদের নিয়ে যাবে। তাদের অনেক লটবহর। ঢাকা এখনও আইনতঃ পাকিস্তানীদের দখলে, কাজেই ঐ হেলিকপ্টারগুলিতে করে কে যাচ্ছে আর কি যাচ্ছে কে দেখে। হয়তো ঝামেলা না বাড়িয়ে ভারত চুপ করে থাকবে। নৌবহর যেখানে ভিড়বে সেখানে যতটা সম্ভব পাকিস্তানী সৈন্য, অফিসার ও কর্মচারী এবং বিশিষ্ট পাকিস্তানী নাগরিকদের সমবেত করার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়েছে। বিপন্ন বন্ধুদের এভাবে উদ্ধারের সময় কোনো আমেরিকান নাগরিক অথবা নৌবহরের গায়ে একটু আঁচড় লাগলে হয়, তারপর দেখা যাবে কার বাপের সাধ্যি ঐ জায়গা থেকে আমেরিকাকে বেদখল করে। নৌবহর তো আর বেআইনীভাবে আসছে না, পূর্ব পাকিস্তানের আসল মালিক পাকিস্তানের অনুরোধেই আসছে। এতে কার বাপের কী বলার আছে।

বিকেলে দেখা গেল ঢাকার উত্তর পূর্ব দিক থেকে আকাশ কালো করে এক ঝাঁক হেলিকপ্টার আসছে। রেসকোর্সে নামছে। এরা কি তাহলে 'এন্টারপ্রাইজ' থেকেই আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রটে গেল ওগুলো ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভারতীয় অধিনায়করা এসেছেন। জেনারেল নিয়াজী আরও ছ'ঘন্টা সময় নিয়েছিল আত্মসমর্পণের জন্য। সেদিন সন্ধ্যা বাংলাদেশ সময় পাঁচটা এক মিনিটে রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর যুগ্ম অধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিল।

পরে খবর পাওয়া গিয়েছিল 'এন্টারপ্রাইজ' উদ্যম হারিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছিল। ঐ একই সময়ে ভারত মহাসাগরে দু'তিনটি সোভিয়েট যুদ্ধজাহাজ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলাচল করছিল, সোভিয়েট সাবমেরিনও উপস্থিত ছিল। বিকেলেই লোকমুখে শোনা গেল ধানমন্ডীর দিকে এবং আরও কোথাও কোথাও বিজয় মিছিল বেরিয়েছে। কোনো গুলীবিদ্ধ হিংস্র প্রাণী ধরাশায়ী হলেও যেমন তাকে স্পর্শ করতে কয়েক মুহূর্ত সঙ্কোচ বোধ হয়, কি জানি হয়তো এখনো বেঁচে থাকতেও পারে, তেমনি একটি সঙ্কোচের ভাব কিছুক্ষণের জন্য ঝুঝি ছায়া ফেলেছিল, তারপরেই রাজধানীর চেহারা বদলে গেল। যে সব ছেলে নিরীহ মুখে এতদিন চুপচাপ ঘোরাফেরা করতো, তারা কতো রকমের অস্ত্র গোপন জায়গা থেকে বার করে রাস্তায় নেমে এলো। ফাঁকা গুলীর আওয়াজে এবং জয় ধ্বনিতে রাজধানীর আকাশ বিদীর্ণ হলো। সন্ধ্যার আগেই অনেক বাড়ীতে এবং সরকারী ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উড়লো ইতিহাসের এক মহানাটকের যবনিকা নেমে এলো।

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর

আলাউদ্দিন আল আজাদ

'যে জাতি মতিউররের ন্যায় অসংখ্য বীরের জন্ম দিতে পারে সে জাতি একদিন স্বাধীনতার আলোর স্পর্শ লাভ করবেই তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে; স্বাধীনতাকামী জাতিকে অবশ্যই আত্মত্যাগ করতে হয় – বাংলা মায়ের তিরিশ লক্ষ বীর সন্তান আজ রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে : এই শহীদদের মধ্যে মতিউর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ।' জলদগম্ভীর স্বরে যখন বলছিলেন বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ওসমানী আমার চোখ থেকে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে এলো। মতিউর বীরশ্রেষ্ঠ, কিন্তু মতিউর স্মৃতিমাত্র। অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন বাংলা মায়ের সোনার ছেলেরা, মেয়েরা সবাই স্মৃতি। এবং বাংলাদেশ এক প্রকান্ড স্মৃতিস্তম্ভ, যার সিঁড়িতে সিঁড়িতে বেদীমূলে আমরা এখনো আছি, এক ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত জেনারেশন। কিন্তু একটি রহস্য মাঝে মাঝে মনে হয় মৃত্যু বুঝি মৃত্যু নয় জীবনেরই কিঞ্চিৎ রূপান্তর নইলে কোনো কোনো জীবিতকেও কেন মৃত মনে হয়, আর মৃতকে জীবনময়? আমার ঘরের দেয়ালে মতির বড় ছবিটা টাঙ্গিয়ে রেখেছি, এটা যেন ছবি নয়, নয় শুধু পটে লেখা – সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই মশকারার হাসি দিয়ে বলছে, কি বাদশাহ মিয়া, খুব তো বেঁচে গেলেন তারপর আর কি খবর? তাজা যে এমন জীবন্ত, গতিময় তরুণ জেব্রার মতো তার আবার কি স্মৃতিচারণ? কেবল তার গতিময়তার, তার দুঃসাহসের কিছু দৃশ্যকে ভাষায় বাঁধতে পারি। ছোট্ট তবু বুঝিবা এক মহানাটক।

সময় একাত্তর বিশে আগস্ট, শুক্রবার, স্থান পাকিস্তান বিমানবাহিনীর মসরুর অবস্থান ঘাঁটি।

সকাল ১০-১৭ মিঃ। মূল দালানের ফ্লাইং ইউনিট থেকে বেরিয়ে এলো রশিদ মিনহাজ সঙ্গে উড়াল শিক্ষক; এবং টি-৩৩ বিমানগুলো যেখানে পার্ক করা ছিলো সেদিকে হেঁটে গেলো। জি-সুট ও ফ্লাইং হেলমেট পরে রশিদ বিমানের ককপিটে প্রবেশ করলো, তার পিছনে উড়াল শিক্ষক, প্রায় সপ্তাহ তিন আগে সে প্রথম উড়াল সম্পাদন করেছিলো। কিছুসংখ্যক ট্রেনিং বিমানের ইঞ্জিন গরম করা হচ্ছিল কয়েকটি উড়তে যাচ্ছে; এবং কয়েকটি ওড়বার, চলনের কিংবা নামাবার অনুমতির অপেক্ষায়। ভোরের বাতাস ক্রমে উষ্ণ হয়ে উঠেছে। নিজের পালা এলে, রশিদ, সগর্জনে ছুটে গেল রানওয়ে দিয়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য, কুয়াশার ভিতরে।

১০.৫৯ মিনিট। কন্ট্রোল টাওয়ার অবতরণের ক্লিয়ারেন্স দিলো; রশিদ মাটি স্পর্শ করে এবং তার বিমানটিকে ট্যাকসিং করে নিয়ে গেল যথাস্থানে। উড়াল শিক্ষক এলেন : ওর উড়াল দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন; রশিদকে বললেন দ্বিতীয় একক উড়ালে যেতে। কিন্তু তখন কয়েকজন উড়ালী ক্লিয়ারেন্সের অপেক্ষায় ছিলো রশিদও থামলো নিজের পালার জন্য।

১১-১৭ মিনিট। ট্যাকসিংয়ের অনুমতি দেয়ার জন্য রশিদ কন্ট্রোল টাওয়ারকে অনুরোধ জানালো। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, যিনি আজকে ফাইট সেফটি ডিউটিতে ছিলেন, তাঁর ওপেল ক্যাডেট (কেএডি ৫৪৮৭) গাড়ীতে উঠলেন, ইঞ্জিন চালিয়ে দিলেন। টেক অফের জন্য মূল রানওয়েতে যাওয়ার আগে ২০০ গজের একফালি জায়গা পেরিয়ে যেতে হয়, এর কিছুটা ছোট্ট পাহাড়ের আড়ালে পড়ায় কন্ট্রোল টাওয়ারের দৃষ্টিগোচর নয়।

১১-২৬ মিনিট। কন্ট্রোল টাওয়ার রশিদকে তার দ্বিতীয় একক উড়ালের জন্য ট্যাকসিং করে যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স দিলো। রশিদ টি-৩৩ (কোড নাম টি-বার্ড) সরবে, আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো প্রধান রানওয়ের দিকে। মতির গাড়ী এলো, ট্রাকসিং ট্রাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে রশিদের টি-বার্ডকে ছাড়িয়ে গেল। একটা নিপুণ ইউ-আকৃতি মোড় নিয়ে ক্রিচক্রিচ শব্দে থামলো। টি-বার্ডের পুচ্ছের দিকে সংকেত করেন মতি এবং রশিদকে বুড়ো আঙুল নীচু করে দেখান যার অর্থ বিমানের পুচ্ছেরদিকে কিছু গোলমাল আছে। মতিকে চিনলো রশিদ কারণ ইনি এককালে তার উড়াল শিক্ষক ছিলেন। বিমানটি থামালো রশিদ। মতি উড়ালীকে বিমানের অসুবিধেটা সম্পর্কে অবহিত করার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন। তিনি লাফিয়ে উঠলেন পাখায়, মুখটা বাড়িয়ে দিলেন রশিদের কানের কাছে ইঞ্জিন কি গোলমাল সে সম্পর্কে যেন কি বলবেন কিন্তু শেষমেষ দু আসনবিশিষ্ট বিমানের পেছনের আসনে লাফিয়ে পড়লেন।

১১-২৯ মিনিট। মতি, রশিদের স্পীকার ও হেডফোন থেকে রেডিও-টেলিফোনসূত্র বিচ্ছিন্ন করতে লাগেন, অক্সিজেনের নলেও ছটকা মারেন। হতচকিত রশিদ তাড়াতাড়ি আবার রেডিও-টেলিফোনসূত্র সংযুক্ত করেন এবং বায়ুতরঙ্গে কঁকিয়ে ওঠে তার কণ্ঠস্বর: টি-বার্ডকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে। অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের সঙ্গে তার কথা রেকর্ড করে কন্ট্রোল টাওয়ার।

১১-৩০ মিনিট। টি-বার্ড সগর্জনে ট্যাকসিন ট্র্যাক ছাড়িয়ে তীব্র বেগে প্রধান রানওয়েতে গিয়ে পড়লো এবং টেক অফ করতে গেল।
কন্ট্রোল টাওয়ার: টি-বার্ড থামো। টি-বার্ড থামো। টি-বার্ড থামো। কিন্তু বিমানটি রানওয়ে জর্জরিত করে ছুটে গেল এবং পনেরো সেকেন্ড উড়লো আকাশে।

১১-৩১ মিনিট। রেডিও-টেলিফোনে আবার রশিদের মরিয়া কণ্ঠস্বর টি-বার্ড হাইজ্যাক হয়েছে। পাঁচ মিনিট পরে, এই বার্তা, আবার রেকর্ড করলো কন্ট্রোল টাওয়ার: টি-বার্ড হাইজ্যাক হয়েছে। এরপরে সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন : চিরকালের জন্য।

উপরোক্ত বিবরণ সরকারী মুখপাত্রের বক্তব্যের ভিত্তিতে মর্ণিং নিউজ পত্রিকার সাংবাদিক এস কে পাশা কর্তৃক প্রদত্ত এবং সাধারণ ও অবস্থাঘটিত প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে একে আমরা সত্য বলে ধরে নিতে পারি। সরকারী ভাষ্যকার এয়ার কমোডোর লতিফ আরো জানান,মতি রশিদ মিহনাজকে ক্লোরোফরম করেছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দুটো ইন্টারসেপ্টর আকাশে উড়লো, কিন্তু টি-বার্ডের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তা থেকে মসরুর কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত করেন, মতি রাডার যন্ত্র এড়াবার জন্য নিশ্চয়ই পঁয়তিত্রিশ-চল্লিশ ফুট উচ্চতায় উড়ে গেছে। পরবর্তী ঘটনা এইরূপ। টি-বার্ডের নিয়ন্ত্রণ মতি নিজের হাতে নিয়ে নিচু দিয়ে গাছের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো ভারতীয় সীমান্তের দিকে। এ এক অকল্পনীয় দক্ষতা, প্রথম শ্রেণীর পাকা বৈমানিক ছাড়া যা সম্ভব নয়। সীমান্ত এসেও গেলো; মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল, চার মিনিটেরও কম উড়াল দূরত্ব। সরকারী ভাষ্যমতে এ সময় রশিদ মিনহাজ জ্ঞান ফিরে পেলো এবং তার শিক্ষকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করলো। সে নাকি বিমানটিকে মাটির দিকে চালিয়ে ধ্বংস করে পাকিস্তানের সম্মানের জন্য। টি-বার্ডের হাইজ্যাক বৃত্তান্ত যদিও সত্য, বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়; এবং তার বহু কারণ আছে। দুইজন বৈমানিকের কেউ যখন জীবিত নেই তখন কি করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে মিনহাজই বিমানটিকে দুর্ঘটনায় ফেলেছে? সুতরাং এটা বানোয়াট গল্প। বিমান বাহিনীতে বিদ্রোহ যে নিজেদের অপকীর্তিরই ফল তাকে চাপা দেয়া, বিমান বাহিনীর মনোবল জিইয়ে রাখা ও পাঞ্জাবের সম্ভ্রান্ত মিনহাজ পরিবারকে সান্ত্বনা

দেয়ার জন্য এই উপাখ্যান তৈরির প্রয়োজন ছিলো। এবং সেজন্যই ঘটনা ঘটে যাওয়ার প্রায় দশ দিন পরে প্রথম সরকারী ঘোষণা আমরা শুনতে পাই। তখন মসরুর ও করাচীতে যারা ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁদের সাক্ষ্য অন্যরকম। তাঁরা মনে করেন, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর যে দুটি ইন্টারসেপ্টার দু'মিনিটের মধ্যে টি-বার্ডের পশ্চাদ্ধাবন করে, তারা পরিচিতি দেয়ার জন্য টি-বার্ডকে বারবার অনুরোধ করে। মতিউর অটল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন বাস্টার্ড। ইউর ফাদার মতিউর রহমান ইজ গোয়িং টু ইন্ডিয়া। আগেই আন্দাজ করেছিলো, এবার নিশ্চিত হলো। এরপর সিয়েনসি ক্ষমা করেছেন, এটা সাময়িক উত্তেজনা এইসব স্তোত্রবাক্য ছেড়ে তাঁকে নাকি ফিরতে বলা হয় কিন্তু মতি কোনো কথায়ই কান না দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তখন মিরেজ বিমান থেকে গুলি করে টি-বার্ডকে ভূপাতিত করা হয়। দুর্ভাগ্য মতিউর একবার উর্ধ্বাকাশে মিগ থেকে বেলআউট হয়ে নিরাপদে মাটিতে নেমেছিলেন কিন্তু [অস্পষ্ট] পারলেন না। পাকিস্তানের মাটিতে বাঁচবার তাঁর আদৌ কোনো ইচ্ছা ছিলো না, এবং ধরা পড়লে হয়তো তা সম্ভবও হতো না। এই ভাষ্য সত্য হতে পারেঃ অথবা এটাও সম্ভব যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে রশিদ মিনহাজ যখন দেখলো ভারতীয় সীমান্ত দেখা যাচ্ছে, তখন নিজে বাঁচবার জন্য বেলআউট হওয়ার বোতাম টিপলো। কিন্তু অত নীচে অসম্ভব বেলআউট সেজন্য বিমানটি মাটির দিকে ধাবিত হলো তীব্রবেগে। কিংবা হতে পারে একটা একান্ত খাঁটি দুর্ঘটনা : তাড়াহুড়া করে মতি ক্যানোপী লাগিয়ে ছিলেন ঠিকই কিন্তু কোনো কারণে সেটা হয়তো খুলে গিয়ে থাকতে পারে, ফলে সিটবেল্ট জি-সুট হেলমেটহীন সাধারণ পোশাকপরা মতিউর উড়ে গেলেন হাওয়ার প্রবলচাপে, এবং বিমানটি নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায়, প্রচন্ড গতিতে গিয়ে মাটিতে বিদ্ধ হলো, মতিউরের মৃতদেহ ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু মিনহাজের কোনো চিহ্ন মেলেনি। যে কারণেই বিমানটি ধ্বংস হয়ে থাকুক, মতিউর জীবিত নেই এটাই নির্মম সত্য। তাঁর ছাত্র রশিদ মিনহাজও মৃত। প্রকৃতপক্ষে, দুজনেই নিরপরাধ এবং একই স্বৈরাচারী চক্রান্তের স্বীকার। কিন্তু নরপিশাচ পাকিস্তানী শাসকদের দৃষ্টিতে দু'জন পরস্পরবিরোধী। রক্তপিপাসু ইয়াহিয়া ছুটে এলোঃ রশিদ মিনহাজ পেলো পাকিস্তানের সর্বোচ্চ খেতাব – নিশানে-হায়দার এবং পাকিস্তানী প্রচারযন্ত্র রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র তারস্বরে দিনের পর দিন বাংলার বীর সন্তান মতিউরকে বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যায়িত করলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শেখ মুজিবের পরে ইনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছে।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের জন্ম ১৯৪১ সালের ২৯শে অক্টোবর ঢাকা নগরীতে। তাঁর পিতা আবদুস সামাদ ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরা থানার

রামনগর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মায়ের নাম সৈয়দা মোবারকন্নেসা খাতুন। তাঁদের নয় ছেলে এবং দুই মেয়ে। মতিউর অষ্টম সন্তান। মতিউর ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণী পাস করার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সারগোদার পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ডিস্টিংশনসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। অতঃপর রিসালপুর পিএএফ কলেজ, সেখান থেকে বাষট্টির ডিসেম্বরে পাসিং আউট প্যারেডে কমিশন লাভ এবং জেনারেল ডিউটি পাইলট। তেষট্টিতে মৌরিপুরে যান জেট কনভারসন কোর্স করবার জন্য। ওখান থেকে পেশোয়ারে গিয়ে পুরোদস্তুর জেট পাইলট হয়ে আসেন। পয়ঁষট্টির প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পেশোয়ারে কার্যরত অবস্থায় ছিলেন ফ্লাইং অফিসার। এরপর মিগ কনভারসন কোর্সের জন্য আবার যান সারগোদায়; ওখানে সাতষট্টি সালের একুশে জুলাই তারিখে একটি মিগ-১৯ বিমান চালাবার সময় উর্ধ্বাকাশে সেটা হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে অপূর্ব দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধিবলে প্যারসুটযোগে ভূমিতে অবতরণ করেন। উল্লেখযোগ্য এ সময়ে ইরানের রাণী ফারাহ দিবার সম্মানার্থে পেশোয়ারে যে বিমান মহড়া অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনিই একমাত্র বাঙালী পাইলট মনোনয়ন পেয়েছিলেন। রিসালপুরে ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হিসেবে দু'বছর কাজ করার পর সত্তর সালে বদলী হয়ে এলেন জেট ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর সোয়া তিন বছর আগে মিলি খানকে বিয়ে করেন: তাদের মাহিন-তুহিন দুই কন্যা। মতিউর ছিলেন এক সবুজ বাঘ, আগুনের ফুলকি; ছোটবেলা থেকে পশ্চিমে মানুষ হয়েছেন বলেই যেন বাংলাদেশের প্রতি ছিলো তাঁর আশ্চর্য অনুরাগ। যখনই দেশে আসতেন লুঙ্গি পরে উঠোনের কোণে লেপটে বসতেন, বাংলার মাটি মুঠি মুঠি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন; এবং বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় অশ্রুসজল হয়ে উঠতো তার চোখজোড়া। একাত্তর সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আসেন ছুটিতে; এবং সারাদেশে তখন গণজাগরণের জোয়ার। পঁচিশে মার্চ দুপুরের গাড়িতে তিনি গ্রামের বাড়ি রামনগর গেলেন মাকে দেখতে: পঁচিশে মার্চের ঘটনা তাঁকে করলো উত্তেজিত। বিক্ষুব্ধ ও সক্রিয়। তিনি দৌলতকান্দিতে জনসভা করলেন, ভৈরববাজারে গেলেন বিরাট মিছিল নিয়ে; ভৈরব আক্রান্ত হলে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইপিআরের সঙ্গে থেকে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেন। ভারতে গিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ভিত্তিস্থাপন তাঁর স্বপ্ন ছিলো; কিন্তু ওখানে জঙ্গী বিমান লাভের অনিশ্চয়তা। ভৈরব-আশুগঞ্জের উপর বিমান আক্রমণের দৃশ্য তাঁর মাথায় আনলো নতুন চিন্তা, নতুন পরিকল্পনা। তিনি ঠিক করলেন, কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে একটি জঙ্গী বিমান দখল করবেন এবং সেটা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবেন। ওভাবে বিমান ছিনতাই যে দারুণ ঝুঁকি, পাকা পাইলট মতিউর তা জানতেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সজ্ঞানে তিনি যে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করলেন, তার কারণ আর কিছু

নয় – দেশপ্রেম। তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলার স্বাধীনতাই আনবে বাংলার দরিদ্র, শোষিত, লাঞ্ছিত দুঃখী মানুষের মুক্তি। এবং তাকে ত্বরান্বিত করবার জন্য যদি মরতেও হয়, তাই কাম্য। মতির সাধ, মতির স্বপ্ন বাংলাদেশ আজ স্বাধীন এবং বাঙালী স্বাধীন জাতি: আমরা যদি তাঁকে কিছু নাও দিতে পারি তাঁর কোন দুঃখ নেই। কেউ মূল্য দিক বা না দিক, মতিউর মৃত্যুঞ্জয়। দুর্বল মুহূর্তে, কেবল আমি ভাবি যে বাংলার জন্য এত ভালোবাসা সেই বাংলার বুক জড়িয়ে ঘুমোনো তো তাঁর অধিকার? বাংলার সবুজে, নীলে, হলদে, গৈরিকে তাঁর আরো কিছু আরাম, আরো কিছু শান্তি। কিন্তু নিহৃদয় শত্রু কোনো কারণেই ফিরিয়ে দেবে কি তাঁর পবিত্র দেহাবশেষ, নিস্তব্ধ কফিন?

সংগ্রামের এক প্রান্তরে

মেজর জাফর ইমাম

৬ই নভেম্বর, হেডকোয়ার্টার আমায় ডেকে পাঠালেন। তখন বিলোনীয়া পকেটটি পুরোপুরি পাক-বাহিনীর দখলে ছিল। আমায় ডেকে বলা হলো 'বিলোনীয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু করে ফেনী পর্যন্ত এই পকেটটি মুক্ত করার ভার তোমার উপর দেওয়া হলো।' পরশুরাম, চিতলীয়া, ফুলগাজী, মুনসীরহাট, বিলোনীয়া ও ফেনী এই বিশেষ স্থানগুলো তখন ছিল পাক-বাহিনীর মজবুত ঘাঁটি। আমি এ জায়গাগুলো থেকে শত্রুদের পুরোপুরি বিতাড়িত করার জন্য দৃঢ়সংকল্প নিলাম। এই সংকল্পকে বাস্তবায়িত করার কাজে হাতে নিলাম ৮ই নভেম্বর। এই দিনটি ছিল আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। ১০ম বেঙ্গল ও ২য় বেঙ্গলের একটি কোম্পানীর সাথে গভীর আত্মবিশ্বাস ও অসীম মনোবল নিয়ে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের দলটি ছিল ক্যাপ্টেন মোরশেদের অধীনে।

পরশুরাম ও বিলোনীয়ার পকেট থেকে শত্রুদের হটানোর ব্যাপারে মিত্রবাহিনী জেনারেল হীরা আমায় চ্যালেঞ্জ করলো। আমি দৃঢ়ভাবে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবং অতি সুনিপুণভাবে এ অভিযানকে সফল করে তুলবোই। তাই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সামরিক কৌশলের অন্যতম কৌশল হিসেবে গোপন অনুপ্রবেশ দ্বারা শত্রুদের গোপনে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে আমরা যে বাহিনী দ্বারা এ অভিযান শুরু করেছিলাম তারা পুরোপুরি সবদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এই অভিযানে ১০ম বেঙ্গল ও ২য় বেঙ্গলের শতকরা ৮০ জন সৈন্য ছিল পুরানো বেঙ্গল রেজিমেন্টের এবং বাকি শতকরা ২০ জন সদস্য

ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তাছাড়া মিত্রবাহিনী আমাদের এ অভিযানে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল।

রাতের অন্ধকারেই আমরা গোপন অনুপ্রবেশের কাজ শুরু করবো বলে সাব্যস্ত করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রাতের মধ্যেই অনুপ্রবেশের কাজ শেষ করে ভোর হবার আগেই ওদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া। নভেম্বরের অন্ধকার শীতের রাত টিপ টিপ করে হালকাভাবে বৃষ্টি পড়ছিল। নির্জন রাত। হিমেল হাওয়ায় গাছের পাতায় যেন একটি অশরীরী শব্দ সৃষ্টি করছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত রাতটা যেন কিছুর প্রতিক্ষায় আছে। রাত আনুমানিক ১০.৩০ মিনিট। আমাদের অনুপ্রবেশের কাজ শুরু করলাম। আমরা এমন একটা এলাকা ঘেরাও করার অভিযানে নেমেছি যার তিনটা দিকই ছিল ভারত সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত। আমরা তাই ভারতের এক প্রান্তের সীমান্ত থেকে পরশুরাম চিতলীয়ার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারত সীমান্তের অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের এ অবরোধ যদি সফল হয় তবে শত্রুরা সহজেই ফাঁদে আটকা পড়বে।

অবরোধের কাজ শুরু হলো। অন্ধকার রাতে মুহুরী নদী ও চিলনীয়া নদীর কোথাও বুকপানি, কোথাও কোমর পানি, কোথাও বা পিচ্ছিল রাস্তার বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি সবাই। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অন্ধকার রাত। সামান্য কাছের লোককেও ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। কমান্ডার হিসেবে সবাইকে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করে আমাদের নির্ধারিত গন্তব্যস্থলে পৌছানো সত্যই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তবুও সব বাঁধাকে তুচ্ছ করে আমরা এগিয়ে চললাম। এবং সাথে সাথে আমি আমার দলের অন্যান্য অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললাম। নিঃশব্দ হয়ে সবাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ চলছি। কারো মুখে কোন কথা নেই। শত্রুরা হয়তো ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলো না যে ওদের জালে আটকাবার জন্য আমরা এগিয়ে আসছি।

শত্রুরা যদি আমাদের এই অনুপ্রবেশ টের পায় তবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে গোপন অনুপ্রবেশ যদি অপরপক্ষ টের পায় তবে পরিকল্পিত অভিযান সফল করা সম্ভব হয় না। আমরা আরো অনেক পথ পেরিয়ে এলাম। আমাদের এ কাজে বেশ সময় লাগছিল। কারণ অন্ধকার রাতে নির্ভুল পথে এগিয়ে যাওয়া সত্যিই বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। এছাড়া আরো একটা ভয়েরই সম্ভাবনা ছিল। শত্রুপক্ষের লোকেরা রাতে বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোলিং-এ ছিল। তাদের খপ্পরে পড়াও বিচিত্র ছিল না। সে ভয় আমাদের অমূলক ছিল না। আমরা যখন রেলওয়ে ও কাঁচা রাস্তার কাছাকাছি এগিয়ে এলাম, তক্ষুণি দেখলাম শত্রুপক্ষের ডিউটিরত একটি দল রেললাইন ধরে সামনের দিকে

এগিয়ে আসছে। আমরা চুপ করে লুকিয়ে গেলাম। কেউবা রাস্তার আড়ালে কেউবা জমিনের আড়ালে। ওরা কিছুই টের পেল না। নিশ্চিত মনে গল্প করতে করতে চলে গেল। বিপদ কেটে গেল। এদিকে রাত বাড়ছে। আমাদের অবরোধের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সারতে চাইলাম। আমার কোম্পানী কম্যান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করলাম। ওরা জানালো সব ঠিক আছে। ওরা নিরাপদেই অবরোধের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভোর হবার বেশী বাকি নেই। আমরা আমাদের নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলাম। এবং এর ফলে শত্রুদের পরশুরাম ও চিতলীয়া ঘাঁটি পুরোপুরি আমাদের অবরোধের মাঝে আটকা পড়লো। আমরা শত্রুদের চিতলীয়া ঘাঁটির দিক থেকে যাতে কোন প্রকার আক্রমণ না আসতে পারে তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। ভোর হয়ে আসছিল। আমরা প্রতিরোধের সকল ব্যবস্থা শেষ করতে লাগলাম। বাংকার খোঁড়ার কাজ শুরু হলো। এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থাও করতে লাগলাম। পথ শ্রমে ও ক্ষুধার তাড়নায় সবাই ভয়ানক ক্লান্ত। তবুও বিশ্রামের সময় নেই। ভোরের আলো ফুটবার আগেই প্রতিরোধের কাজ শেষ করতে হবে। তাই প্রাণপণে সবাই কাজ করতে লাগলাম। ভোর হলো। আমারও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুরা আমাদের অবরোধের মাঝে। এ সফলতার খবরটা জেনারেল হীরাকে জানাতে ইচ্ছা হলো। ওয়ারলেসে হীরাকে জানালাম যে শত্রুদের আমরা পুরোপুরি জালে আটকেয়েছি। খবরটা শুনে জেনারেল হীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। ধন্যবাদ দেবার সময় খুশিতে বার বার তার কথা আটকে আসছিল। আমি আমার চ্যালেঞ্জে জিতেছি বলে জেনারেল হীরা ব্যক্তিগতভাবেও আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানালো।

এদিকে ভোরের আলোয় চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। ভোরের আলোয় চারিদিক ভালো করে দেখতে লাগলাম। তারপর বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলাম যে শত্রুরা আমাদের অনুপ্রবেশ টের পেয়েছে কিনা। কিন্তু না। তা বোঝার কোন উপায় নেই। চারিদিকে নীরব। কোথাও মানুষের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

শত্রুর কনভয় বিলোনীয়া থেকে রেললাইনের সাথে সমান্তরালভাবে কাঁচা রাস্তাও চলে এসেছে ফেনী পর্যন্ত। এই রাস্তার পাশেও আমাদের বেশকিছু বাংকার গড়ে উঠেছে। বাংকারে বসে সবাই সামনের দিকে চেয়ে আছি। বেশ কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ দূর থেকে একটা ট্রলীর অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম। শব্দটা চিতলীয়ার দিক থেকেই আসছে মনে হলো। রেললাইন ও রোডের কাছের বাংকারে যারা ডিউটিতে ছিল তাদের মধ্যে নায়েব সুবেদার এয়ার আহমেদ ছিল খুবই সাহসী। যুদ্ধের প্রথম থেকেই সে আমার সাথে নির্ভীকতার সাথে লড়ে আসছিল।

ট্রলীটা এগিয়ে আসছে। সবাই প্রতীক্ষায় বসে রইলো। আস্তে আস্তে ট্রলীর শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে আসছে। আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম একজন চালকও কয়েকজন সৈন্য বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা নিশ্চিন্ত মনে আসছে। ওরা বুঝতেও পারেনি ওদের শত্রু এত কাছে আছে।

এক-দুই-তিন মিনিটের কাঁটা ঘুরতে লাগলো। ট্রলীটা একেবারে কাছে এসে গেল। এয়ার আহমদও তার সঙ্গীদের হাতের অস্ত্রগুলো একসাথে গর্জে উঠলো, মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। অনবরত ফায়ারিং-এর শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। শত্রুরা অনেকেই পালাতে চাইলো, কিন্তু তা সম্ভব হতে আমরা দিলাম না। একজন শত্রুও প্রাণে বাঁচতে পারলো না। আনন্দে এয়ার আহমদ ও তার সঙ্গীরা জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো। উত্তেজনায় আনন্দে ওদের সারা শরীর কাঁপছিল। ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে চিতলীয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির শত্রুরা মনে করলো তাদের ট্রলীটা হয়ত বা কোন মুক্তিবাহিনীর গেরিলা দলের হাতে পড়েছে। প্রকৃত অবস্থাটা তারা কিন্তু তখনও বুঝতে পারেনি। তখন দু'দিক থেকেই শত্রুরা আক্রমণ শুরু করলো। এদিকে এয়ার আহমদ আনন্দে বাংকার ছেড়ে উঠে দৌড়ে গেল অদূরে পড়ে থাকা শত্রুদের মৃত অফিসারটির কাছে। গোলাগুলির কথা সে যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল। অফিসারের পকেট থেকে পিস্তলটা সে উঠিয়ে নিল। তারপর তাকে টেনে নিয়ে আসতে লাগলো নিজ বাংকারের দিকে। ঠিক তক্ষুনি শত্রুদের চিতলীয় ঘাঁটির দিক থেকে একটি বুলেট এসে বিঁধলো এয়ার আহমেদের মাথায়। চোখের সামনেই দেখতে পেলাম তার শরীরটা যন্ত্রণায় কুকরে গেল। ঢলে পড়লো বাংকারের মুখে। রক্তে ঢেকে গেল ওর জয়ের আনন্দে উদীপ্ত হয়ে উঠা মুখটা। নিজের জান দিয়ে এয়ার আহমদ শত্রুদের ঘায়েল করেছে। কিন্তু এর শেষ দেখা দেখে যাওয়া তার কপালে সইল না। ৯ই নভেম্বর সেদিন ওকে হারিয়ে সবাই বেদনায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম।

একজন বীরকে হারিয়ে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই তবুও কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে এয়ার আহমদের রক্তমাখা শরীর ছুঁয়ে সব্বাই শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার সংকল্প নিলাম। রেলওয়ে রোড প্রতিরোধ ঘাঁটিতে এয়ার আহমেদের মৃত্যুর পর লেফটেন্যান্ট মিজান, নায়েব সুবেদার বশীর ও সেকান্দর শহীদ এয়ার আহমেদের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য শত্রুদের হামলার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে চললো, শত্রুর আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে চললো ওরা শত্রুরা সারাদিন আমাদের বিভিন্ন পজিশন-এর তুমুলভাবে আক্রমণ চালালো। সারাদিন কেটে গেল। বৃষ্টির মত আর্টিলারী আর সেলিং-এর শব্দে আশেপাশের নীরব এলাকা কেঁপে উঠতে লাগলো। ক্রমে রাত হয়ে এলো। অন্ধকার রাত। শত্রুরা এবার পরশুরাম ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো। আমাদের জোয়ানরা তার

পাল্টা জবাব দিয়ে চললো। ওদের পরশুরাম থেকে এ আক্রমণের আকার ছিল ভয়ঙ্কর। ওরা এমনভাবে আমাদের জালে আটকা পড়েছে যে বের হবার কোন পথই নেই। ওরা বুঝতে পারলো এটা ওদের জীবন মরণ সমস্যা। তাই তারা প্রাণপণে লড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু ওদের আমাদের জাল ছেড়ে বের হতে দিলাম না। আমরা তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিয়ে চললাম।

শত্রুদের বিলোনীয়া ও পরশুরাম ঘাঁটিতে যারা ছিল তারা শুধু একটু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। যে করেই হোক ওরা চিতলীয়া থেকে সাহায্য ও যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করলো – কিন্তু আমরা তা ব্যর্থ করে দিলাম। ওদের এ প্রাণপণ লড়াইয়ের জবাব দিয়ে আমরা শত্রুদের পরশুরাম আক্রমণ প্রতিহত করি। তারপর ভোর হলো। ওরা আমাদের ওপর অনবরত শেলিং ও ফায়ারিং করতে লাগলো। আমরাও উচিত জবাব দিয়ে চললাম। সেদিন বেলা ৪টার দিকে হঠাৎ শত্রুরা আমাদের উপর বিমান হামলা শুরু করলো। কিন্তু ওরা এতে আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারলো না। এবার আমরা আরো সতর্কতা অবলম্বন করলাম। সেদিন গেল। তারপরের দিনেও আগের দিনের মতই ফায়ারিং ও সেলিং চললো। দুপক্ষ থেকেই সমানে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চললো। ওদের শুধু একটিই উদ্দেশ্য হয় চিতলীয়ার সাথে যোগাযোগ না হয় পালানো। তবে সে মুহূর্তে পালানো ছাড়া তাদের আর কোন পথ আসলেই ছিল না। সমস্ত এলাকাটা নীরব। শুধু ফায়ারিং ও সেলিং এর শব্দে মাঝে মাঝে সে এলাকার প্রকৃতি আর গাছপালা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অনেক সময় এক মিনিটও বিরাম ছিল না। শব্দের জন্য অতি কাছের লোকের কথাও শুনা যেত না।

সেদিন বেলা ৩.৫০ মিনিট। হঠাৎ দেখলাম তিনটা শত্রুর বিমান আমাদের এলাকায় উড়ে আসছে। এসেই ওরা সে এলাকার ওপর বোম্বিং শুরু করলো। অনেক ঘরবাড়ী পুড়ে যেতে লাগলো। চারিদিকে দাউ দাউ করে বাড়ীঘর আগুনে জ্বলছে। ওরা বেশ নীচু হয়েই বোম্বিং করছিল। যদিও আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বহু ছিল কিন্তু বিমান বিধ্বংসী কামান আমাদের ছিল না। আমরা তাই – শেষ রক্ষা হিসেবে এসএমজিকে এ কাজে ব্যবহার করতে লাগলাম। যেহেতু ওরা জানতো আমাদের বিমান বিধ্বংসী কামান নেই তাই নিশ্চিত হয়ে নীচু দিয়ে বিমান চালাচ্ছিল। সবাই অপেক্ষায় আছি। কখন আমাদের এমএমজি-এর আওতায় বিমানগুলো আসে। আর দেরী হলো না। এসএমজি-এর আওতায় এসে গেল বিমানগুলো। মুহূর্তে গর্জে উঠলো এসএমজি। দুটি বিমান উড়ে চলে গেল, ওদের সীমানায় আর একটি ফিরে যেতে পারলো না। শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়লো মাটিতে। সব জোয়ানেরা চেঁচিয়ে উঠলো উল্লাসে। সেদিন ছিল নিঃসন্দেহে ১০ম বেঙ্গল ও ২য় বেঙ্গলের সংগ্রামী দিনগুলোর একটি স্মরণীয় দিন। কোন যুদ্ধের

ইতিহাস হয়তো বা এর আগে এসএমজি দিয়ে কোন বিমানকে ভূপাতিত করা হয়নি, আমরা তাই করতে পেরেছি। গর্বে সবার বুক ভরে উঠলো, এই কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাটা সে এলাকার জনসাধারণের মনে রেখাপাত করেছিল সবচেয়ে বেশী। তাদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো একথা। আমাদের জন্য ওরাও যেন গর্বিত। সেদিনই মিত্রবাহিনী জেনারেল হীরা ওয়ারলেসে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানালো।

সেদিন রাত। আমরা মিত্রবাহিনীর সক্রিয় ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় শত্রুদের বিলোনীয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালাম, ওরা আমাদের এ হামলার মুখে বেশীক্ষণ টিকতে পারলো না। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলা ওরা। শত্রুদের শতকরা ৮০% সৈন্যই আমাদের আক্রমণে প্রাণ দিল, রাতের মাঝেই আমরা পরশুরাম ও বিলোনীয়া দখল করতে সক্ষম হলাম।

অভাবনীয়ও অবর্ণনীয় এক দৃশ্য দেখলাম ওদের পরিত্যাক্ত ঘাঁটিতে যেয়ে। চারদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। ধানক্ষেত, বাংকারে, বাংকারের অদূরে খালের পানিতে কোথাও ফাঁকা নেই। যারা আহত হয়েও পালাতে চেয়েছিল তারা শরীরের অসমর্থতার জন্য পারেনি। অসহায়ভাবে কাতরাচ্ছিল বাঁচার আশায়, আহত এসব সৈন্যদের চিকিৎসা করা আমাদের কর্তব্য, তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করতে বললাম, কিন্তু ওদের মাঝে খুব বেশীর ভাগ সৈন্য মারা গেল। মাত্র ৩/৪ জন বাঁচতে পারলো। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ৪৯ জনকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাদের সাথে এদেরও বন্দী করা হলো। পরশুরাম ও বিলোনীয়া মাটির এ মর্মান্তিক পরিণতিতে শত্রুরা ভেঙ্গে পড়লো। চিতলীয়ার ঘাঁটির শত্রুরা মনে হলো এতে ভয়ানক নিরাশ হয়ে পড়লো। ওরা পালিয়ে গেল মুন্সীরহাটে। মুন্সীরহাটে শত্রুদের ঘাঁটিতে এসে ওরা কিছুটা বল পেল।

আমরা আস্তে আস্তে আরো এগিয়ে আসতে লাগলাম এবং ওদের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝে আরো কিছু কায়দা বের করতে চাইলাম। এবারে আমরা অবস্থা বুঝে পুরানো কায়দা হিসেবে গোপন অনুপ্রবেশ করার পরিকল্পনা নিলাম।

আমরা নীলক্ষেতে ঘাঁটি করে ওদের ফুলগাজী ঘাঁটির উপর চাপ সৃষ্টি করবো – যাতে ওরা দুর্বল হয়ে পালাতে বাধ্য হবে হয়তো। নীলক্ষেতে আমরা মজবুত ঘাঁটি করে বসলাম। ওরা আমাদের পরিকল্পনটা টের পেল মনে হয়। তাই ওরা চিতলীয়া ঘাঁটি ছেড়ে সবাই ফুলগাজীতে এসে মিললো, আমরা তখন সরাসরি ফুলগাজীর ওপর চাপ সৃষ্টি করলাম। ওরা অবস্থা বুঝতে পারলো। ব্যাপার সুবিধার নয় ওদের জন্য। ওরা একেবারে সব ঘাঁটি ছেড়ে বান্দুরা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এসে ঘাঁটি

স্থাপন করলো। আমরা আরো এগিয়ে আসলাম। কালিরহাঁটও পাঠাননগর থেকে আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে ঘাঁটি স্থাপন করলাম। আমাদের দক্ষিণ দিকে ছিল সোনাগাজী। সোনাগাজীতে আমরা আগেই গেরিলা বাহিনী পাঠিয়ে সব ঠিক করে রেখেছিলাম। ওরা এখন আমাদের দ্বারা তিনদিক দিয়েই চাপের ভিতর পড়েছে। তখন বাধ্য হয়ে সোনাগাজী দিয়ে পালাতে চাইবে, সেহেতু আমরা সে পথ ওদের জন্য ইচ্ছা করে মুক্ত রেখেছি গোপনে। যাতে তারা পালাতে গেলেই ওদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। ওরা আমাদের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ হয়ে লাকসামে চলে গেল। এবং এতে ওদের অধিকসংখ্যক সৈন্যই পালাতে সক্ষম হলো।

৬ই ডিসেম্বর আমরা ফেনী মুক্ত করলাম, ফেনীর এতদিনকার গুমোট ও ধোঁয়াটে আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উড়লো। অগণিত জনতার শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। দীর্ঘ ৯টি মাস পর মুক্ত বাতাসে সবাই দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ফুলের মালা আর জনতার বরণ ডালার আতিশয্যে আমরা সেদিন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম, দু'চোখ শুধু বারে বারে পানিতে ভরে উঠছিল। মাথায় বাংলা মায়ের অশ্রুভেজা আশীবার্দ নিয়ে, বাংলাদেশের সবুজ সূর্য আঁকা পতাকায় ছুঁয়ে শহীদ এয়ার আহমেদের মত লাখো লাখো বীর শহীদদের আমরা অবনতচিত্তে স্মরণ করলাম।

কিন্তু আমাদের আরো অনেক কাজ বাকী, অভিভূত হয়ে বসে থাকার সময় নয়। আর দেরী করলাম না। সবাই আবার মার্চ করে নোয়াখালীর দিকে রওনা দিলাম। নোয়াখালীর সদর মুক্ত করতে যেয়ে আমরা সেদিন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম প্রচুর। কিন্তু তা যদি পাক-সেনাদের দ্বারা হতো তবে বোধহয় সান্ত্বনা পেতাম। তারা ছিল বর্বর আর ঘৃণ্য রাজাকার আর আলবদরের দল। ওরা নানাভাবে আমাদের বাঁধা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের অগ্রগতি তার রুদ্ধ করতে পারেনি। আমরা তাদের সব বাঁধা ডিঙ্গিয়ে ওদের সমূলে ধ্বংস করে নোয়াখালীর সদর মুক্ত করলাম।

আমরা ক্ষমা করিনি তাদের। সেই ঘৃণ্য আলবদর আর রাজাকারদের, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দেশের সাথে, অস্বীকার করেছে নিজের রক্তকে। তাই ওদের হত্যা করতে কারো একটুকু বুক কাঁপেনি। কারণ ওরা ক্ষমার যোগ্য নয়। নিজের মায়ের বুকফাটা কান্নায় হৃদয় টলেনি যাদের নিজের বোনের নির্যাতনে-মানবতার সামান্য উদাহরণ দেখাতে পারেনি যারা, নিজের ভাইকে হত্যা করতে হাত কাঁপেনি এতটুকু ওদের। ওদের ক্ষমা করা যায় না। দেশের সাথে, নিজের অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তবুও বিবেকের দংশনে জ্বলে পুড়ে মরেনি

ওরা। ওরা কি মানুষ? পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

৯ই ডিসেম্বর আমরা নোয়াখালী মুক্ত করলাম। নোয়াখালীর মুক্ত নীল আকাশে সূর্য আঁকা পতাকায় আমরা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষদের সালাম জানালাম। সে সময়কার আনন্দ আর অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সফলতার আনন্দে আর দেশমুক্তির আনন্দে সবাই শুধু কেঁদেছিল। দলে দলে জনতা মালা হাতে ভিড় জমালো শুধু এক নজর আমাদের দেখার আশায়। সেদিন আমরা সবাই শুধু বাঙালী এই পরিচয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছিলাম এই আমার দেশবাসী। এরা কত ভালোবাসে আমাদের। তাইতো ওদের জন্য, আমাদের জন্য দেশ মুক্ত করার জন্য সংগ্রামে নেমেছি আমরা। এরা আমার ভাই, আমার বাবা, আমার মা, বোন। এদের আনন্দে আমরাও মিশে গেলাম তাই একান্ত হয়ে। সেদিন শুধু আমি এই জেনেছি – আমার একটি পরিচয়। আমি বাঙালী, এই বাংলাদেশ আমার এরা সবাই আমার আপন একই স্নেহ ভালোবাসা একই সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার বাঁধনে আমরা বন্দী। কাউকে কেউ অস্বীকার করতে পারি না। ওদেরই মত আমিও দেশের মাটিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। ভালোবাসি দেশের এই দুর্ভাগা মানুষগুলোকে।

উই স্যালুট মেজর হায়দার

জয়নুল আবেদীন

আমাদের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সাবধান থাকতে হবে। ঢাকা যাওয়ার পথে কোথাও থামা ঠিক হবে না। দখলদার সেনারা তোমাদের ধরে ফেলতে পারে। বরং আগামী দিন রাতে তোমরা বিশ্রাম নিও। ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) হায়দারসহ ভারত ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে আমাদেরকে উপদেশ দিলেন। এটা ভারতের সীমান্ত এলাকা বক্সনগরের ঘটনা। এটা ছিল অন্ধকার এবং বর্ষণমুখর। আমরা দশজন গেরিলা ও দুইজন গাইড (পথপ্রদর্শক) ক্যাপ্টেন হায়দারকে ঘিরে দাড়িয়েছিলাম। তিনি ম্যাপ খুলে ঢাকা যাওয়ার পথ সম্বন্ধে পরিবারের মত উপদেশ দিচ্ছিলেন। পরিশেষে তিনি আমাদের অপারেশনের কিছুটা ধারা বলে দিলেন। আমরা তার সঙ্গে হাত মিলালাম তিনি আমাদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমাদের সাফল্য কামনা করলেন। আমরা তাঁকে শুভরাত্রি জানিয়ে ঢাকার পথে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। সবাই নিজেকে স্বাধীন বাংলাদেশের হিরো বলে ভাবছিলাম এবং ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের জীবনের উপর সর্বরকম ঝুঁকি রয়েছে। পথে প্রায় সারাটিক্ষণ হায়দার স্যারের কথা মনে পড়ছিল। তাঁর স্নেহ ও ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহারে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে গেল।

আমাদেরকে বিদায় দেয়ার সময় আমাদের অমঙ্গল চিন্তায় তার সমস্ত মুখমন্ডল যেন কালো মেঘে ছেয়ে দিয়েছিলো। হতে পারে এটাই আমাদের শেষ দেখা। তিনি হয়ত ভাবছিলেন যে এই ছোট ছোট ছেলেরা একটি সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকে উঠতে পারবে তো? মনে পড়ে গেরিলা ক্যাম্পের প্রথম দিনটিতে নিজেকে কিভাবে হারিয়ে ফেলেছিলাম। দিনটি ছিল

৩০শে এপ্রিল। আমার বন্ধু করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসির ছাত্র, শাহজাহান এবং আমি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র, মতিনগর ক্যাম্পে পৌঁছলাম। আমরা একজন আর্মি অফিসারের দেখা পেলাম। তার গলার সঙ্গে ঝুলানো একটি চাইনিজ স্টেনগান। খুব সম্ভব তিনি বেশ কয়েকদিন সেভ করেননি। তিনি আমাদের ভাল মন্দ জিজ্ঞেস করলেন এবং আশ্চর্য্য হলেন এই যে আমরা এই মাত্র পিআইএ করে সুদূর করাচী থেকে আসছি। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালীদের সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করলেন। এই আর্মি অফিসারটিই ছিলেন ক্যাপ্টেন হায়দার। আমরা দু'বন্ধুই গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণের জন্য মনোনীত হলাম। আরো ১১৯জন ছেলেসহ আমাদেরকে কাঠালিয়া ক্যাম্পে পাঠানো হলো। আমরা ট্রাকে যাচ্ছিলাম। ক্যাপ্টেন হায়দার যাচ্ছিলেন জীপে করে। হঠাৎ আমাদের ট্রাকটা নষ্ট হয়ে গেল কিছু ছেলে বিশৃংখলভাবে হৈ চৈ করছি। এগুলি দেখে তিনি খুব চটে গেলেন। এবং শৃংখলার উপর ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। বক্তৃতাটি আজো আমার মনে আছে। কেননা তাতে বলছিলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে। আরো আরো কিছু কথা মনে পড়ে – 'যখন তোমরা মুক্তিযোদ্ধা হতে যাচ্ছ, তখন তোমাদেরকে সুশৃংখল, সৎ এবং স্বল্পভাষী হতে হবে।' কেননা তিনি আমাদেরকে সুশৃংখল দেখতে চাচ্ছিলেন। সেই সময় মনের দিক থেকে কিছুটা দমে গিয়েছিলাম। বক্তৃতার শেষে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিলেন। এটা লক্ষ্য করে আমাকে কাছে ডাকলেন এবং কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আমার সঙ্গে ছোটভাইয়ের মত ব্যবহার করছিলেন। সত্যিই তিনি আমাকে মুগ্ধ করলেন। এমনিভাবে সবার মনকে বোঝার তাঁর একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সব সময়ই তিনি আমাদেরকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতেন।

আমরা কাঠালিয়াতে আমাদের ক্যাম্প গুছিয়ে নিলাম। বিএসএফ আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলো। একদিন মধ্যরাতে আমরা ক'বন্ধু মিলে আগামী দিনের প্রোগ্রাম এবং ছেলেদের লিষ্ট করছিলাম। কেননা তখন আমাকে ১২০ জন ছেলের কমান্ডার করা হয়েছিল। সেই মধ্যরাতে ক্যাপ্টেন হায়দার এলেন আমাদের সুবিধা অসুবিধা জানতে। তিনি ক্যাম্পে ঢুকে আমাদের কাজকর্ম দেখলেন। আমাদেরকে রাত জেগে কাজ করতে দেখে খুব বিমোহিত হলেন। তিনি আমাদের কাছে কিছু সময় থাকলেন এবং কাজ করার উদ্যমকে আরো উৎসাহিত করলেন। সব সময়ই তিনি ছেলেদের সুবিধা অসুবিধার খবর নিতেন। কোনো ছেলের বিপদের কথা শুনলে বিশেষ দুঃখিত এবং চিন্তিত হয়ে উঠতেন। যে সময় তিনি নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিন্তু তবুও তিনি আমাদের খোঁজ খবর নিতে আসতেন। আমাদের প্রতি তাঁর আলাদা দরদ ছিল। সে জন্যই বোধ হয় কৃষক থেকে শুরু করে ছাত্র শ্রমিক জনতা সবাই তাঁকে সমানভাবে পছন্দ করতো।

মে মাসের ৮ তারিখে কাঠালিয়ার তাবু গুটিয়ে আমাদেরকে নুতন জায়গায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। আর্মি ভ্যানে করে আমরা ৪০০ ছেলে যাচ্ছিলাম। সত্যিই গেরিলা জীবনের এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন যাত্রা। বৃষ্টির দিন হওয়ায় পাহাড়িয়া পথগুলি স্বভাবতই পিচ্ছিল ছিল। ৪০০ ছেলের জন্য মাত্র ৫টা আর্মি ভ্যান দেয়া হয়েছিল।

বিকেল বেলা আমরা খাসিয়া জঙ্গলের বিএসএফ ক্যাম্পে পৌছলাম, ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই সবাই বিশ্রাম নিলাম। সমস্ত দিন পথ চলায় সবাই ক্ষুধার্ত বোধ করছিল। আমরা চুলা টুলা বানিয়ে খাওয়া রান্না করে নিলাম। কিন্তু খাওয়া ছিল অপর্যাপ্ত। তাই অনেকেই না খেয়ে থাকতে হলো। এতে তাদের মন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এর জন্য হায়দার স্যার খুব দুঃখ পেলেন। ক্ষুধার্ত ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি ষ্টোরকিপারকে ডেকে আমাদের যে স্বল্প পরিমাণ চিড়া ছিল তা দিতে বললেন। ছেলেরা আনন্দে তা খেয়ে নিল। তাই সবাই খুশী হয়ে উঠলো এবং হায়দার স্যারকে ধন্যবাদ দিলো। আমি লক্ষ্য করেছিলাম মাত্র একটি লোক, মেজর হায়দারই এগিয়ে আসতেন আমাদের যে কোন বিপদে। তার এই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিদান দিতে ভাষা হারিয়ে ফেলি। সত্যি কথা বলতে কি, ওখানে আমাদের একটি জায়গাই ছিল যেখানে গিয়ে প্রত্যেকটি গেরিলাই আশ্রয় পেতো যে কোন বিপদে এবং দূরাবস্থায়। এই লোকটিই আমাদের সব সময় তাঁর হৃদয়ের কাছে টেনে নিতেন এবং সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাতেন।

ওমপিনগের আমরা সবাই অনুশীলন সমাপনি ক্যাম্প গড়ে তুললাম। নিয়মিত বাহিনীর লোকেরা আমাদের প্রশিক্ষণ দান করতো। ক্যাম্পের অনেক ছেলেই আমাশয় এবং রক্ত আমাশয় ভুগছিল। সেখানে কোন মানুষ বাড়ী বা বাজার ছিল না। এম.আই রুমে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ছিল না। এই বন্ধুবর প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাদ্য অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। সেই সময় তিনি ছিলেন ১০০ মাইর দুরে মতিনগর ক্যাম্পে। কিন্তু আমাদের বন্ধু প্রায়ই আসতেন আমাদের ক্যাম্পে, আমাদের ভাল-মন্দ জানতেন। সব গেরিলা যোদ্ধাই মনে রাখবে ক্যাপ্টেন হায়দারকে, যতদিন তারা বেঁচে থাকবে।

জুন মাসে আমরা প্রশিক্ষণ শেষ করে ২নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার মেলাঘরে ফিরে আসলাম। সেই সময় ক্যাপ্টেন হায়দার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঢাকা, কুমিল্লা এবং ফরিদপুরের কিছু অংশের গেরিলাদের। তার প্রধান কর্তব্য ছিল গেরিলাদের লক্ষ্যবস্তু ঠিক করা এবং গেরিলাদেরকে অধিকৃত বাংলাদেশে পাঠানো। আমি তাঁকে দেখেছি সব সময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে এবং তিনি তা সম্পন্ন করতেন

সুচারুভাবে। নিঃসন্দেহে তাঁর আদেশ করার ক্ষমতা ছিল। তিনি নিয়মিত বাহিনীর সেনাদের কাছেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন কঠোর ঠিক তেমনই ছিলেন কোমল বা দয়ালু। আমার একটা ঘটনার কথা মনে আছে। এক রাতে দুই দল গেরিলার মধ্যে সামান্য ভুল বুঝাবুঝির জন্য ভীষণ সংঘর্ষ হতে যাচ্ছিল তখন এই হায়দার স্যারই ঘটনাটি আয়ত্বে আনেন। তিনি ঘটনা আয়ত্বে আনার জন্যে ফাঁকা গুলি করতেও বাধ্য হয়েছিলেন। শেষে ঐ গেরিলাদেরকে তিনি ভীষণ শাস্তি দেন। সেই রাতে আমাদেরকে ফলইন করতে হয়েছিল এক ঘন্টা পর পর সেই সকাল পর্যন্ত। পরদিন সকালে গেরিলাদের একটি দল অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই ক্যাম্প ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কেননা এই ছেলেগুলি অস্ত্রের অভাবে দীর্ঘদিন বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই লোকটিই আবার এগিয়ে এলেন এবং ভাবগম্ভীর গলায় ছোট খাট একটি বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন, বন্ধুগণ, আমি জানি তোমরা খুব পরিশ্রান্ত, খারাপ অবস্থায় থাকছো, স্নেহ মায়া মমতা কিছুই পাচ্ছ না, এগুলি আমি সবই বুঝি। এখানে পর্যাপ্ত খাবারের অভাব আর তাছাড়া তোমরা ট্রেনিং শেষ করে অস্ত্রের অভাবে বসে আছো। আমি তোমাদের অপারেশনে পাঠাতে পারছি ন। কিন্তু তোমরা কি জান আজ যদি অস্ত্র ছাড়া মনে ব্যথা নিয়ে ফিরে যাও, তখন আমাদের মাতৃভূমি এবং আমাদের জনগণ আমাদেরকে অভিশাপ দেবে। তাছাড়া আমি নিজে ভীষণ দুঃখ পাব।' সেই সময় হায়দার ভাইয়ের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি আবার বললেন, 'তোমরা সবাই আমার ভাই'। এই সময় তিনি এত ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে আর বেশী কিছু বলতে পারলেন না। তখন ঐ গেরিলা গ্রুপটি তাদের মত পরিবর্তন করে ক্যাপ্টেন হায়দারের নিকট ক্ষমা চাইলো।

তখন ক্যাপ্টেন হায়দারকে মনে হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি যখন তিনি জানতেন যে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের অপারেশন শেষ করতাম। আমি জানতে পারলাম যখন তিনি রূপগঞ্জ থানার, রাজাকার এবং পাঞ্জাবী পুলিশ মারার সংবাদ পেলেন তখন তিনি ভীষণ খুশী হলেন এবং সেক্টর কমান্ডার মেজর (বর্তমান কর্নেল) খালেদ মোশাররফকে জানালেন। তিনি সব সময় আমাদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন। আমার কোম্পানী যখন ২০শে জুলাই ট্রেন উড়ালো তখন তিনি আমাদেরকে অভিনন্দন বাণী পাঠালেন। আমি তাঁর প্রশংসা করতে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি অনেক গুণের অধিকারী। তিনি তার নীতিতে ছিলেন অবিচল। যেমন ছিলেন কঠিন তেমনই ছিলেন কোমল। তাই ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ঋণ কোন গেরিলাই ভুলতে পারবে না। নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম শ্রেণীর দেশপ্রেমিক। আজ মুক্ত বাংলাদেশের প্রথম মুক্তিযোদ্ধা সম্মেলনের প্রাক্কালে গেরিলাদের পক্ষ থেকে আমি তাকে জানাচ্ছি আমাদের ভালবাসা এবং অভিনন্দন।

আমরা তার কাছে চিরঋণী। তিনি আজীবন আমাদের কাছে হায়দার ভাই হয়ে থাকবেন। হায়দার ভাই জিন্দাবাদ। হায়দার ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

মেজর হায়দার ১৯৬৬ সনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি তখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসিতে (পরিসংখ্যান বিভাগ) অধ্যয়ন করতেন। তিনি পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হন। তিনিই পাকিস্তান কমান্ডো ব্যাটালিয়ানে একমাত্র বাঙালী অফিসার ছিলেন। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে হায়দার ভাইয়ের বাড়ী।

সংগ্রামের এক প্রান্তরে

মেজর জাফর ইমাম

৬ই ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত হলো, তারপর নোয়াখালীর সদর এলাকা শত্রুমুক্ত করলাম ৯ই ডিসেম্বর, কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ হলো না। ঠিক তখনি আদেশ এলো চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। চট্টগ্রাম শত্রুমুক্ত করতেই হবে। আমার কাছে যখন এ আদেশ এলো তখন আমি ফেনীতে ও চিটাগাং ফেনী থেকে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে। তখন চিটাগাং এবং তার পার্শ্ববর্তী প্রায় সমস্ত এলাকাই শত্রুদের কবলে ছিল। এসব স্থানে তারা বেশ মজবুত ঘাঁটি করে বসেছিল। সংখ্যায়, শক্তিতে তারা বেশ শক্তিশালী হয়েই আছে।

সেদিনই চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা দিবার সমস্ত কাজ শুরু করলাম। দেরী করার আর সময় ছিল না। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আমরা সেদিন দুপুর নাগাদ রওনা দিলাম চট্টগ্রাম অভিমুখে। পিচঢালা একটানা পথ চলে গেলে সমুখ বরাবর। আমাদের এ অভিযানে ১০ম বেঙ্গলের জোয়ানেরা ছাড়া মিত্রবাহিনীর জোয়ানদের পূর্ণ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। যদিও সমস্ত কিছু পরিচালনা ও পরিকল্পনা করার দায়িত্ব আমরাই নিয়েছিলাম। অবশ্য এর কারণ ছিল যে বাংলাদেশের সমস্ত পথঘাট ও প্রয়োজনীয় অনেক কিছু আমাদেরই জানা।

বেলা বাড়ছে। আমরা সবাই এগিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিতে চলার অবকাশ ছিল না। পথে দুশমনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অভিযানে বিলম্ব হচ্ছিল। আমরা এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলাম না। সব বাধা, প্রতিরোধ ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম গন্তব্যস্থল অভিমুখে। থেমে থাকলে চলবে না। অভিযান সফল করতেই হবে।

১৩ই ডিসেম্বর। আমরা তখনো গন্তব্যস্থলের অনেকদূরে। আর ৪ মাইল দূরেই কুমীরা। এখানেও শত্রুরা বেশ শক্তিশালী ঘাঁটি করে আছে। আমরা বেলা প্রায় ১২টায় কুমীরার অদূরে এসে পৌঁছিলাম। এরপর আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। কুমীরায় অবস্থিত শত্রুদের ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর প্রবল আক্রমণ শুরু হলো। আমরাও প্রবলভাবে ওদের এ আক্রমণের জবাব দিয়ে চললাম, কিন্তু সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করলাম না।

তখন মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আনান স্বরূপের তরফ থেকে আমার কাছে তার একটি বিকল্প আদেশ এলো, আনান স্বরূপ আমাকে বললো, "তুমি ১০ম বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানী ও মিত্র বাহিনীর দলকে রেখে কুমীরা পাহাড় পার হয়ে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়ে যাও।" আমি সে অনুযায়ী ১০ম বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানী লেফঃ দীদারের অধীনে রেখে এবং মিত্র বাহিনীর কোন সহযোগিতা ছাড়া আমার ১০ম বেঙ্গল নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারেই কাজ শুরু করতে মনস্থ করলাম।

আমরা যখন ফেনী থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম সে সময়ই চতুর্থ বেঙ্গলের একটি দল ক্যাপ্টেন গাফফারের অধীনে পরিচালিত হয়ে চিটাগাং-রাঙামাটি রোড ধরে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিল। আমরা কুমীরা পাহাড় পার হয়ে গোপনে হাটহাজারী আক্রমণের পরিকল্পনা নিলাম। সন্ধ্যার সাথে সাথে আমরা সব ঠিক করে রওনা দিলাম। ডিসেম্বরের শীতের সন্ধ্যা। অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে শীতের মাত্রাও যেন বাড়ছিল। কিন্তু সেসব ভাববার অবকাশ ছিল না। এ রাতের অন্ধকারেই শীতের সাথে মিতালী পাতিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পাড়ি দিতে হবে অচেনা অজানা পথ। এ পথে আমরা একেবারেই নতুন। পাহাড়ীবন্ধুর পথ। কোথাও ঢালু, কোথাও উঁচু নীচু। কোথাও বা ছোটখাট খাল। চারিদিকে গাছগাছালির ভিড়। অন্ধকার যেন তাই আরো নিবিড় লাগছিল। সাথে আমাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র। নিজেদের চলতেই কষ্ট হচ্ছিল। তার উপর এসব ভারী বোঝা নিয়ে চলা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তবুও অতিক্রম করতেই হবে আমাদের। আমরা তাই পথ চলছি। অতি কষ্টে-নিঃশব্দে। চারিদিকে অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক। মাঝে মাঝে পথ ভুলে যাচ্ছিলাম। আবার পিছিয়ে এসে চলছি সঠিক পথে।

এ পাহাড়ী পথে কোথাও মানুষজনের তেমন সাড়া পেলাম না। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা পাহাড়ী কুটিরে কিছু লোকের দেখা পেলাম। তাদের কাছ থেকে পথ চিনে নিয়ে পথ চলতে লাগলাম। ক্রমশ রাত বাড়ছে। ঠিক কত জানি না। ক্ষুধায় পথশ্রমে সবাই ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু অন্ধকারে অচেনা, অজানা স্থানে কোথায় নেব বিশ্রাম? তাছাড়া এখন সময় নেই বিশ্রামের।

রাত শেষ হলো। চারিদিকে ভোরের আলো ফুটেছে। গাছ-গাছালির পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের সূর্যের আলো সোহাগ পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল। ভোরের পাখীদের কলতানে বনাঞ্চল মুখরিত হয়ে উঠছিল। দিনের আলোয় সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পথঘাট চিনতে আর চলতে কিছুটা সুবিধে হবে হয় তো এবার। তাই মিনিট দশেক সবাই একটু বিশ্রাম নিলাম। তারপর ...। আবার যাত্রা শুরু। আগের পথচলার অভিজ্ঞতাগুলো আবার ডিঙ্গিয়ে চললাম।

বেলা বাড়ছে। মাথার উপর সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। আমরা প্রায় পাহাড়ের শেষ প্রান্তে। আর একটু এগুলেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। দুপুর ১২টা বেজে ৫ মিনিট। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছে গেলাম। শত্রুরা তখন হাটহাজারী পুলিশ স্টেশনে ছিল। আমরা এখানে পৌঁছেই শত্রুদের প্রকৃত অবস্থা জানতে তৎপর হলাম। ওরা কি পরিমাণে, কোথায় কোথায় কি ধরনের শক্তি নিয়ে আছে সর্বাগ্রে তা আমাদের জানা দরকার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা জানতে চেষ্টা করা ঠিক হবে না তাই চুপচাপ নিজেদের অবস্থা সুদৃঢ় করতে লাগলাম। আমরা সেখানে বাঙ্কার করে 'পজিশন' নিয়ে বসতে শুরু করলাম।

ইতিপূর্বে চতুর্থ বেঙ্গলের যে দলটি চিটাগাং-রাঙামাটি রোড ধরে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়েছিল তারা কোথায়, কদ্দুর অগ্রসর হয়েছে তা জানার জন্য আমি তিনজন লোকের একটা দলকে গোপনে সে রাস্তা ধরে পাঠালাম। বেশীক্ষণ লাগলো না। ওরা খবর নিয়ে এলো ওরাও হাটহাজারীর প্রায় ৩/৪ মাইল দূরে ঘাটি ফেলেছে। আমি তখন ওদের সাথে যোগাযোগ করলাম। এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পরস্পরের সাথে আদান-প্রদান করলাম।
ক্রমে রাত হয়ে আসছিল। আমরা চুপচাপ রাতটা কাটানোর মনস্থ করলাম। বুঝতে পারলাম ওরাও আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেনি। চুপচাপ ১৪ই ডিসেম্বরের রাত কেটে গেল। আমরা সকাল হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুদের উপর আক্রমণ শুরু করলাম। তখন ওদের তরফ থেকে বেশ শক্তিশালীভাবেই আক্রমণের প্রতিউত্তর আসলো। বুঝা গেল ওরা বেশ মজবুতভাবেই হাটহাজারীতে ঘাঁটি করেছে।

আমরাও তাই দুপুর নাগাদ ওদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালালাম। ওরা আমাদের আক্রমণের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলো। ২৪ এফএফএর বি কোম্পানীর মেজর হাদীসহ সবাই আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আমরা তখন হাটহাজারী ছাড়িয়ে গিয়ে নয়াপাড়া ক্যান্টনমেন্টের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে লাগলাম। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন গাফফারের অধীনে পরিচালিত চতুর্থ বেঙ্গলের দলটিও আমাদের সাথে এসে মিলিত হলো।

ওদিকে মিত্রবাহিনী ও লেফটেন্যান্ট দীদারের অধীনে ১০ম বেঙ্গলের যে চার্লি কোম্পানী ছিল তারা ১৫ই ডিসেম্বর কুমীরার উপর প্রচন্ড হামলা চালায়। কুমীরার শত্রুরা এ আক্রমণের মুখে বেশীক্ষণ টিকতে পারলো না। তারা পালিয়ে ওদের পরবর্তী ঘাঁটি ফৌজদারহাটে যেয়ে মিলিত হলো। আমাদের চার্লি কোম্পানী ও মিত্রবাহিনীও আরো এগিয়ে গেল। আমাদের মত তারাও ফৌজদারহাটের শত্রুদের উপর প্রচন্ড চাপ দিতে থাকে। তখন সময়টা ছিল ১৫ই ডিসেম্বরের রাত। আমরা যেভাবে নয়াপাড়া ক্যান্টনমেন্টের উপর চাপ দিতে লাগলাম। তেমনি কুমীরা থেকেও আমাদের চার্লি কোম্পানী ও মিত্রবাহিনী ফৌজদারহাটের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। বারবার তাদের আত্মসমর্পণ করার জন্য ঘোষণা করতে লাগলাম। কিন্তু তবুও আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলো না। কিন্তু আমরা জানতাম আত্মসমর্পণ ওদের করতে হবে। এছাড়া ওদের কোন পথ নেই।

১৫ই ডিসেম্বর সকাল। নিয়াজীকে নির্দিষ্ট সময় দেয়া হলো আত্মসমর্পণের। আমরাও বারবার শত্রুদের নির্দেশ দিয়ে চললাম আত্মসমর্পণের জন্যে। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু পরে নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলো। বাংলাদেশের প্রত্যেক রণাঙ্গণেই মিত্র ও আমাদের মুক্তিবাহিনীর অধিনায়কদের হাতে পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করতে লাগলো।

অবশেষে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ও ফৌজদারহাটের পাকসেনারা সবাই আমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করলো। আমরা সবাই আবার মিলিত হলাম এক জায়গায়।

চরমপত্র

মুহম্মদ রওশন আখতার মুকুল

যুদ্ধ বাঙালীকে দিয়েছে স্বাধীনতা। কিন্তু যুদ্ধে বাঙালী হারিয়েছে অনেক কিছু। বন্ধু, ভাই, ভিটে, হালের বলদ, সতীত্ব, সন্তান। '৭১ সালের দিনগুলো স্মৃতি হয়ে যাচ্ছে, হারানোর ব্যথা তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধে যাচ্ছে আরো গভীরে। হারিয়ে যাচ্ছে উদ্দাম মাতাল দিনগুলোর স্মৃতি শূন্যতা প্রচুর অবসর দিচ্ছে, হারাচ্ছে, শুধু হারাচ্ছে। এবং যুদ্ধের পর হারিয়েছে একটি জিনিস একজন নয়, হারিয়েছে প্রতিটি বাঙালী হারিয়েছে তাদের প্রিয় চরমপত্র।

গ্রামের কাচারীঘরে মাগরেব সেরে মৌলবী সাহেব গুটিশুটি হয়ে ঢোকেন না, রেডিও-এর পাশে ঘন হয়ে আর লোক অপেক্ষা করে না, বাড়ির কাজের লোকটি দ্রুত কাজ শেষ করে না রেডিও শুনতে হবে বলে। রেডিও আর যুদ্ধের খবর দেয় না, আর চরমপত্র হয় না। সত্যি বলতে কি যুদ্ধে সবচে বেশী হারিয়েছে রেডিও। হারিয়েছে তার লক্ষ লক্ষ শ্রোতা। একেবারে এতিম হয়ে গেছে রেডিও। অথচ সেই চরমপত্রের মুকুল ভাই, এম আর আখতার ওরফে মুকুল এখন রেডিওর সর্বময় কর্তা ডিরেক্টর জেনারেল। দশ মিনিটের রাজা নন, সর্বক্ষণের রাজা। রাজাই বটে।

মনে করা যাক: একটা ঘর, ঘরের ভেতর একশ জন লোক [...] ছোট ছোট গ্রুপ হয়ে। সবচেয়ে বড় গ্রুপটা আসুন দেখা যাক, হ্যাঁ, এখানে, একজন গল্প করছেন, লম্বা, চশমা চোখে বড়সড় এক ভদ্রলোক। চেনেন না আপনি আপনি এগিয়ে গেলেন। আলোচনার বিষয় হচ্ছে, ফিফটি সিক্সের বন্যা, ভূতের গলি, ঘোড়ার আস্তাবল, খাজা নাজিমুদ্দিনের ভাষণ ইত্যাদি। না, না হ্যাঁ করে শুনছেন

কি, সুখে আছি ঢুকবে। সরে এসে দেখুন আরো দশ মিনিট। আশেপাশের কথকদের শ্রোতারা দল ত্যাগ করেছেন। অবশেষে অন্য কথকরাও তাদের অনুসরণ করছেন। এবার দেখুন, পুরো ঘরে একজনই কথক। কথার বিষয় তখন নাজিমুদ্দিন থেকে ছিটকে চলে এসেছে সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদে। কথক আখতার সাহেব। ঘরের মধ্যে রাজা তিনিই, কথার রাজা।

১৯৭১ সালে মার্চ মাসে ঢাকার একটা পত্রিকা লোকে খুঁজে কিনতো। সাপ্তাহিক পত্রিকা নাম স্বরাজ। তোপখানা রোডে অফিস। সম্পাদকঃ ফয়েজ আহমদ। আর সঙ্গে ছিলেন এম আর আখতার মুকুল। অসহযোগ আন্দোলনে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অসাধারণ। আমার মনে হয় অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে পত্রিকাটা দেশের জন্যে যে বড় কাজ করেছে তা হচ্ছেঃ আখতার সাহেব দেশত্যাগ করতে বাধা হয়েছিলেন অনেকটা স্বরাজের জন্যেই। তিনি মুজিবনগর গিয়েছিলেন বলেই [...]। ২৬শে মে, '৭১ সাল প্রথম চরমপত্র পড়বেন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে। আখতার সাহেব সে সময়কার স্মৃতি-চিত্রণ করছিলেন, প্রথম চরমপত্রের ভাষা এবং পড়ার ভঙ্গি সাধারণ এবং স্বাভাবিক ছিল। আমি আস্তে আস্তে দু'একটা শব্দ ব্যবহার করলাম, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় যোগ আছে, অথচ আমরা লেখায় ব্যবহার করি না। কারণ ততদিনে আমি নির্ধারণ করে নিয়েছি আমার শ্রোতা কারা, কাদের জন্যে আমি পড়ছি। আমি জানতাম হানাদার অধীকৃত আমার দেশের সাধারণ মানুষ কিভাবে বসে থাকে রেডিওর সামনে আগ্রহ নিয়ে। প্রশ্ন করলাম, আপনি যে ভাষা এবং বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গিটা বেছে নিয়েছিলেন সেটা একেবারে নতুন ধরনের ছিল, আপনি কি সিওর জানতেন এটা শ্রোতারা এভাবে গ্রহণ করবে, ভাল বাসবে?

জানতাম। আখতার সাহেব প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে হাসলেন, আমি সাংবাদিক। উনিশ শ চুয়ান্ন সালের ইলেকশনে আমি ঘুরেছি বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে। আমি মানুষের সঙ্গে মিশেছি, তাদের মানসিকতা আমার ভালভাবেই জানা। আমি দেখেছি ভাসানী, শেরে বাংলা এবং বঙ্গবন্ধুর মিটিং। বাংলাদেশের এই তিন নেতা বক্তৃতা করেন এবং করতেন সাধারণ ভাষায়। তারা অনেক কঠিন কথা লক্ষ্য মানুষের মিটিং-এ বুঝিয়ে বলতেন গল্পের সাহায্যে, উপমার সাহায্যে। আমি সেই ভঙ্গিটি নিয়েছিলাম। গল্প দিয়ে, বিশেষ করে প্রচলিত গল্পের সাহায্যে বক্তব্য পরিচিত করে তোলা যায়, তুলনা দিয়ে স্পষ্ট করা যায়।

এত গল্প কিভাবে সংগ্রহ করতেন? আমি ঢাকায় থেকেই ভূতেরগলি, নাজিরাবাজার, দয়াগঞ্জ, মসিহ লেন। এসব এলাকার লোকের রসিকতা বিখ্যাত। তাঁদের সঙ্গে মিশে, দূর থেকে লক্ষ্য করে আমি অনেক গল্প রসিকতা শুনতাম, জানতাম। এরাই

আমার গল্পের মূল উৎস। তারপর পারিবারিক গল্প সাংবাদিক জীবনে নিউজ টেবিলের রসিকতা, রাজনৈতিক মহলে রসিকতাও আমি ব্যবহার করেছি। এতো গল্প মনে পড়তো না সব সময়। মনে করিয়ে দিতেন আমার স্ত্রী। – আখতার সাহেব এখানে এসে একটু হাসলেন, আমার স্ত্রী পত্রিকা থেকে খবর সংগ্রহ করে রাখতেন। রাতে উঠে লিখতে বসতাম। লেখায় আমি কিছু কল্পনার আশ্রয় নিতাম। সেগুলো মিলিয়ে কিছু সত্যি ঘটনার সাথে। যেমন ধরুন পাকিস্তান রেডিওর খবরে বলা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছে ভারতীয় চররা খাদ্যবাহী ট্রাক উড়িয়ে দিয়েছে। আমি কেন দেশের অনেক লোকই বুঝে নিল ওটা কিসের ট্রাক ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলাম ঘটনাটি অন্যভাবে। এবং আরো কয়েকটি দালাল শ্রেণীর নাম দিলাম জড়িয়ে। ঘটনাটা দেখা গেল আমার বর্ণনাটাই সত্যি তারপর লোকের কাছে দালাল সম্পর্কে বলা কথাগুলোও সত্যি হয়ে যেতো। হাসতে হাসতে বললেন, জানেন, যখন ইত্তেফাকে চীফ রিপোর্টার ছিলাম তখন এরকম অনেক কিছু করতে হয়েছে। এসব মিথ্যে বলতেই হয়েছে একটা সত্যিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই একজন লোক মানিক মিয়া, ইত্তেফাক সম্পাদক, তোফাজ্জল হোসেন জানতেন এদেশের মানুষকে। হ্যাঁ, চরমপত্র লিখতে গিয়ে মানিক ভাইকেও স্মরণ রাখতাম। তার রাজনৈতিক-মঞ্চও ছিলো সাধারণ মানুষের জন্যে।

ইত্তেফাকে চীফ রিপোর্টার ছিলেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত। বেতন ছিল ১৯০ এবং ৫০ টাকা কনভেন্স। এ সময়কার ইত্তেফাকের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। কিন্তু ইত্তেফাকের অর্থনৈতিক অবস্থা কোনদিনই ভাল হয়নি। এখান থেকে আজাদে জয়েন করেন। ১৯৬২ সালে এর ব্যুরো চীফের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জীবনে অনেক চাকরি ছেড়েছেন, নিয়েছেন। 'তেরটা স্কুলে পড়েছি, তিনবার বাড়ী থেকে পালিয়েছি।' বলে আখতার সাহেব খুন খুন করে হাসেন। উনপঞ্চাশ সালে জেলে যান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ১৯৫০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মুক্তি পাই। ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা আসি। সেদিন ঢাকায় পঞ্চাশের দাঙ্গা শুরু হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী যাই বরিশাল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী বরিশালে রায়ট শুরু। ঢাকায় ফিরে এসে জয়নাগ রোডে উঠি। ল'তে ভর্তি হই। সাত বছর ল'পড়েছি, কিন্তু কোনদিন কার্জন হলে যাইনি।' কার্জন হলেই আগে সব পরীক্ষা হতো।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের রাজপথ রক্তে লাল হল। ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর্মি বেরিয়ে এল শহরে। ছাত্ররা শহর ত্যাগ করলো। কিন্তু সলিমুল্লাহ হল থেকে একটা মাইক নির্দেশ নিয়ে যেতে লাগলো জনগণের উদ্দেশ্যে, একভাবে। পরেব হরতাল, কখন জানাজা, কবে কালোব্যাজ, কবে খালি পা। পথচারীরা শুনতো একক মাইকের ঘোষণা। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে যেতো

শহরের অলিতে গলিতে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের একক কণ্ঠস্বরটি ছিল আখতার সাহেবের।

বললাম, বাহান্নো আর একাত্তর – আপনার কণ্ঠস্বর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। হাসলেন সশব্দে বললেন, 'আমি কিন্তু ইসরাফিলও পড়েছি রেডিওতে।' ২৬শে ফেব্রুয়ারী আর্মি সলিমুল্লাহ হল প্রবেশ করে। আখতার সাহেব খালি পায়ে, লুঙ্গি, গেঞ্জি পরনে বেরিয়ে পড়েন হল থেকে। তাকে কেউ বাধা দেয়নি।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সে ছাপড়াঘরের চা-দোকানে বসে এক কাপ চা খেলাম। এবং বসে বসে খদ্দেরদের কথাবার্তা শুনছিলাম। এখানেই নবাগত রসিক রিকশাওয়ালা বন্ধুদের জানায় রোজ রোজ কার্ফু। কার্ফুর ভেতরে হইলো মাইয়া। নাম ভী রাইখ্যা দিলাম কার্জু বিবি। ওখান থেকে বের হয়ে ধরলাম উত্তরবঙ্গের ট্রেনে। না, বগুড়া বা দিনাজপুর যায়নি, সোজা ভারত। আমি বাহান্নো সালেই হাজী হয়েছি।' আখতার সাহেব হাসলেন।

কোলকাতা গিয়েছিলেন। তিনি সে সময় কোলকাতাবাসীদের কাছে ঢাকার কথা বলে অবাক করে দিতেন। ওরা ভাবতে পারতো না বাঙালী মুসলমানরা ভাষার জন্যে জান দিয়ে দিতে পারে। কোলকাতার চাকুরি নেন এক ইন্সুওরেন্স কোম্পানীতে। অবশ্যি বেশীদিন থাকেননি। ঢাকায় ফিরে এসে বিচিত্রতর চাকরির অভিজ্ঞতা হয়। সংবাদের সহ-বিজ্ঞাপন ম্যানেজার ছিলেন কিছুদিন। সে সময় বিজ্ঞাপন ম্যানেজার ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দিন। ম্যানেজার আবদুল গনি হাজারী। কয়েক জায়গায় কেরানীর কাজ করেন। তারপর পুলিশের একটি বিশেষ দফতরে উড়ো চিঠি খোলার কাজ নেন। এসব চিঠিতে বেনামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অপরাধ সংক্রান্ত খবর থাকতো।

এসময় গুলিতে থাকতেন ১০ বাসা-বাড়ি লেনে, অগত্যা অফিসে। এখানে থাকতেন বড় ভাই মুস্তফা অগত্যা সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও ফজলে লোহানী, খালেদ চৌধুরী। এখানে আসতেন হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মাহবুব জাহেদী। সংবাদের চাকরিটা হারাতে হয় বিয়ে করতে গিয়ে। এয়ারফোর্সে মনোনীত হয়েও যাননি। ১৯৫৩ তে ইত্তেফাকে ঢোকেন। এখান থেকে বলতে গেলে শুরু হয় সত্যিকারের সাংবাদিক জীবন।

১৯৭১ সালে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ত্যাগ করেন। প্রথম যান বগুড়া। ওখানে তখনও চলছিল প্রতিরোধের যুদ্ধ। তারপর সবার সাথে তিনি ভারতে চলে যান।

চরমপত্র ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। জনগণের মনোবল অটুট রেখেছে কয় মাস, সাহস জুগিয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং

তাদের জেনারেলদের শক্তি সম্পর্কে যাদের আস্থা ছিল বিরাট তাদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। করে দিয়েছেন হাস্যাস্পদ। দালালদের বানিয়েছেন নর্দমার কীট। দালালরা চরমপত্র শুনে দুর্বল এবং ভিত হয়ে পড়তো। যার নাম চরমপত্রে বলা হতো সে পাক-আর্মির কাছে শাস্তী দাবী করতো।

কিভাবে প্রত্যেকদিন একটা করে লিখতেন? বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করেছিলাম। 'লিখতাম উৎসাহে। লিখতে হতো। জানতাম এটা লোকে চায়। এটাই আমাকে উৎসাহিত করতো। ফ্রন্ট থেকে গেরিলা এসে আমাকে ধন্যবাদ জানাতো, তাতে আমি লেখার উৎসাহ পেতাম।

'ভারতীয়রা এটাকে কিভাবে নিতো?' 'ওখানেও আমি বেশ জনপ্রিয় ছিলাম। কোন সভায় আমি গেলে তারা স্টেজে না উঠিয়ে ছাড়তো না।'
'বঙ্গবন্ধু আপনার পাঠ সে সময় শুনতে পারেননি পরে শুনিয়েছেন?' হ্যাঁ শুনিয়েছি, বঙ্গবন্ধু খুব হাসছিলেন।

লোকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাকে দেখতে আসে। অনেকে অনেক উপহার সঙ্গে আনে। কৃতজ্ঞতা জানায়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। বিচিত্রা অফিসে একটি চিঠি এসেছে খেতাব দেওয়া হলো, কিন্তু এম আর আখতার মুকুলকে দেওয়া হলো না কেন? যুদ্ধের পর আখতার সাহেব ব্যস্ত মানুষ। আড্ডাবাজ মানুষের জন্যে এটা অস্বস্তিকর। কিন্তু জেনে মানিয়ে নিতে হচ্ছে, মানিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু রোববারে তাকে দেখা যাবেই পুরানো আড্ডায়, প্রেসক্লাবের তাসের টেবিলে। সারাদিন তাস পেটাচ্ছেন উচ্চস্বরে হাসছেন, গল্প করছেন।

এটাই আসল এম আর আখতার মুকুল। সবার মুকুল ভাই। পুনশ্চঃ অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম মুকুল ভাই অনেক উত্তর দিয়েছিলেন, অনেক গল্প শুনিয়ে দিয়ে যাব পুরোটাই পাঠকদের জন্যে সুখপাঠ্য হতো। কিন্তু সম্ভব হলো না। চরমপত্রের রেকর্ড বেরিয়েছে কোলকাতা থেকে – সবকটা চরমপত্র একত্র করে বইও বের করেছেন।

মুকুল ভাই একটি প্রশ্নের উত্তর দেননি। জিজ্ঞেস করেছিলাম দেশের এই অবস্থা সম্পর্কে চরমপত্র পড়তে বললে কি পড়বেন? মুকুল ভাই মৃদু হাসলেন এবং হাসতে হাসতেই অন্য প্রসঙ্গে গেলেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও বাংলাদেশ

মাহফুজউল্লাহ

তিন লক্ষ আটক বাঙালীর মুক্তি প্রশ্ন এবং তাদের আপনজনদের উদ্বেগ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভবতঃ এগুলোই এ উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে এ উপমহাদেশে যে নয়া রাজনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে তাতে জড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান।

ষোলই ডিসেম্বরের পর ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে নব্বই হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী। পরাজয়ের গ্লানি থেকে যে প্রতিহিংসা উদ্ভুত তার ফলে পাকিস্তানে আটকে আছেন তিন লক্ষ নিরীহ বাঙালী। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এদেরকে আটকে রেখে স্বদেশে মুখরা করতে চান এবং একই সাথে বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগে প্রত্যাশী। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের প্রতি বাংলাদেশের মনোভাব অনেক আগেই ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ সরকার। এ পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বাংলাদেশ যত বিবৃতি ও মন্তব্য প্রকাশ করেছে সেগুলোকে এক সাথে দেখলে এরকম দাঁড়ায়:

(ক) যারা বাংলাদেশে হত্যা, ধর্ষণ, লুট ইত্যাদি চালিয়েছে সেই সব পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশে হবে।

(খ) বাংলাদেশে আটক বাঙালী ও পাকিস্তানীদের পরস্পরিক বিনিময়ে আগ্রহী।

(গ) বাংলাদেশ তার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় রাজী আছে।

(ঘ) যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দিতে বাংলাদেশের আপত্তি নেই।

অতিসম্প্রতি যুদ্ধবন্দী ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশের যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য সে বিবৃতির প্রতিলিপি সুইস দূতাবাসের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে পাকিস্তানে। সাম্প্রতিক বিবৃতি পাকিস্তানকে খুশী করতে পারেনি। তাই প্রেসিডেন্ট ভুট্টো নতুন হুংকার ছেড়েছেন। তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রসঙ্গটিকে আটক বাঙালীদের ভাগ্যের সাথে এক করে দেখছেন। তিনি চান যুদ্ধাপরাধীদের শর্তহীন মুক্তি অন্যথায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সমসংখ্যক বাঙালীর বিচার।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর এই ঔদ্ধত্য উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি। তার এই মনোভাব বজায় থাকলে উপমহাদেশে উত্তেজনা বজায় থাকবে, সমস্যার সমাধান হবে না। ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের কাছে যুদ্ধবন্দীরা আত্মসমর্পণ করলেও বর্তমানে রয়েছেন ভারতীয় যুদ্ধবন্দী শিবিরগুলোতে। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধবন্দীদের ব্যয়ভার বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে [...] সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছেঃ বাংলাদেশ ইজ এবসলিউটলি রাইট ইন মেনাটে [...] দ্যাট দ্যা কোশ্চেন অব দ্য নাইনটি থাউসেন্ড পি ও ডব্লিউস উইল হ্যাভ টু বি সেটেলড জয়েন্টলি বাই ইন্ডিয়া এন্ড ইটসেলফ। সিনস কীপিং দি পি ও ডব্লিউস হ্যাজ বিকাম এ হ্যাভি ইকোনমিক বার্ডেন এ পার্ট ফ্রম বিইং এম্বনিশন ফর আনফেয়ার প্রপাগান্ডা, বাই ইসলামাবাদ এন্ড ইটস ফ্রেন্ডেস ইট ইজ ইন দ্য ইন্টারেস্টস অব বোথ ইন্ডিয়া এন্ড বাংলাদেশ টু সর্ট আউট অল কমপ্লিকেশন্স সো এজ টু গেট দিস এনকামবেনস আউট অব দ্য ওয়ে। ওয়ান স্টেপ ইন দিস ডাইরেকশন উইল বি টু রিমুভ অল হেঁসিটেশন অন হোয়াট টু ডু এবাউট দ্য ওয়ার ক্রিমিন্যালস উইদাউট নেসেসারি ডিলে।

ভারতের উপর অর্থনৈতিক সংকটের চাপ সৃষ্টি করার জন্যই হয়তো প্রেসিডেনট ভুট্টো যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে এই টালবাহান শুরু করেছেন। অপরদিকে স্বদেশে মুখ রক্ষা করবার জন্য তিনি এও চান যে – কোনমতেই আটক পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হতে দেবে না। একই সাথে বহির্বিশ্বে সমবেদনা অর্জনের জন্য যুদ্ধবন্দীদের স্ত্রীদের বিদেশে পাঠিয়েছেন প্রেসিডেনট ভূট্টো। এরা মানবতার প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছেন সামনে। অনেকক্ষেত্রে এরা সহানুভূতিও পেয়েছেন। মানবতার কারণে যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেয়ার জন্যে পশ্চিমা কূটনৈতিক মহলে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে তা ভাবিয়ে তুলেছে নয়াদিল্লীকে। নয়াদিল্লীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণলয়ে এসব মন্তব্য সাধারণত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাই যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেবার ব্যাপারে আগ্রহী নয়াদিল্লী।

কিন্তু যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গটি এককভাবে ভারতের এখতিয়ারে নেই। যখনই যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তখনই বাংলাদেশকেও সে আলোচনার ও সিদ্ধান্তের অংশীদার হতে হবে। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বাংলাদেশ আগাগোড়া একটি কথাই বলে এসেছে – তাহলো এই বাংলার মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা অনেক হবে। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে তা এসে দাঁড়িয়েছে একশ পঁচানব্বই জনে। যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে না দিলে যদি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে বাংলাদেশের মাথাব্যথা নেই। ইতিমধ্যে একশোটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন বাংলাদেশের কাছে তার অস্তিত্বের প্রশ্ন বড় প্রশ্ন নয়। বাংলাদেশের কাছে বড় হলো জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা। যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার ব্যাপারে অটল থাকা। বাংলাদেশে এখন বহু পরিবার রয়েছেন যাদের আপনজন আটকা পড়েছে পাকিস্তানে। সেইসব উদ্বিগ্ন পরিবারদের কাছে আপনজনদের ফিরে পাওয়াই প্রধান সমস্যা। তাই অনেকে হয়তো বিনাবিচারে যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তিকে খারাপ চোখে দেখবেন না। কিন্তু যাদের আপনজন নিহত হয়েছেন, যে নারী তার সন্তানকে বিসর্জন দিয়েছে যে পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে এই যুদ্ধাপরাধীদের হাতে – তাদের কাছে সরকার কি জবাব দেবেন? প্রেসিডেন্ট ভূট্টো কতদিন নিরীহ বাঙালীদের আটকে রাখবেন? পাকিস্তানী যুদ্ধবাজদের রণউন্মাদনা কতদিন অব্যাহত থাকবে? অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট, যুদ্ধবন্দীদের পরিবারের চাপ – ইত্যাকার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভূট্টোকেও মাথা ঘামাতে হয়। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বাংলাদেশ যে উদারতার পরিচয় দিয়েছে তা যথেষ্ট। এর বেশী উদারতার পরিচয় দেয়া বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যথায় তা হবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অস্বীকৃতি।

একটি জাতির জন্ম

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহ্‌মান

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মিঃ জিন্নাহ যে দিন ঘোষণা করলেন উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা আমার মতে ঠিক সেদিনই বাঙালী হৃদয়ে অংকুরিত হয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ। জন্ম হয়েছিল বাঙালী জাতির। পাকিস্তানের স্রষ্টা নিজেই ঠিক সেদিনই অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপণ করে গিয়েছিলেন এই ঢাকার ময়দানেই। এই ঐতিহাসিক নগরী ঢাকাতেই মিঃ জিন্না অত্যন্ত নগ্নভাবে পদদলিত করেছিলেন আমাদের জনগণের জন্মগত অধিকার। আর এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতেই চূড়ান্তভাবে খন্ড বিখন্ড হয়ে গেলো তার সাধের পাকিস্তান। ঢাকা নগরী প্রতিশোধ নিল জিন্না ও তার অনুসারীদের নষ্টামীর। প্রতিশোধ নিল যোগ্যতমভাবেই। মহানগরী ঢাকা চিরদিন ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মুক্তি সাধনের পীঠস্থান। সে এবারও হয়েছে মুক্তির উৎস রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার বিশ্বের নির্যাতিত জনতার গর্বের শহর আশার নগর রূপে।

অতিপ্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির আশায় ঢাকা নগরীর বীর জনতা সংগ্রাম করেছে বীরত্বের সাথে। সংগ্রাম করেছে হানাদার, দখলদার দস্যুব্যহিনীর বিরুদ্ধে। দস্যুবাহিনীর নৃশংসতা আর হত্যার বিরুদ্ধে শির উঁচু করে রুখে দাঁড়িয়েছে ঢাকার মানুষ। সংগ্রাম করেছে দৃঢ়তার সাথে। বর্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এই ঢাকা নগরীতেই। এই বীর নগরীর পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছি আমি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের দিন কয়েকের মধ্যেই। বীর নগরীর পবিত্র

মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমি এই সংগ্রামী ঢাকা ও ঢাকাবাসীর উদ্দেশ্যে শির নত করেছি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়।

পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহ খানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতি কথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প। সৈনিকরা স্বাভাবতই সেই বিরল শিল্প ক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙে দু'ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহতি পরেই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচী। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাশ করি ম্যাট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে। অফিসার ক্যাডেট রূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানী বাহিনীতে।

স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গি অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুল জীবনেই বহুদিনই শুনেছি আমার স্কুল-বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়ীতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই, শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানী তরুণ সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালীদের ঘৃণা করতে। বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেওয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের বাঙালীকে নিকৃষ্টতর মানব জাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে প্রত্যাঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো। সযত্নে এই ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো। জোরদার হলো। পাকিস্তানী পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উদগ্র কামনা জাগত পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।

১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনের। আমি তখন করাচীতে। দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন। পাকিস্তানী সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম মনে

করতো আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের সংগ্রামের। এরপর এলো আইয়ুবী দশক। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ, সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন দশকে স্বপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালী সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এই হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালা বদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ; আমাদের বুদ্ধিজীবীমহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসল সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চরণে এদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উপাদান হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানিন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক এক সময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নতর করবার সরকারী অভীপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশে প্রশাসক ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বললেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ম্ভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তখন তারাই দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাচ্ছিলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো তেমনি একটা ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানী কমান্ডার। সেই ব্যাটেলিয়ন এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটেলিয়ন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটেলিয়নই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটেলিয়ানের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানী ছিল আমার কোম্পানী আলফা কোম্পানী। এই কোম্পানী যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত, উনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালবীর (সাঁজোয়া

বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানীর জওয়ানরা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহু সংখ্যক প্রতিপকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করে এই কোম্পানী অর্জন করেছিল সৈনিক সূলভ মর্যাদা, প্রশংসা করেছিল তাদেরও প্রীতি। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি, হাত মিলিয়েছি। আমাদের ভালো লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখেছিলাম তারাও অত্যন্ত উচ্চমানের সৈনিক। আমরা তখন মত বিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটা হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাই-এর মত দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানীরা ভাবতো বাঙালীরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালী জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানীরাই বরং লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী, সরকারী কর্মচারী, সেনাবাহিনী আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলা ভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালীদের। তারা এটাকে বলতো বাঙালী জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়ে ছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলতো বাঙালী জাতির মাথা গুড়িয়ে দাও। কেউ বলতো ভেঙে দাও এর শিরদাড়া। এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানীরা বাঙালীদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালীদের উপর ছড়ি ঘুরাতে। কেড়ে নিতে চাই বাঙালীদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকরূপে বাঙালীদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে আনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার নীচে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালীদের আশা-আকাড়া মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়লো বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগলো তখন পুলকের শিহরণ। যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে উদ্বেলিত হলাম আমরা সবাই। পর্বতে ঘেরা এবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা, বাঙালী ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাধ ভাঙ্গা আনন্দের তরঙ্গমালা। একাডেমী কাফেটারিয়ায় নির্বাচনী বিজয় উৎসব

করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়, এ ছিল আমাদের অধিকারের জয়, এ ছিল আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানী ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করলো তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম, অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হলো না। ঠিক হলো এর ফয়সালা হবে মুষ্টিযুদ্ধের মাধ্যমে। বাঙালীদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লাভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানী গোয়ার্তুমীর মান বাঁচাতে এগিয়ে এলো এক পাকিস্তানী ক্যাডেট নাম তার লতিফ (পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরে এখন সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) লতিফ প্রতিজ্ঞা করলো আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা না বলতে পারি সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে।

এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানপন্থী আমার প্রতিপক্ষ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে।

এই ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতেও বাঙালী অফিসারদের আনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটিকয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখতো, অবহেলা করতো, অসম্মান করতো। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালী অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটতো না কোন স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটতো শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করতো আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমীর ক্লাসগুলোতেও সব সময় বোঝানো হতো, আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমন কি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো – আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।

বাঙালী অফিসার ও সৈনিকরা সব সময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানী অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদগুলো আর লোভনীয় নিয়োগপত্রের শিকারগুলো বরাবরই ছিঁড়তো পাকিস্তানীদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য

পাঠানো হতো না বাঙালী অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। পাকিস্তানীদের সমন্বয়ে গঠিত পাকবাহিনীর এক প্রথম শ্রেণীর সাজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাংকের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানীরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালী সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্প জেগে ছিল তাদের। এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালী পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালী জনগণের। তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালী সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালী সৈনিকের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ।

এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালীদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালী সৈনিকদের মনে। বিমান বাহিনীর বাঙালী জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম বিশ্বের যে কোন বাহিনীর মোকাবিলায় আমরা সক্ষম।

জানুয়ারী মাসে আমি নিযুক্ত পেয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে প্রশিকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমীতে শুরু হলো আমার শিক্ষক জীবন। পাকিস্তানীদের আমি সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োগ করলাম। আমার সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগালো আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

সামরিক একাডেমীতে থাকার সময় অনেক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। যেখানে গেছি বাঙালী ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানীদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানীদের দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন, আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনো তেমনিভাবেই বাঙালী ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা, অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালী ছেলেদের, ভালো ছেলেদের নেওয়া হতো না ক্যাডেটরূপে। রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমীতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ

করলো। একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব বিষয়ের ভালো ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশুনা করলাম। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বৃটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল বিদ্রোহ হিসেবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না, এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক বুদ্ধিজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালীকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিল বাঙালী সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের। বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে গেল তারা। তাদের উপর পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সব বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলা হলো। একটি কণ্ঠে সোচ্চার হলো তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবীতে। ইসলামাবাদের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অস্ত্র তুলে নেওয়ার মধ্যেই যে আমাদের দেশের বাংলাদেশের কল্যাণ নিহিত তাতে আর কোন সন্দেহই ছিল না আমাদের মনে। এটাও আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের আরেক দিকদর্শক। এ সময় থেকেই এ ব্যাপারে আমরা মোটামুটিভাবে খোলাখুলি আলোচনাও শুরু করেছিলাম।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানে আমি ছিলাম সেখানে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানী। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানিন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করলো। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে তাই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি। এবং এর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সে যা বলছে তা জেনেশুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য

সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লেফটেন্যান্ট কর্নেল তা আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে তারা বাঙালী নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি – এসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায় – ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে। ভাবগতিক যে বেশী সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি তা বুঝতে পারি। সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানী যাই। এই সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এক রাজনৈতিক বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়।

পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থানকালে আমি একদিন দেখি সামরিক এ্যাটাচী কর্নেল জুলফিকার সে সময়ের পকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কারিগরি এ্যাটাচীর সাথে কথা বলছিল। এই ব্যাক্তিটি ছিল এক সরলমনা পাঠান অফিসার। তাদের সামনে ছিল করাচীর দৈনিক পত্রিকা ডনের একটা সংখ্যা। এতে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়হিয়ার ঘোষণা ১৯৭০ সালের নির্বাচন হবে। সরলমনা পাঠান অফিসারটি বলছিল নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে জয়ী হবে আর সেখানেই হবে পাকিস্তানের সমাপ্তি। এর জবাবে কর্নেল জুলফিকার বললো, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রে সে ক্ষমতা পাবে না। কেননা অন্যান্য দলগুলো মিলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি এটা জেনে বলছি। এ সম্পর্কে আমার কাছে বিশেষ খবর আছে।

এরপর আমি বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন-কমান্ড। এর কয়েক দিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী অফিসাররা মনে করতো, চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতংকের ছবি। তাদের এই আতংকের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা বাঙালী অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটেলিয়নকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটেলিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর বাজারে। ১৯৭১

সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটেলিয়নকে পাকিস্তানের খারযানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর জন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল দু'শ জওয়ানের এক অগ্রগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ছিল তিনশ পুরনো ৩০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টিট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণন্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়ীতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারীদের বাড়ীগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যার তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

তারপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো। এই সময়ে আমার ব্যাটেলিয়নের এনসিওরা আমাকে জানালো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বেলুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালী পাড়ায়, নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালীদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালীকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা যেয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালী হত্যা ও বাঙালী দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো, আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালী জাতি চিরদিনের জন্যে দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভাবতঃ ৪ঠা মার্চে ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরী করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালী ও পাকিস্তানী সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

১৩ই মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানীদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিশনে আসা যাওয়া শুরু করলো। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ই মার্চ স্টেডিয়ামে হাবআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লেফটেন্যান্ট কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দু'দিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১শে মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজ সভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমীকে বললো ফাতমি, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুল সংখ্যক বাঙালী। সশস্ত্র সংগ্রাম নিয়ে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালো রাত। ২৫শে ও ২৬শে মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনী ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানী) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিন জন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটেলিয়নের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শার্দূলের মত প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে। আমরা বন্দরের পথে বেরোলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দুরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালীকে ওরা হত্যা করেছে।

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়য়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটেলিয়ন তৈরী রাখতে

আমি আসছি। আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই। এতে তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে। সে আমার কথা মানলো। রাইফেল তাক করে বললাম হাত তুলো, আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। পরমুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম, তারা ছিল আট জন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলা শুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম। দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটেলিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটেলিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম – ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা। এঁদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাঁদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলো।

সময় ছিল অতিমূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও, আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবাই জানতো, আমি সংক্ষেপে

সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালীর হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের এই দিনটিকে স্মরণ রাখতে, ভালোবাসতে, এইদিনটিকে তারা কোনদিন ভুলবে না। কো-ন-দি-ন না।

'জনতার একজন হিসেবে যুদ্ধ করেছি'

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি বিদেশে ছিলাম। ওমানের টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি ভোটের ছবি। তার আগে ঝড়ের ছবি। দেশে ফিরে দেখলাম আমার দেখা বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে গেছে। চারদিকে দানা বেঁধে উঠেছে সংগ্রাম। এবার স্বপ্ন সার্থক হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবার হবেন রাষ্ট্রনায়ক। ক্যান্টনমেন্টে এ নিয়ে আলোচনা হতো মৃদু কণ্ঠে। এ আলোচনায় জাতিভেদ স্পষ্ট ছিল। কেউ প্রাণ খুলে আলোচনা করতো না।

এ সময় আমার নতুন পদ হলঃ ব্রিগেড মেজর, ৫৭নং ঢাকা ব্রিগেড। আমাকে ২২শে মার্চ বদলী করে দেয়া হয়। ১লা মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত আর্মি মুভমেন্ট সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা হয়েছিল। যার জন্যে মার্চ মাসের প্রথম দিকে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করি এবং পরে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গেও আলোচনা হয়। ২২শে মার্চ আমার পোস্টিং হয় কুমিল্লায়, ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এটা আমার অরিজিন্যাল ব্যাটেলিয়ন। ২৪শে মার্চ আমি ফোর্থ বেঙ্গলের সে সময়কার পাঞ্জাবী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত খানের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিলাম। দায়িত্ব নেবার পর মুহূর্তে একটা অর্ডার ইস্যু হলো আমার নামে; আমাকে তখনই রওয়ানা হতে হবে শমশেরনগর একটা কোম্পানী নিয়ে। কারণ হিসেবে বলা হল, ভারত থেকে সশস্ত্র নকসালরা অনুপ্রবেশ করেছে। খটকা লাগলো। প্রশ্ন করেছিলাম, আমি ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, একটা কোম্পানী নিয়ে আমি যাবো কেন? আমাকে এভাবে হঠাৎ প্রশ্ন করতে দেখে লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির স্পষ্টভাবে চমকে গেলেন। বললেন ওখানে একটা

ইপিআর কোম্পানী আগে থেকেই আছে। সেজন্য একজন সিনিয়র অফিসার যাওয়া প্রয়োজন।

অস্ত্র সংগ্রহ করার সময় আমার মনের সন্দেহটা স্পষ্ট হল। কোম্পানীকে পুরো অস্ত্রে সজ্জিত করে আমি সেদিনই রওনা হলাম শমশেরনগরের উদ্দেশ্যে। যাবার আগে রেজিমেন্টের বাঙালী অফিসরদের সাবধান থাকতে বলে গেলাম। ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্য একটা কোম্পানী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গিয়েছিল। আমি যাচ্ছি শমশেরনগর। তার মানে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট খালি করা হচ্ছে। বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে দিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের শক্তিকে নিউট্রাল করা হচ্ছে।

দেশব্যাপী তখন গণজাগরণের জোয়ার। শমশেরনগর যাবার পথে বাধা পেলাম হাজার মানুষের কাছ থেকে। তারা আমাদের কিছুতেই যেতে দেবে না। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার একজন স্থানীয় লোক আমার গাড়ির সামনে শুয়ে পড়লো। বলল যেতে হলে আমার উপর দিয়ে যাবেন। আমি আশ্বাস দিলাম যে শেখ সাহেব বললেই আমাদের সংগ্রাম শুরু হবে। আমরাও প্রস্তুত। দরকার হলে দেখবে আমরাও তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছি।

শমশেরনগর যাবার পথে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ফোর্থ বেঙ্গলের অন্য একজন অফিসার, মেজর শাফায়েত জামিলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি। কিন্তু শমশেরনগর পৌঁছে পরদিন খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি নকসাল অথবা ইপিআর কোন কিছুরই পাত্তা নেই। এসেছিলাম পাকা রোড ছেড়ে কাঁচা রোড দিয়ে। পাকা রোডের পাশে মৌলভীবাজারে ৩১ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানী ওখানে আগেই পোস্টেট ছিল খবর পেলাম ২৬শে মার্চ। এর আগে চা-বাগানগুলোয় গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখি অবাঙালী টিপ্ল্যান্টাররা আগেই সরে পড়েছে বা সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি কুমিল্লার সঙ্গে ওয়ারলেসে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। ২৬শে মার্চ বিকেলে একজন খবর নিয়ে এল ঢাকায় ব্যাপক আকারে গণহত্যা শুরু করেছে আর্মি। এবার যোগাযোগের চেষ্টা করলাম ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সঙ্গে ওদের পেলাম। শুনলাম ফোর্থ বেঙ্গলের কম্যান্ডার এখন ওখানে পুরো ব্যাটেলিয়ন নিয়ে এসেছে। শাফায়েতকে শুধু বললম, আমি আসছি।

চারদিকের আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ২৬শে মার্চ রাত দশটায় আমি আমার কনভয় নিয়ে রওয়ানা হলাম ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পথে। এ সময় প্রতিটি মুহূর্তে আমার পাশে থেকে আমাকে সাহায্য করেছিল তরুণ ক্যাপ্টেন মাহবুব। পথে বেরিকেড সরিয়ে সরিয়ে অগ্রসর হতে সময় লাগছিল। শাফায়েত আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল।

ভোর ছটা। ২৭শে মার্চ। শাফায়েত জানালো কমান্ডার সকাল ১০টায় অফিসারদের মিটিং ডেকেছে। বুঝলাম তখনই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। বললাম, তুমি তোমার কাজ শেষ করে ফেল। আমি কাছে এসে পড়েছি। শাফায়েতের নেতৃত্বে ঠিক ন'টায় ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পাঞ্জাবী কমান্ডার, অফিসার ও জওয়ানদের বন্দী করে। আমি দুপুরে ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম। এ দিন থেকেই শুরু হল প্রতিরোধের যুদ্ধ। মুষ্টিমেয় রেজিমেন্ট তার অস্ত্র কয়েক ভাগে ভাগ করে ডিফেন্স লাইন বসালাম। পুলিশের ওয়ারলেসে চারিদিকে খবর পাঠালাম। জনতার সঙ্গে চাকরি জীবনে বিচ্ছিন্ন থেকেও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম প্রতিরোধের যুদ্ধে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্যের সাথে নিজেদের ভাগ্যকে বেঁধেছিলাম সেদিন। আমি যোদ্ধা, কিন্তু যুদ্ধবাজ নই। শান্তি আমার একমাত্র কাম্যবস্তু। শান্তির জন্যেই, সুখের জন্যেই, জনগণের জন্যেই অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম শত্রুর বিরুদ্ধে। জয়ী আমাদের হতেই হবে।

২৬শে মার্চ মেজর জিয়া (এখন মেজর জেনারেল) ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতা শেখ মুজিবের পক্ষে। ১৭ই এপ্রিল গঠিত হল বাংলাদেশ সরকার। এরই মধ্যে আমরা শত্রুর উপর বারবার আঘাত হেনেছি। সে সময়কার বাংলাদেশ বেতার মারফত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, আখাউড়া, কসবায় যুদ্ধের কথা শুনেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে ওরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। ভয়ংকরভাবে বিমান হামলা চালিয়েছিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উপর। সরকার গঠিত হবার পর একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলি মতিনগর নামে একটি পাহাড়ী এলাকায়। কারণ আমি জানতাম আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যদি কেউ লিখতে চান, তবে তাকে এই মতিনগরের কথা বিশেষভাবে লিখতেই হবে। এখানে দলে দলে তরুণরা এসে যোগ দেয়। তাদের কাপড় ছিল না। আমার এ ক্যাম্পে বিদেশী সাহায্য সামগ্রী পৌঁছাতো না। কিন্তু ছেলেরা প্রতিবাদ করেনি। গ্রেনেডের খালি বাক্সে খেয়েছে, খোলা আকাশের নীচে ঘুমিয়েছে এক মাস। এরা অস্ত্র চাওয়া ছাড়া অন্য কোন অভিযোগ করতো না। এদের গেরিলা যুদ্ধে ট্রেনিং দেয়া হতো এবং আমি পুলিশ ইপিআরও এসব গেরিলা যোদ্ধাদের নিয়ে আমি একটা ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি।

আমার প্রথম কাজ হলো যুদ্ধকে জনসাধারণের মনে জিইয়ে রাখা। মে মাসে জাতিসংঘ মিশন ঢাকা এলো কার্গিলের নেতৃত্বে। আমি মতিনগরের ট্রেনিংরত কয়েকটি ছেলেকে বাছাই করে তাদের হাতে গ্রেনেড দিয়ে ঢাকা পাঠিয়ে দিলাম। এই কয়েকটি সাহসী ছেলেরা ঠিক সময়মত কার্গিলের গাড়ি উড়িয়ে দিল গ্রেনেড মেরে শহরের প্রাণকেন্দ্র ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে। এ সময় ঢাকায় ছেলেদের

পাঠাতাম যুদ্ধকে উত্তপ্ত রাখতে। যাকে বলা যায়, সাইকোলজিক্যাল ওয়্যার। মানুষ মনে মনে যুদ্ধ উপলব্ধি না করলে যুদ্ধ সেদিনই বন্ধ হয়ে যেতো।

আমরা যুদ্ধ করেছি তিন ফ্রন্টে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক। পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল আমাদের গেরিলা ইউনিট ও যোদ্ধারা। ওরা ব্রীজ উড়িয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, পাটের গুদামে আগুন লাগিয়েছে, সমুদ্র জাহাজ ডুবিয়েছে, বন্ধ করে দিয়েছে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সমস্ত উপায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছি পাকিস্তানের শাসন কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে। ইয়াহিয়ার অনুচরদের হত্যা করেছে আমাদের ছেলেরা। বিশ্ব সংবাদ তৈরী হতে পারে এমন সব টার্গেট বেছে নিয়েছে এরা। যেমন ইন্টারকন্টেনেন্টাল, ডিআইপি ও এক্সপ্লোসিভ বসায়। এই সব ছেলেরা ঢাকায় পাওয়ার স্টেশন উড়িয়েছে, সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ারের ক্ষতিসাধন করেছে, গ্যাসলাইন নষ্ট করেছে। এসব কাজে আমি গেরিলাদেরই ব্যবহার করেছি।

সামরিক ক্ষেত্রে আমি আরো দু'ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। এক- ফ্রন্টল ফাইট। প্রচলিত প্রথায় ডিফেন্স লাইন বসিয়ে যে যুদ্ধ হয় তাই। দুই- গেরিলা যুদ্ধ। প্রচলিত প্রথায় আমি সীমান্ত এলাকায় মুক্ত অঞ্চলে আমার বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর বাহিনীর পুরনো লোকদের নিয়োগ করেছি। এরা বাংকারে থেকে গত ন'মাস কান্তিহীন যুদ্ধ করেছে। সুযোগ পেলেই অগ্রসর হয়েছে, শত্রুকে প্রতিহত করেছে। আপনারা শালদা নদী, মন্দভাগ, কসবা, বিলোনীয়া, পরশুরাম, আখাউড়া ইত্যাদি নাম বেতারে শুনেছেন। এসব অঞ্চলে আমি যুদ্ধ চালিয়েছি তার কারণ হচ্ছে, পাক সেনাদের সীমান্ত অঞ্চলে কনসেনট্রেট করা এবং সেখানে পকেট করে ফেলানো। বাস্তবেও তাই হয়েছে। এর ফলে আমার গেরিলা যোদ্ধা দেশের ভেতরে বেশ সহজে কাজ করতে পেরেছে। এই যুদ্ধ পদ্ধতির ফলে পাকিস্তানীদের সঠিক প্রতিরোধ পদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হতো। প্রচলিত প্রথার যুদ্ধেও আবার কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডো প্রথায় আক্রমণ চালাতো যার জন্যে প্রয়োজন অসীম সাহসের। আমার মনে পড়ছে সুবেদার শহীদ বেলায়েতের কথা। শহীদ বেলায়েত একটা প্লাটুন নিয়ে সালদানদী রেলওয়ে স্টেশনের পাক ডিফেন্সে আক্রমণ চালায়। এ ডিফেন্সে পাক আর্মির সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন'শ, তারপর ৩৫ জন রাজাকার। মাত্র একচল্লিশজন যোদ্ধা বারো ঘন্টা যুদ্ধ করে চল্লিশটি বাংকার দখল করে। এখানে আমরা প্রচুর অস্ত্র এবং এ্যামুনিশন পেয়েছিলাম। বেলায়েত শহীদ হয় দু'দিন পর রেকিতে গিয়ে। জুন মাসে বিলোনীয়ার এক যুদ্ধে দেড় হাজার পাক আর্মি খতম হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে।

সীমান্ত অঞ্চলের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন ক্যাপ্টেন গাফফার, ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, মেজর সালেক, মেজর আইনউদ্দীন, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন আশরাফ, লেফটন্যান্ট হুমায়ুন কবীর, সেকেন্ড লেফটন্যান্ট আজিজ শহীদ হয়েছেন কসবায়। গেরিলা যুদ্ধের দায়িত্ব ছিল মেজর হায়দারের উপর। হায়দার ২৭শে মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালায়। প্রথম দিকে সে দু'একজন ছেলে নিয়ে পাক সৈন্য চলাচলের পথের ব্রীজ উড়িয়ে বেড়াতো। আমি ওকে মতিনগরের ট্রেনিং ক্যাম্পের ভার দেই। এরপর আমাদের স্থায়ী ক্যাম্প হয় মেলাঘরে। এখানে থেকেই গেরিলাদের পাঠানো হতো ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও কুমিল্লায়। আমার গেরিলারা এসব অঞ্চলের অধিকাংশ থানা দখল করে নিয়েছিল নভেম্বর মাসেই। কি দুঃসাহসের সঙ্গে এরা লড়েছে তা আপনারাও জানেন।

ঢাকায় মতিনগরের ট্রেনিং পাওয়া ছেলেদের দলটা ধরা পড়ে পাক আর্মির হাতে। ধরা পড়ে ২৯শে আগষ্ট। এ দলের সঙ্গে যোগ থাকার জন্য গ্রেফতার হন গায়ক আলতাফ মাহমুদ। রেডিওর হাফিজউদ্দিন এবং কয়েকজন গেরিলা। এরা কেউ আর ফিরে আসেনি। এদের দেশপ্রেম, সাহস, স্বাধীনতার ইতিহাসে গল্প হয়ে থাকবে। আমি প্রশংসা করি শহীদ মানিকের দলকে। প্রশংসা করি অন্যান্যদের। সেক্টর ২-এর কম্যান্ডিং অফিসার হিসেবে, ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে আজ লিখছি, আমি বেঁচে আছি আহত হয়েও। আমরা বিজয়ী হয়েছি। আমি দেশে ফিরে ন'মাস আর্মি কাস্টডিতে থাকা আমার দু'বছরের মেয়ে রুপনকে ফিরে পেয়েছি। আমি সুখী। কিন্তু একটা কথা বারবার মনে হচ্ছে আমার ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের পুরনো লোকদের অনেকেই বেঁচে নেই। দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারার মত গৌরবের চেয়ে বড় গৌরব সৈনিকের কাছে আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু ওরা প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তি দেখে যেতে পারেনি। ক্যাপ্টেন মাহবুবের কাছে একটা কম্যান্ডো প্লাটুন ছিল ৩৬ জনের। ওদের মাত্র ৬ জন জীবিত ছিল যুদ্ধ শেষে।

সাত কোটি বাঙালী যুদ্ধ করেছেন। ভারতে যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয়নি, উচিতও না। আমার গেরিলাদের বলতাম দেশের লোককে বলতে, তারা যেন অপ্রয়োজনে দেশত্যাগ না করেন। প্রত্যেকেরই লড়তে হবে। গেরিলা যুদ্ধে সবচে যা বেশী প্রয়োজন, তা হচ্ছে গণআবরণ। সাত কোটি মানুষ এই আবরণ সৃষ্টি করে রেখেছিল। আমরা যুদ্ধ করেছি, এটা একান্ত আমাদেরই যুদ্ধ ছিল। আমরা সবাই যোদ্ধা। মনে আছে, ঢাকা থেকে গুটিকতক মেয়ে আমার কাছে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল। ওদের কথা শুনে বুঝেছিলাম, এটা ওদের কথার কথা নয়, সত্যি ওরা যুদ্ধ করতে চায়। ওদের নিয়ে আমি বাংলাদেশের প্রথম হাসপাতাল খুলেছিলাম। ওরা তেরটি মেয়ে ওখানে যুদ্ধে আহতদের নার্সিং করতো। যুদ্ধ

করতে এসেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে ড. জাফরউল্লাহ ও ড. মোবিন। ঢাকা শহরের এক ফল বিক্রেতা আমার সেক্টরের একজন গেরিলা কমান্ডার হয়েছিলেন। যুদ্ধ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র থেকে শুরু করে প্রত্যেকে। বিদেশে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েও তাই আমরা তিব্বতের দালাইলামা হয়ে যাইনি। অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকিনি। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। তার জন্যে আমি প্রতিটি বাঙালীর মতই গর্বিত। গর্ব বোধ করি এজন্যই যে আমরা গণযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। জনতার একজন হিসেবে যুদ্ধ করেছি।

সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট, মার্চ ১৯৭১

মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ

তদানীন্তন পাক সেনাবাহিনীতে বাঙালীদের দুরবস্থা সংখ্যায় তারা নিতান্ত নগণ্য ক্ষমতায় বলতে গেলে একেবারে শূন্য। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ করে নির্বাচনোত্তর সময়ের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম ঠিকই, কিন্তু স্বভাবতঃই সক্রিয়ভাবে কিছু করার সুযোগ ও ক্ষমতা কোনটাই আমাদের ছিল না।

আমি যে সময়ের কথা দিয়ে শুরু করছি তা হলো ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগ। ঢাকার অদূরবর্তী জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে ২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। তখনকার গণজাগরণী নাটকের অনুল্লেখিত পরিচ্ছেদের একটি অংশ। রাজনৈতিক নাটকীয় দৃশ্যের, এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল যে, আমাদের মত সামরিক অফিসারদের পক্ষে তার অনির্দিষ্ট গতিপথের খবর রাখা দুঃসাধ্য ছিলো। কিন্তু এরই মধ্যে লক্ষ্য করলাম তৎকালীন পাক সামরিকবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের (যার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য) এক বিশেষ ধরনের তৎপরতা। ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে একটু লক্ষ্য করে বুঝলাম, এদেশে সাংঘাতিক কিছু একটা হতে যাচ্ছে। সেটা কি ধরনের তা এখনও সম্পূর্ণভাবে জানতে পারিনি। দেশের অশান্ত পরিবেশ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বিশেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের পরিকল্পনার অলৌকিক কাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ ছিলো পাক সামরিক সরকারের।

তখনকার ৫৭ ব্রিগেডের অধিনায়ক ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে এক জরুরী সামরিক সম্মেলনের জন্যে তার অধীনস্ত সমস্ত ব্যাটেলিয়ন ও রেজিমেন্টের অধিনায়কদের

একটা গোপন মন্ত্রণালয় সভা ডাকলেন। ঢাকায় ৫৭ ব্রিগেডের অধীনে তখন ৪টি পদাতিক ব্যাটালিয়ান, ২টি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ও ১০টি ট্যাংক বিশিষ্ট একটি স্কোয়াড্রন। এছাড়া জয়দেবপুরে ১০ই মার্চের সে ঘটনার পরে ২৫শে মার্চের মধ্যে সর্বাঙ্গীন পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ২৫শে মার্চের বিকালের মধ্যে ঢাকা ও জয়দেবপুরে অবস্থানরত ব্যাটেলিয়ানের সদর দফতরের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। একটি মাত্র ওয়ারলেস সেট ছিল, যা দিয়ে শুধু ব্যাটেলিয়ন ও ব্রিগেডের যোগাযোগ করা যেত। এক ব্যাটেলিয়ান থেকে অন্য ব্যাটেলিয়নও যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছিল। ব্রিগেড সদর দফতর এই ব্যবস্থা করেছিল যাতে আমরা বাকি সব জায়গায় কি হচ্ছে তা জানতে না পারি। সবচেয়ে মজার কথা এ বেতার যন্ত্রটি পরিচালিত হচ্ছিল একজন পশ্চিম পাকিস্তানী সংকেত প্রেরক দ্বারা।

২৫শে মার্চের কালরাত্রির ঘটনা ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি। ২৭শে মার্চে যখন লোক মুখে শুনলাম তখনই আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ব্যাটেলিয়নকে ময়মনসিংহে কেন্দ্রীভূত হবার আদেশ দিলাম। ২৭ শে মার্চের বিকালের মধ্যে আমার ব্যাটেলিয়ান, সাবেক ইপিআর ও ময়মনসিংহ জেলার সমস্ত সৈন্য সমবেত হল ময়মনসিংহে। সে রাতেই আমি আমার যুদ্ধ পরিকল্পনা করে ফেললাম। পুলিশ ও সাবেক ইপিআর বাহিনীর কিছু অংশ পাঠালাম বাহাদুরাবাদ ঘাটে। অন্য এক অংশ সিরাজগঞ্জ ঘাটে, বাকি সমস্ত সৈন্য নিয়ে ঢাকার দিকে যাত্রা করার মনস্থ করলাম।

আমি ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই ভেবে যে, ঢাকা ছিল তখনকার পাক সৈন্য-সামরিক যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এমতাবস্থায় যদি কোনক্রমে ঢাকাকে বাংলাদেশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও উত্তরবাংলাকে আরও সামরিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে। এসব কথা চিন্তা করে ২৯শে মার্চ তারিখে আমি তিনটি সাবেক ইপিআর কোম্পানীকে মীরপুর, মোহাম্মদপুর ও ঢাকা বিমানঘাটির দিক থেকে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলাম। ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও বাকি সাবেক ইপিআর বাহিনী নিয়ে আমি ট্রেনে কিশোরগঞ্জ, ভৈরব বাজার, নরসিংদী হয়ে পদব্রজে পুরনো ঢাকার মতিঝিল হয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে রওনা হলাম। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, পাক বাহিনী হিসাবের গোলমালে ২৯শে মার্চ তারিখে আমাদেরকে জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে উপর থেকে বিমানের সাহায্যে বোমা ও গুলিবর্ষণ করে।

৩০শে মার্চ আমার সৈন্যরা ঢাকা শহরের পূর্ব ও পশ্চিমে দুই দিক থেকে শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হয়। ওয়ারলেস সেট না থাকার দরুন পশ্চিম দিক থেকে আগত

আমার সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যাহোক লোক মারফত আমি নিয়মিত খবরা খবর পাচ্ছিলাম যে আমার সৈন্যরা শত্রুসৈন্যদের সাথে বার বার সংঘর্ষে বীরত্বের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিল। কিন্তু শত্রুসৈন্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও তাদের আধুনিকতর অস্ত্রের মোকাবেলা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল। ৩০শে মার্চ যখন পাকসৈন্যদের একটি ব্রিগেড নরসিংদি অভিমুখে রওয়ানা হয় তখন আমি তাদের অগ্রগতিতে বাধা দেয়ার জন্য শীতলক্ষ্যার পূর্ব তীরে আমার সৈন্য মোতায়েন করি। ঠিক এমনি সময়ে মেজর (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) খালেদ মোশাররফ-এর এক বার্তায় জানতে পারি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা ও সিলেট জেলার কিছু অংশ তখন তার আয়ত্বাধীনে এবং আমরাও যেন একযোগে ঐ এলাকা রক্ষা করার চেষ্টা করি। সেই মোতাবেক এক কোম্পানীর কিছু বেশী সৈন্য নরসিংদিতে রেখে আমি মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে চলে যাই।

এদিকে নরসিংদি ও পাঁচরোখীর মধ্যে আমার সৈন্যরা পাক অগ্রগামী বিগ্রেডের সাথে এক প্রচন্ড যুদ্ধে প্রচুর পাকসেনা হতাহত হয়। যুদ্ধচলাকালীন অবস্থায় আমি মেঘনার তীরে আমার প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করেছিলাম। ইতিমধ্যে সিলেটে কিছু সৈন্য প্রেরণ করতে হয়েছিল। ১লা এপ্রিলের মধ্যে সিলেট থেকে নরসিংদির মধ্যে আমার সৈন্য মোতায়েন ছিল। নরসিংদির যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের প্রচুর হতাহতের পর তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয় ও ৪৮ ঘন্টা ব্যাপী ক্রমাগত গোলাবর্ষণের পর আবার আক্রমণ করে। এই তীব্র আক্রমণের মুখে ৩৬ ঘন্টা যুদ্ধ করে আমার সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয় ও নরসিংদির মুখোমুখি মেঘনার পশ্চিম তীরে আমি তাদের মোতায়েন করি।

একই সময়ে পিআইএ বিমানের সাহায্যে শত্রুরা সিলেট এলাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি করছিল। এই শক্তি বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য আমি সিলেটে ছুটে যাই। সেখানে আমার মাত্র এক কোম্পানী সৈন্য ছিল, কিন্তু মেজর (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) চিত্তরঞ্জন দত্তের অধিনায়কত্বে গঠিত স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় শত্রুকে আক্রমণ করে শালুটিকায় বিমানবন্দর পর্যন্ত হটে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এলাকাটি দখল করা গেল না, কেননা এক ব্রিগেড শত্রুসৈন্যকে মোকাবেলা করার মত যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য আমার কাছে তখন ছিল না। এ প্রসঙ্গে ২রা এপ্রিলের কথা বলতে হয় যখন কর্নেল (বর্তমানে জেনারেল) এমএজি ওসমানী সাহেবের সাথে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখেই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কেননা আমার মনে হলো এতদিনে আমাদের একজন নেতা পেলাম যার অধীনে পুরো বাংলাদেশ সামরিক তৎপরতা চালাতে পারব।

সিলেট কিভাবে দখল করবো এ ব্যাপারটা যখন আমি কর্নেল (বর্তমানে জেনারেল) ওসমানী সাহেবের সাথে পরামর্শ করছিলাম ঠিক তখনই খবর এলো নরসিংদি এলাকার শত্রুসৈন্য আমাদের মেঘনা তীর থেকে বিতাড়িত করার জন্য প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মৌলবীবাজারে এ খবর পৌঁছার পর কর্নেল ওসমানী (বর্তমানে জেনারেল) সাহেব মেজর কিউ এন জামানকে দেখাশোনার ভার দিয়ে আমাকে ৫ই এপ্রিল তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পথে রওয়ানা হতে নির্দেশ দিলেন।

আমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ব্রিগেড শত্রুসৈন্য বিমান ও নৌবহরের সাহায্যে একযোগে আশুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আক্রমণ করল। ভোর সাড়ে ৫টা থেকে দুপুর সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ৬ ঘন্টা অবধি ক্রমাগত বিমান থেকে বোমা ও গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও আমার সৈন্যরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের কোন গোলন্দাজ বা বিমানবাহিনীর সাহায্য না থাকার দরুন শেষ পর্যন্ত আমার সৈন্য শাহবাজপুর ও মাধবপুর এলাকায় সরে যেতে বাধ্য হল। শাহবাজপুর ও মাধবপুরে পৌঁছে কিছুমাত্র মনোবল না হারিয়ে আমরা আবার আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে ফেললাম। পরে ঐ জায়গায় আমরা ১৫ দিন শত্রুর মোকাবেলা করেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে চৌদ্দ দিন পরে তেলিয়াপাড়ায় নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিলাম। এই তেলিয়াপাড়ায় আমরা একুশ দিন ক্রমাগত যুদ্ধ করেছি এই সময়ে আমরা পাঁচ বার শত্রুর আঘাত প্রতিহত করেছি। প্রতিবারেই শত্রু সংখ্যা কমপক্ষে এক ব্যাটেলিয়ন ছিল। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারলাম তেলিয়াপাড়া আর রা করা সম্ভব হবে না তখন আমি আমার সৈন্য বের করে এনে মনতলা-সিংগারবিল এলাকায় শ্রেণীবদ্ধভাবে ছড়িয়ে দিলাম। শত্রু পরে এ জায়গায় আবার এক ব্রিগেডেরও বেশী সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে এবং যুদ্ধ চলতে থাকে। ২১শে জুন তারিখে শত্রু সৈন্য আমাদের বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আবার শক্তি সংগ্রহ করে আমি প্রায় ১০ বর্গমাইল এলাকা পুনরুদ্ধার করে নিজের দখলে আনলাম।

এ প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত জরুরী কথা আমার মনে পড়ল। সেটা হলো এইমাত্র যে যুদ্ধগুলোর বর্ণনা আমি দিচ্ছিলাম সাথে সাথে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি গেরিলা যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিলাম। একই সঙ্গে নিয়মিত ও গণবাহিনীর প্রশিক্ষণ চলছিল আমার অধীনে। নিরাপদ আশ্রয়স্থলে জমা হওয়ায় পর আমরা গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য নিয়মিত সৈন্যদের ব্যাটেলিয়নগুলো সম্পূর্ণভাবে তৈরী হওয়া পর্যন্ত আমরা এইভাবে যুদ্ধ চালিয়েছি।

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে আমার সৈন্যবাহিনীকে সংগঠন করে আবার রেওয়াজ মাফিক যুদ্ধ পরিচালনায় মনোনিবেশ করলাম। এবারের যুদ্ধে আমার সৈন্যরা ৩০শে নভেম্বরের রাত থেকে ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে আখাউড়া আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে পাকসামরিক সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় সৈন্য মিত্রবাহিনী নাম নিয়ে আখাউড়ায় নেমে পড়ল। ৫ই ডিসেম্বর আমরা আখাউড়া আবার দখল করতে সক্ষম হলাম। আখাউড়া পতনের পর আমার সৈন্য দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ও ১১ ইস্ট বেঙ্গল প্রথম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও পরে আশুগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলো মাধবপুর, শাহবাজপুর ও সরাইলের পথে। আশুগঞ্জে আমরা শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হলাম ৮ই ডিসেম্বর। পথিমধ্যে অবশ্য অনেক ছোটখাট ঘটনা ও দুর্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আসতে হয়েছে। দুদিনব্যাপী প্রবল যুদ্ধের পর শত্রুসৈন্য আশুগঞ্জ থেকে ভৈরব বাজারে যেতে বাধ্য হয়। তারপর সামান্য কিছু সৈন্য দিয়ে শত্রুদের ঘিরে ফেলি ভৈরবে শত্রুসৈন্যকে ঘিরে রাখার পর আমি আমার একটি ব্যাটেলিয়ন তথা ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে পদব্রজে নরসিংদি অভিমূখে রওয়ানা হই। আমি যখন নরসিংদি পৌছি তখন মিত্রবাহিনী বিমানের সাহায্যে নরসিংদি দখল করে ফেলেছে।

নরসিংদি সম্পূর্ণভাবে দখলকৃত হবার পর কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করে আমি আমার ব্যাটেলিয়ন নিয়ে ডেমরার দিকে অগ্রসর হই। ডেমরাতে শত্রুর সাথে আমাদের একটা সংঘর্ষ হয় ১৩ই ডিসেম্বরের বিকাল থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের বিকাল চারটা পর্যন্ত ডেমরা ও ঢাকা শহরের উপকূলে আমরা লড়াই করছিলাম। ১৬ই ডিসেম্বরের সাড়ে চারটায় পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করলে আমার সৈন্যরা সেদিন বিকেলেই ঢাকা শহরে ঢুকে পড়ে বিজয়ী বীরের মত।

ভুলি নাই! ভুলি নাই! ছাব্বিশে মার্চ ১৯৭১

লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিন আহমদ চৌধুরী বীরবিক্রম

২৫/২৬শে মার্চ রাত্রি। ১৯৭১ সাল। সম্ভবতঃ আওয়াজ হল। দুম। থর থর করে কেঁপে উঠলো ঘরটি (গুলশানের জনাব শাহ আলম চৌধুরীর বাসা) ধড়মড় করে উঠলাম আমি। তারপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির অনবরত আওয়াজ। তাড়াতাড়ি বের হয়ে দেখি সমস্ত আকাশটা লাল (সম্ভবতঃ ফার্মগেইটে প্রথম ব্যারিকেডের উপর ট্যাংক সমেত পাকিস্তানীদের হামলা)। ঐ নিঝুম রাত্রে শুধুমাত্র পায়চারী করা ছাড়া আর উপায় রইলো না। মনে হচ্ছিল নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়ে ফেলি। পাকিস্তানীরা জানতো গাদা বন্দুক ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন অস্ত্র নাই। ২৬ তারিখ সকাল ৯টায় দিকে কর্নেল মুঈদের বাসায় ফেলে আসা আমার ইউনিফর্ম নিয়ে আসার জন্য ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে রওনা হই। বোকার মত জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মামী মিসেস শাহ আলম চৌধুরী। কিছুদূর যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম এমনভাবে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আর্মির দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। তাই গুলশানের দ্বিতীয় মার্কেটের কাছে শিশুপার্কে অবস্থিত ক্যাপ্টেন হাফিজের ক্যাম্পে উপস্থিত হলাম। এ পাকিস্তানী অফিসারটি আমাকে দেখে কেমন জানি লজ্জা পাচ্ছিল। আমি তাকে বললাম উইল ইউ কাইন্ডলি গিভ মি এ লিফট টু দ্য ক্যান্টনমেন্ট? মৌখিক পরিচিত এই অফিসারটি উত্তর দিল মোস্ট সারটেনলি, স্যার। জাস্ট ওয়েট ফর ফিউ মিনিটস। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের দূত এসে উপস্থিত হলেন এবং প্রায় সকলেই এস্কট চাইলেন শহরে ওঁদের নিজস্ব অফিসে যাওয়ার জন্য। বিশেষতঃ বৃটিশ হাইকমিশনার খুবই পীড়াপীড়ি করছিলেন। এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ প্রায় রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। কথপোকথন চলাচলের সময়

কর্নেল আনোয়ার শাহ (সিতারায়ে জুরাত) এর সাথে বাঙালী অফিসার ক্যাপ্টেন লতিফ এসে উপস্থিত হলেন। আনোয়ার শাহ দুই কনুই দিয়ে অদ্ভুতভাবে নিজের প্যান্টটা উপরের দিকে তুলে হাফিজকে নীচু স্বরে কঠোর ভাষায় ডোন্ট বি স্টুপিড, ডোন্ট ট্রাস্ট দিস হোয়াইট স্কিন বলে কাবুলী চপ্পল পরে এগিয়ে গেলেন বৃটিশ হাই কমিশনারের সামনে এবং স্যালুট করে বললেন স্যার ইট ইজ বেটার টু গো ব্যাক টু ইওর রেসিডেন্ট, বৃটিশ হাই কমিশনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন নো, আই হ্যাভ টু গো টু মাই অফিস, আই হ্যাভ টু ইনফর্ম মাই গভর্নমেন্ট। কর্নেল উত্তর দিলেন, স্যার, ইউ ক্যানট্ গো। উত্তরে হাইকমিশনার বললেন, ডু ইউ নো হু আই অ্যাম? কর্নেল বললেন ইয়েস স্যার, আই নো। হাইকমিশনার বললেন, আই অ্যাম দি ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার, আর ইউ সিওর দ্যাট ইউ ক্যান স্টপ মি অফ গোয়িং টু মাই অফিস? ইয়েস স্যার, আই অ্যাম সিওর। উত্তর দিলেন কর্নেল আনোয়ার শাহ। মে অ্যাই নো ইওর নেম প্লিজ। রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ডেপুটি হাইকমিশনার – সরি আই ক্যান নট গিভ মাই নেম। আই প্রোমিজ স্যার আই উইল গো টু ইউর রেসিডেন্ট টু এসকর্ট ইন আপ টু ইওর অফিস দি মোমেন্ট 'আই গেট অর্ডার। রাগে হাইকমিশানের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। গাড়ীতে বসার আগে ক্রুদ্ধ চাপাস্বরে বললেন, ইউ ক্যানট রুল দিস ক্যানট্রি লাইক দিস। অন্যান্য দূতগণ (জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের) ডল পুতুলের মতই গদ গদ হয়ে আবার নিজ নিজ বাসস্থানে ফেরৎ গেলেন। এরপর আমরা পার্শ্ববর্তী অবাঙালীর বাসায় বসলাম। অবাঙালী ভদ্রলোক খুশীতে প্রায় আটখানা। সব জান্তার মত বলে উঠলেন চাইনিজ কমান্ডো ভি আগিয়া মদদ কা লিয়ো চীনার নাম শুনার সাথে সাথে আমি কেমন যেন হচকি খেয়ে গেলাম। চীন এমন অন্যায়কে সমর্থন করবে এমন কথা ধারণার অতীত। অবাঙালী অনিতা বিয়ারের চুমুক দিয়ে কর্নেল আনোয়ার অবাঙালী ভদ্রলোকটি বললেন ডোন্ট অরি, কুলনাসে কাল-পুরছুমে বার বোতল হুইছকি পৌছ জায়গা। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে অবাঙালীটি বললো খোদা করে নোহতো হামার কবারা হোগিয়া। কর্নেল আনোয়ার শাহ আমাকে বললেন, ইয়ং ম্যান, হোয়াই ইউ লাইক টু গো টু ক্যান্টনমেন্ট, বেটার সি ইওর প্যারেন্টস রিলেশন্স। হঠাৎ করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল তাইতো ঢাকা শহর দেখার সুবর্ণ সুযোগ। এদিকে লতিফ ফিস ফিস করে যতদূর পারলো বললো আমাকে। বললো ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) দেলোয়ারকে বোধহয় মেরে ফেলছে কিংবা বন্দী করেছে। বঙ্গবন্ধুকেও ধরে ফেলেছে। মনে হলো আকাশ থেকে বাজ পড়লো বুঝি। দুদিন পরে ২৮শে মার্চ দুপুর বারটার দিকে ধানমন্ডীর পাঁচ নাম্বার রোডস্থ ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব মিঃ মল্লিকের মেয়ে (সম্ভবতঃ নাম কৃষ্ণা) হু হু করে কাঁদছিল আর বল ছিল 'শেখ যদি আমাদের বাসায় এসে পড়তেন, আমরা জীবন নিয়ে হলেও ওনাকে বাইরে পাঠিয়ে দিতাম। যেমন করে হোক

ওনাকে বাঁচাতাম। এ জানোয়ারগুলি শেখ মুজিবকে মেরে ফেলবে বলে হু হু করে কেঁদেছিল ওদের ড্রইং রুমের সোফার উপর বসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী মিস মল্লিক। ক্যাপ্টেন লতিফকে মীরপুর ওর বাসায় নামবার।

আনোয়ার দুপুর বারোটার দিকে আমাদেরকে নিয়ে প্রথমে মীরপুর গেলেন। মীরপুর টেলিফোনে এক্সচেঞ্জ অফিসের সেই দোতলা দালানটায় গেলাম দেখি প্রায় আছে বাইরে পাকিস্তানী সৈন্যরা শতেকখানি বাঙালী ইপিআর বসে পাহারারত। সেখান থেকে ক্যাপ্টেন লতিফ বিদায় নিলেন। কর্নেল আনোয়ার শাহ বললেন, 'আইশ করটিল আই কল ইউ ব্র্যাক ফ্রম লিভ এ বলে আনোয়ার শাহ বলেন আরে ভাই আর্মির জওয়ান কেদার গিয়া' – আমি চমকে তাকালাম। অর্থাৎ ইপিআরের পোশাক পরিহিত আনোয়ার শাহের সাথে যত ইপিআর আছে এরা আসলে আর্মির জওয়ান সম্ভবত ৯ বেলুচ রেজিমেন্টের। আনোয়ার শাহ ইপিআরের উইং কমন্ডার। রুমের ভিতর গিয়ে দেখি ... ... । মেজর আওলাদ কিংবা আলতাফ এমন ধরনের নামের একজন পাকিস্তানী মেজর থেকে কর্নেল আনোয়ার শাহ মীরপুর ঘটনার রিপোর্টটি নিচ্ছেলেন। মেজরটি বললো স্যার আই ওয়েটেড আপ টু ডন সো দ্যাট আই ক্যান ফিনিশ দোজ এলিমেন্টস অনলি এন্ড স্যার আই হ্যাভ ওয়াইপড আউট থ্রি হান্ড্রেড্র বেঙ্গলিজ। ইউনিফর্ম পরা নিরীহ মানুষ হত্যাকারী মেজরটির রিপোর্ট আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কর্নেল আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিসক্রিয়েন্টস মাস্ট বি কিলড'. আমি তাড়াতাড়ি জোরে জোরে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। ফার্মগেইট পার হওয়ার সময় দেখি হাজার হাজার বাঁশ পড়ে আছে এখানে ওখানে রক্তাক্ত ছিন্ন-ভিন্ন জামা কাপড় কিংবা দেহের অংশবিশেষ তবে রাস্তার উপরে পড়ে থাকা কোন লাশ দেখিনি। পুরা বাজারটা তখনো জ্বলছিল। বাজারের ভিতরে জ্বলে পুড়ে খাক হওয়া অনেকগুলি লাশ পড়েছিল বলেও মনে হয়েছিল। ডাইনে সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে যাওয়ার রাস্তার আগে এয়ারপোর্ট রোডের আইল্যান্ডটা ছড়িয়ে আছে একটা বড় গাছ উপড়ে গেছে। আইল্যান্ডের উপর দিয়ে ট্যাংকের ট্র্যাক চলে যাওয়ার স্পষ্ট নিশানা বিদ্যমান। মনে হলো ধানমন্ডির কলামটা রাস্তা ক্রস করে সেকেন্ড ক্যাপিটাল দিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি তখনো ভাবছিলাম ধানমন্ডির কোথায় যাব, আর ভাবছিলাম যেমন করে হোক ফটো নিতে হবে। এসেম্বলীর সামনে গিয়ে আনোয়ার শাহ জীপ থেকে নেমে রাস্তার অপরদিকে আসা জীপে বসা ইপিআর-এর ডাইরেক্টর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার জমসেদের কাছে গেলেন। যে নায়েকটি আমার পার্শ্বে খোলা জীপের উপর এলএমজি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল নেমে যাওয়ার সাথে সাথে সে একটি পা আমার কাঁধের উপর দিয়ে জীপের হুডের উপর রাখল। তারপর নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে বলে উঠল 'হায় মুজিব,

কেদার গিয়া, দো পাট্টা মে খতম।' জীপ থেকে দেখলাম বর্তমানে যেখানে রক্ষীবাহিনী একটি পার্ক ঐ দালানের গা ঘেঁসে তিনটি ট্যাংক দাঁড়িয়ে আছে।

কর্নেলের সাথে যতগুলি রাস্তা ঘুরেছি, কোথায়ও জনমানবের চিহ্ন দেখিনি। প্রত্যেক রাস্তাতেই দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে থাকা অসংখ্য বেরিকেড। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাছাকাছি রাস্তায় নতুন করে ট্রাক দিয়ে পর্যন্ত বেরিকেড দেওয়া হয়েছিল। আর প্রত্যেক বেরিকেডের পার্শ্বেই সেই একই দৃশ্য। আর ফার্মগেটের দৃশ্য দেখে কর্নেল যেমন আফসোস করে উঠেছিলেন ঠিক তেমনি তোতা পাখির মত আমার দিকে তাকিয়ে বার বার বলছেন 'আহা – পুওর চ্যাপ'। শাহবাগের সামনে দিয়ে মোড় নেওয়ার সময় মনে হলো রোকেয়া হল টিচার্স-স্টুডেন্ট সেন্টারের মধ্য দিয়ে রাস্তার উপর বেশ কয়েকটি লাশ আর অসংখ্য গুলির আওয়াজ হচ্ছিল। নীলক্ষেত পার হওয়ার সময় আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। বস্তিএলাকাগুলি ভীষণভাবে জ্বলছিল। যতদূর দেখা গেলো ইকবাল হলে ও প্রফেসর কোয়ার্টারের আশে-পাশে অনেক লাশ আর রেললাইন বরাবর বস্তি এলাকাতে লাশগুলি পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল। ট্যাংকের ট্রেক দেখে যা মনে হলো সম্ভবত ট্যাংক এই রেলওয়ে ক্রসিং এর ধারে হাল ডাউন পজিশনে থেকে পেট্রোল পাম্প এর পাশ দিয়ে সম্ভবত ইকবাল হলের উপর এবং আরআর দিয়ে বস্তির উপর ফায়ার করেছিল। কর্নেল অত্যন্ত স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল। তদুপরি বেশী উৎসুক হলে বিপদ হতে পারে তাই চোখকে যতদূর পারি সংযত রাখলাম। ইপিআর-এর ৪নং গেট পার হওয়ার সময় দেখি রাশিয়ান দূত গাড়ী থেকে নেমে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে কর্নেলের গাড়ীর দিকে আসছিল এবং প্রায় এখান থেকে চিৎকার দিয়ে বলছেন, 'প্লিজ আস্ক দেম নট টু পয়েন্ট ব্যারেল লাইক দিস' অর্থাৎ ইপিআর-এর ড্রেস পরে আর্মির জোয়ানেরা ড্রিল মোতাবেক এ রাষ্ট্রদূতের গাড়ির চতুর্দিকে নিলিং পজিশনে চলে গিয়েছিল। কর্নেল হেসে উত্তর দিল. 'ডোন্ট অরি, দে আর ট্রেইন্ড সোলজারস।' প্রায় হাপাতে হাপাতে রাষ্ট্রদূত ওর মিলিটারী পাশটা কর্নেলকে দেখিয়ে তবে রেহাই পেল। কিছুদূর যাওয়ার পর বিপরীত দিক থেকে একটি দ্রুত ধাবিত আর্মির জীপ থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির আওয়াজ এলো। অজ্ঞাতে আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। কর্নেল কনুই দিয়ে ঠেস দিয়ে বললেন, 'ডোন্ট অরি, দি জুবিল্যান্ট ট্রুপস আর ফায়ারিং' আনন্দই বৈকি। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আর চিন্তা করতে লাগলাম যে কর্নেলকে বলছি ১৪নং রোডে ৭৫৫নং চাচার বাসায় যাব সেখানে আমার পিতা-মাতা বেড়াতে এসেছেন। এখন বাসার মালিক সাজ্জাদ মজুমদার সাহেব আমাকে চিনলেই হয়। বিকাল ৪টায় একটা বিরাট আওয়াজ শুনলাম, সাজ্জাদ মজুমদার সাহেবের বাসার ছাদের উপর গিয়ে দেখি কালো ধোঁয়ায় আকাশটা ছেয়ে গেছে। সম্ভবত রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর আর্মির শেষ চরম আঘাত। সন্ধ্যা হওয়ার একটু আগে

আগেই ১৪নং মোড় থেকে ধীরে ধীরে ৩২নং রোডের দিকে এগুতে লাগলাম এই ভরসাতে যে এখন যাওয়ার সময় তাই পেট্রোলের সম্মুখে পড়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু কিছুদূর এগুবার আগেই মীরপুরের দিক হতে একটা ডজ জোরে ফায়ার করতে করতে সাঁ করে চলে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ বা দিকে একটি দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে ওপাশে লাফিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর থেকে দোতলায় উঠার সিড়ির দিক থেকে কে যেন বলে উঠলো আপনারা কি পাগল হয়ে গেছেন। বস্তুত ৩২নং রোডটা আমি ভালভাবে চিনতাম না। জিজ্ঞাসা করে ব্রিজ পর্যন্ত এগুলাম। কোণার বাড়ির দেওয়ালের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব দেখতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে একটি আর্মি ডজ কড়া পাহারায় রত। আশেপাশে গ্লাস ভাঙ্গা সাদা রঙের মনে হয় কর্টিনা কার একটি টয়োটা জীপ, ব্লু রঙের উইলীজ জীপ। জীপগুলো গ্লাসের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল অসংখ্য বুলেট লেগেছিল। বাড়ির উপরের ছাদে মনে হলো বুলেটের দাগ রয়েছে। গাছের জন্য ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না বলে আরো ডাইনে সামনাসামনি দেখার চেষ্টা করলাম। মনে হলো সারা বাড়ির দরজাগুলি খোলা। খাঁ খাঁ করছে। সন্ধ্যা হয় হয় এবাড়ি ওবাড়ির প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ধীরে ধীরে ১৪নং রোডে চলে এলাম। ৮টায় এহিয়া খানের বক্তৃতা শুনে বাসার প্রায় সকলেই মত প্রকাশ করলেন যে এহিয়া খান পদত্যাগ করবেন। এহিয়া খান যখন বক্তৃতা শুরু করলেন তখন মিসেস সাজ্জাদ মজুমদার তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন।

'আপনারা আমার জনগণের বাহিনী'

বঙ্গবন্ধু

গত ১১ই জানুয়ারী ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এইদিন বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীর প্রথম জেন্টেলম্যান ক্যাডেটদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সালাম গ্রহণ করেন এবং সেরা ক্যাডেটদের পুরস্কৃত করেন। ময়নামতি সেনানিবাসের মনোরম উপত্যকায় ক্যাডেটদের এই প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বিদায়ী ক্যাডেটদের উদ্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে মজুতদার, চোরাচালানকারী, সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতিকারী নির্মূল করার অভিযানে নিষ্ঠার সঙ্গে আপন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পূর্ণএকাত্ম হওয়ার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, জনগণের প্রতি গভীর ভালোবাসা নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়ে সমগ্র জাতির সেবায় আপনাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। পূর্ণ শৃঙ্খলার সঙ্গে পালন করে যেতে হবে জাতীয় দায়িত্ব। আপনারা জনগণের বাহিনী, দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর পেশাদার সৈনিক আপনারা নন। বঙ্গবন্ধু বলেন, জনজীবনে অপরিসীম দুর্ভোগ ও বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত মুনাফাখোর, মজুতদার, চোরাচালানী, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ও সমাজবিরোধীদের ওপর চরমতম আঘাত হানতে তার সরকার সংকল্পবদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আমাদের সেনাবাহিনী শিক্ষা ও সরঞ্জাম পেলে বিশ্বের যে কোন সুসজ্জিত বাহিনীর মোকাবিলা করতে সক্ষম। বাংলাদেশের

মালিক আজ জনসাধারণ, তাই বাংলার মাটিতে মিলিটারী একাডেমী স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ইনশাহআল্লাহ এমন একদিন আসবে যেদিন শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নয়, সারা বিশ্বের লোক এই একাডেমী দেখতে আসবে। বিদায়ী ক্যাডেটদের তিনি বলেন, তোমাদের এক পর্যায়ের শেষ হয়েছে এখন আরেক পর্যায়ের শুরু। সেই পর্যায়ের দায়িত্ব অনেক বেশী। তোমাদের দায়িত্বজ্ঞান থাকা দরকার। এটা না হলে মানুষ হওয়া যায় না। তিনি অরো বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বলছি না, জাতির পিতা হিসেবে বলছি। প্রধানমন্ত্রী অনেক আসবে, কিন্তু জাতির পিতা একজনই হয়। তোমরা আমার প্রথম ক্যাডেট। আমার মুখ কালো করিও না। তুমি যদি হুকুম না মান, তোমার আদেশ কেউ মানবে না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলার সম্পদ আর কেউ লুট করতে পারবে না। বাংলার সম্পদ বাংলায় থাকবে। বিডিআর-এর সহযোগিতায় সেনাবাহিনী সীমান্তের চোরাচালান ৯৫ ভাগ বন্ধ করে দিয়েছে। বহু কষ্ট সহ্য করে বিদেশ থেকে সাহায্য আনা হয়। কিন্তু দেশ ও সমাজের শত্রুরা তা বিদেশে পাচার করে দেয়। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন কঠোর আঘাত হানতে হবে। দুষ্কৃতিকারীদের সমালোচনা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, কেমন করে লোক নিজের দেশের মাতৃভূমিকে পয়সার লোভে বিক্রি করতে পারে ভেবে আমি শিউরে উঠি। ... অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে; চরম আঘাত হানতে হবে। ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার আদেশ মনে রেখো। আমি তোমাদের জন্যে দোয়া করবো। দেশবাসী তোমাদের জন্যে দোয়া করবে। ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল বীরসেনানী আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান, তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, বন ও পশুপালন প্রতিমন্ত্রী জনাব রিয়াজউদ্দীন আহমদ, যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর। সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনীর চীফ অব স্টাফ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারসহ কয়েকজন কূটনীতিক যোগদান করেন।

তিনটা বেজে সাতান্ন মিনিটে শহীদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী স্টেডিয়ামে চলছে প্রস্তুতির শেষ পালা। ব্যান্ড বেজে উঠল। ব্যান্ডে বাজছে চির উন্নত মম শির, শির নিহারি আমরা। ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢাল থেকে সমতলে উঠে এলেন ক্যাডেটরা। বাংলাদেশ সামরিক একাডেমীর প্রথম ক্যাডেট দল। রিহার্সাল চলছে সমাপনী কুচকাওয়াজের। বিকেলের পড়ন্ত রোদে তখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ৭০ জন ক্যাডেটের দৃপ্ত মুখচ্ছবি।

এ হচ্ছে এক বছর পরের ঘটনা। এই এক বছরে অনেক কিছু ঘটেছে। অনেক পরিবর্তন এসেছে একাডেমীর জীবনে। প্রথম যখন গিয়েছিলাম, তখন ছিল গুড়ের চা। গুড়ের চা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নে তাদের কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। কিন্তু ছিল আন্তরিকতা। সেই আন্তরিকতা, সেই নিয়ম শৃংখলা আজো তেমনি আছে। এক বছরের ব্যবধানে একাডেমী স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামরিক একাডেমীর প্রতিটি ব্যক্তি আজ গর্বিত। তাদের এক বছরের সাধনা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এই একাডেমীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটরা যোগ দিচ্ছেন সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে। অনেকেই হয়ত আর এ একাডেমীতে ফিরে আসবেন না। কেউ কেউ আসবেন শিক্ষক হিসেবে কিন্তু পেছনে থাকবে স্মৃতিময় জীবন।

জাতীয় জীবনে সামরিক একাডেমী এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় গৌরব, সার্বভৌমত্বের প্রতীক যে কোনভাবে অভিহিত করা যায় সামরিক একাডেমীকে। সামরিক একাডেমীর প্রশিক্ষকরা মনে করেন সামরিক একাডেমী হচ্ছে আমাদের জাতীয় গৌরব। সামরিক একাডেমী ভিন্ন কোন দেশের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণ হয় না। সামরিক একাডেমীর অভাবে সুশৃংখল সেনাবাহিনী গড়ে তোলা যায় না। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সে সেনাবাহিনীর জন্য সমস্যা ছিল সাংগঠনিক। সাংগঠনিক সমস্যা কাটিয়ে উঠে, সামরিক একাডেমীর প্রতিষ্ঠা এবং সে একাডেমীর প্রথম ক্যাডেট দলের সমাপনী কুচকাওয়াজ নিঃসন্দেহে অগ্রগতির পদক্ষেপ।

শুরুতে ছিল বিস্তর সমস্যা, বাসস্থান থেকে শুরু করে প্রতিটি সমস্যাকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন একাডেমীর অফিসাররা। ধরতে গেলে বিরাট শূন্যতার মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। ছিল আত্মপ্রত্যয়। সামরিক একাডেমীর যতজন প্রশিক্ষকের সঙ্গে কথা হয়েছে। সবাই বলেছেন আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আমরা পালন করব। সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে তাদের কর্মজীবনে তাই হচ্ছে প্রেরণা।

একাডেমীর জীবন, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে লেখার কিছু নেই। প্রতিটি সামরিক একাডেমীর জীবনযাত্রা শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় অভিন্ন। গুণগত দিক দিয়ে আমাদের সামরিক একাডেমী হয়ত অন্যান্য একাডেমীর সমমানের হবে না। কিন্তু সে দুর্বলতা জনশক্তিগত দুর্বলতা নয়, সম্পদগত দুর্বলতা। একাডেমী পরিচালনার ব্যাপারে দক্ষ জনশক্তি সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন ছিল: আপনারা কি বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক আনবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন? এ প্রশ্নের জবাবে, একটু হেসে কর্নেল মান্নাফ বলেছিলেন সে প্রয়োজন নেই। এখানে এমন কয়েকজন প্রশিক্ষক

রয়েছেন যাদের নামকরা বিদেশী সামরিক একাডেমীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কর্নেল মান্নাফ সেইসব প্রশিক্ষকদের অন্যতম।

সামরিক একাডেমীর প্রথম এ্যাডজুটেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছেন মেজর আনওয়ার। প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, তখন ছিলেন বলিষ্ঠ সুপুরুষ। সমাপনী কুচকাওয়াজের রিহার্সেলের সময় যখন দেখা হল, তখনও সেই বলিষ্ঠতা তেমনি আছে। কিন্তু গায়ের রং পাল্টে গেছে। রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। এক বছরের কষ্ট তিনিও গ্রহণ করেছেন ক্যাডেটদের সঙ্গে।

সেনাবাহিনীর জন্য যে একাডেমী অফিসার তৈরি করেছে, সে একাডেমীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানতে অনেকের ইচ্ছে করতে পারে। সামরিকবাহিনীর প্রতিটি অফিসার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সবাই অনুভব করেছিলেন। সামরিক একাডেমীর প্রয়োজনের কথা। সেই প্রয়োজনের ভিত্তিতেই '৭৩ সালের নভেম্বর মাসে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টকে নির্বাচিত করা হয় সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ভবিষ্যতে একাডেমী সরিয়ে নেয়া হবে স্থায়ী এলাকায়। ৩রা ডিসেম্বর একাডেমীর অফিসাররা কাজে যোগ দেন। তখন পর্যন্ত পদাধিকারবলে একাডেমীর কমান্ডান্ট ছিলেন কুমিল্লা স্টেশনের তৎকালীন কমান্ডার কর্নেল নাজমুল হুদা। একাডেমীর শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১১ই জানুয়ারী সে কারণেই সমগ্র সেনাবাহিনীর জীবনে একটি আনন্দের দিন। এদিন বাংলাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রথম ক্যাডেট দলকে নিযুক্ত করা হচ্ছে সেনাবাহিনীর অফিসার কোর্সে। এই একটি বছর চেষ্টা করা হয়েছে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে একজন ক্যাডেটকে গড়ে তুলতে। তাদের শেখানো হয়েছে পেশাগতজ্ঞান। এমনিতেই কখনও আসে না কঠোর পরিশ্রম প্রগাঢ় প্রার্থনা এবং উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতা দিয়েই তা অর্জন করতে হয়। একাডেমীর প্রশিক্ষকগণ সবাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যাডেটদের শিক্ষা দিয়েছেন। তারা ক্যাডেটদের কতখানি উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন তা প্রমাণ হবে সেনাবাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ অফিসার হিসেবে তাদের কার্যকলাপ থেকে।

একাডেমীর জীবনে গৌরবময় দিন হচ্ছে সমাপনী কুচকাওয়াজের দিন। সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ এবং চীফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সঙ্গে আমরা যখন একাডেমীতে পৌঁছি তখন সমাপনী কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি চলছে। দ্বিতীয় দিন সকালে সেনাবাহিনী প্রধানের উপস্থিতিতেই অনুষ্ঠিত হল রিহার্সাল কুচকাওয়াজ।
ব্যান্ডে যখন চির উন্নত মম শির বাজছে তখন পাহাড়ের ঢাল থেকে মার্চ করে এগিয়ে এলেন ক্যাডেটরা। তাদের পেছনেই এলেন কালারবাহী ক্যাডেটরা। ব্যান্ডে

তখন বাজানো হল জয় বাংলা। এরপরই প্রেসিডেন্ট স্যালুট। জাতীয় সঙ্গীতের সুরে স্যালুট প্রদান করলেন ক্যাডেটরা। তারপর ইন্সপেকশন প্যারেডের সময় আন্তর্জাতিক নিয়মানুয়ায়ী বাজানো হল ট্রুপ দ্য কালার। এরপরই মার্চপাস্টের পালা 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' যখন ব্যান্ডে বাজছে তখন স্যালুট ডায়াসের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ক্যাডেটরা। এই পরিবেশ একজন ক্যাডেটদের জীবনে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য পরিবেশ। সমাপনী কুচকাওয়াজ শেষে ক্যাডেটদের চলে যাবার জন্য যে পথ তৈরি করা হয়েছে পাহাড় কেটে সে পথ দিয়ে যখন ক্যাডেটরা চলে যান তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। ব্যান্ডে তখন বাজে স্কটল্যান্ডের একটি লোকগীতির সুর। সে সুর মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'পুরনো সেই দিনের কথা' গানটির কথা। মূল গানটির ভাবার্থও একই। হয়তো পুরনো দিনগুলোর কথা ক্যাডেটদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্য এই ব্যবস্থা।

ধীরে ধীরে একাডেমী ব্যাপ্তি লাভ করবে। একাডেমীর শিক্ষাবর্ষ আরো বিস্তৃত হবে। একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমী হিসেবে গড়ে উঠবে এই সামরিক একাডেমী। সামরিক একাডেমীর কর্তৃপক্ষ যথার্থই চয়ন করেছেন তাদের মনোগ্রামের ভাষা। একাডেমীর শ্লোগান হচ্ছে 'চির উন্নত মম শির'। যে সেনাবাহিনী দৃপ্ত সাহসে উন্নত শিরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, সে সেনাবাহিনী গৌরব অর্জন করতে পারে না। সার্বভৌমত্বকে যে দেশ শ্রদ্ধা ও মূল্য দেয়, তার কেবল সেনাবাহিনী থাকলেই চলবে না। নিজ বাসভূমে তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। একাডেমীর উদ্বোধনী ভাষণে তাই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমি কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। এবং নিজেদের ব্যাপারে অন্য কারো হস্তক্ষেপ সহ্যও করবো না। দেশের বুকে একটি সামরিক একাডেমীর প্রতিষ্ঠা সেই যৌক্তিকতাই প্রমাণ করে।